

প্রকাশক : এ চৌধুরী প্রযত্নে : প্রীতি মুখার্জী, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা—৭০০০৭৩, মুদ্রক : বিভাস কুমার গুহঠাকুরতা. ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ ও অমলেন্দু ঘোষ, রেনবো প্রিণ্টার্স, ১, কার্তিক বোস লেন, কলকাতা—৭০০০০৬। প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর, ১৯৬০

প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন

ক থা স ং ক্ষে প

ভারতের উন্নত ভাষাগুলির মধ্যে উর্দু অন্যতম। গালিব ও মহাকবি ইকবাল যেমন উর্দু কাব্যসাহিত্যকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করে গেছেন, মুন্সী প্রেমচন্দ প্রমুখ কথাসাহিত্যিক তেমনি উর্দু গদ্য-সাহিত্যের শাখাটিকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। উর্দুতেই প্রেমচন্দের প্রথম আবির্ভাব। হিন্দী ভাষার সঙ্গে উত্তর ভারতের অধিকাংশ ভাষার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকার জন্ত প্রেমচন্দ পরবর্তীকালে রচনার মাধ্যম হিসেবে হিন্দীকেই গ্রহণ করে-ছিলেন। তা-সত্ত্বেও উর্দু সাহিত্যে তাঁর অবদান কিছু কম নয়।

প্রেমচন্দের আবির্ভাবের আগে উর্দু সাহিত্য ছিল রোমান্টিকধর্মী পুরাণের গল্প, শাস্ত্রীয় তত্ত্ব। তাছাড়া নানারকম গাল-গপ্পে ভরা বাস্তবতা-বর্জিত রোমাঞ্চকর কাহিনীই ছিল সে-সাহিত্যের বিষয়বস্তু। প্রেমচন্দই প্রথম, উর্দু সাহিত্যকে বাস্তবতার সত্য রুক্ষ মাটির ওপর দাঁড় করান। শুধু তাই নয়, ভারতের অন্যান্য ভাষাগুলিতে যখন সাধারণ মানুষের নানাবিধ সমস্যাকে উপেক্ষা করে সাহিত্যচর্চা চলছে, প্রেমচন্দ তখন সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে অন্তরঙ্গ চিত্র আঁকতে শুরু করেন।

এই পটভূমিকায় উর্দু সাহিত্যে যে-কজন শক্তিশালী লেখকের আবির্ভাব ঘটেছিল, কৃষণ চন্দর তাঁদের অন্যতম। বলা বাহুল্য, সাহিত্য-সাধনার শুরুতেই কৃষণ চন্দর এক বিরলপ্রতিভা অগ্রযাত্রীর সন্ধান পেয়েছিলেন। তিনি হলেন প্রেমচন্দ এবং যে-জীবনদর্শনের আলোকে প্রেমচন্দ উর্দু সাহিত্যকে জনমুখিন করে তুলেছিলেন সেই আবিষ্কৃত পথে পা বাড়ালেন কৃষণ চন্দর। তাই তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পরাজিত' (শিকাস্ত) প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি জনপ্রিয়তার উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। এই উপন্যাসে তিনি শুধু গ্রামের সাধারণ মানুষেরই ছবি আঁকেন নি, তাদের দুঃখ-জর্জর জীবনযাপনের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম সহানুভূতি ও বেদনাবোধ ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসের প্রতিটি ছত্রে।

এই অসাধারণ প্রতিভাশালী লেখক কৃষণ চন্দরের জন্ম ১৯১৪ সালের ২৬শে নভেম্বর। তখন তাঁর পিতা ছিলেন কাশ্মীরের ভরতপুরের রাজার অধীনে কর্মরত একজন ডাক্তার। কৃষণ চন্দরের শৈশব অবস্থাতেই তিনি ভরতপুরের চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুঞ্চের রাজার অধীনে ডাক্তার হিসেবে নিযুক্ত হন। কৃষণ চন্দর পুঞ্চ হাইস্কুলে পড়াশোনা করেন। পরে লাহোরের ফার্মান ক্রিশ্চান কলেজ ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন এবং এম.এ., এল.এল.বি. পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন।

আইন অধ্যয়ন করা সত্ত্বেও তিনি কখনও আইন-ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হননি। কৈশোর থেকেই সাহিত্যের প্রতি ঝোঁক ছিল; স্কুলের গণ্ডি অতিক্রম করার পর তাঁর প্রথম রচনা 'মাস্টার বুলাকিরাম'। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দ'র পিতা বুলাকিরামের কাছে তিনি ফারসী অধ্যয়ন করতেন। তাঁর সেই গৃহশিক্ষককে নিয়ে লেখা এই প্রথম কৌতুক রচনাটি মুদ্রিত হয় 'রিয়াসত' পত্রিকায়।

অবশ্য তাঁর প্রথম গল্প 'কামলা' (য়রকান)। একবার পাণ্ডুরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি, সেই অভিজ্ঞতার নিরিখে গল্পটি লেখা। এই প্রথম গল্পটি থেকেই তাঁর জনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠতে থাকে। তাঁর 'হাওয়াই কিলা' রম্যরচনাটি ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয় তৎকালীন প্রগতিশীল পত্রিকা 'হুমায়ূঁ'তে। 'ঝিলমমেঁ নাও পর' গল্পটি হুমায়ূঁতে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ক্রমশ লেখার ওপর তাঁর গভীর আত্মবিশ্বাস ফুটে ওঠে। রাতারাতি প্রসিদ্ধি অর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা এবং প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিও তৈরী হতে থাকে।

এল.এল.বি পাস করার পর কৃষণ চন্দর কিছু ইংরেজি প্রবন্ধ লিখেও জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। প্রবন্ধগুলি ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক। 'ট্রিবিউন', 'দ্য নরদার্ন রিভিয়ু', 'দ্য মডার্ন গার্ল' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় রচনাগুলি প্রকাশিত হয়। ইকবালের কিছু কিছু কবিতার ইংরেজি অনুবাদও করেছিলেন তিনি। কিন্তু উর্দু ভাষা ছিল তাঁর প্রাণ। সাহিত্য-চর্চার মাধ্যম হিসেবেই কেবল তিনি উর্দুকে গ্রহণ করেননি, উর্দু ভাষার প্রতি তাঁর ছিল অপরিমেয় ভালোবাসা।

উত্তরদায়

ফরমান আলি সে রাতটি ধড়ের জঙ্গলে কাটালো। ধড়ের জঙ্গল খুব ঘন। এখানে কাও আর টক ডালিমের গাছ বেশী। কোথাও কোথাও তবজের ঝোপ-ঝাড়। সারা জঙ্গলে বড় জোর আট-দশটি ডুমুর গাছ, তাও এক জায়গায় একসঙ্গে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। তারা-ভরা আকাশের প্রান্তে সেগুলোকে কোনো এক মারাত্মক ষড়যন্ত্রকারী দলের মতো দেখাচ্ছে। ফরমান আলির এখন মনে হচ্ছে, তার চারদিকে শুধু ষড়যন্ত্র আর ষড়যন্ত্র। জঙ্গলটা তাদের মাঠের খুব কাছেই। কাছেই মানুষের বসতি গড়ে ওঠায় হিংস্র বন্য পশুরা ভয় পেয়ে জঙ্গল ছেড়ে পালিয়ে গেছে অনেক আগেই। এ-জঙ্গল ফরমান আলির নখদর্পণে। সে জানে, কোন্ গর্তে খরগোশ রয়েছে, কোথায় শজারু রয়েছে। শ্লেট পাথরের চাঁইগুলোর গর্তে শজারু থাকে। সারা পিঠ কাঁটায় ভর্তি। শত্রুর মুখোমুখি হলেই কাঁটাগুলো শক্ত খাড়া হয়ে ওঠে, ধারালো কাঁটার তীর চালাতে শুরু করে। ফরমান আলি পিঠের কাঁটাগুলোকে বড় ভয় পায়। গোপালের সঙ্গে সে দু-একটা শজারু শিকারও করেছে। কিন্তু ওর মাংস খাওয়া যায় না। এই জঙ্গলে তিনটে নালা রয়েছে। তবজের একটা বড় ঝোপ থেকে বেরিয়েছে ধড়ের নালা। ঝোপটা ভূত-প্রেতের আড্ডা। সেখানে কোন্ প্রাচীন কাল থেকে পাথরের এক ভয়ঙ্কর মূর্তি রয়েছে। ধড়ের নালার আরো ওপর থেকে এসেছে ঢকির নালা। যেখানে ডুমুর গাছগুলো রয়েছে, সেখান থেকে বেরিয়েছে ওটা। বৃষ্টির জলে নালাটা তৈরী হয়েছে। দু'টোই শুকনো খটখটে হয়ে পড়ে থাকে। তৃতীয়টি হলো ঢলানের নালা। মিশিরের বাড়ির নীচে যে ঝরনা রয়েছে, সেখান থেকে বেরিয়েছে ওটা। তারপর ঢালু দিয়ে কিছুদূর বয়ে গিয়ে মহণ্ডের মাঠে নদীতে মিশেছে। ঢলানের নালা পূর্বদিক থেকে এবং ধড়ের নালা পশ্চিম দিক থেকে এসে মিশেছে, কিন্তু ঢকির নালা কখনো পূর্বদিক থেকে কখনো পশ্চিমদিক থেকে এঁকেবেঁকে এসে নদীতে পড়েছে। বৃষ্টির পর্যাপ্ত জলে সে নিজের পথ করে নিয়েছে। ঢকির নালা প্রতি বছরই নিজের জন্যে নতুন নতুন পথ বেছে নেয়। প্রচণ্ড খরস্রোতে প্রতি বছর সে কিছু ঘরদোর ধূলিসাৎ করে, কিছু ফসল নষ্ট করে।

তিনটে নালাই ফরমান আলির সুপরিচিত। ওই পায়ে হাঁটা রাস্তাটাও চেনে সে। রাস্তাটা বাইরে কোথাও যায়নি। কাঠুরেরা ওই রাস্তা ধরে

জঙ্গলের ভেতরে চলে যায়। জঙ্গলের পাহারাদারদের নজর এড়িয়ে মজা করে কাঠ কাটে, সন্ধ্যেয় বাড়ি এনে বিক্রি করে। সেই ছোট্ট তৃণক্ষেত্রটিও চেনে সে। সেটা শুধু তার আর গোপালের একান্ত নিজস্ব ছিল। তৃণক্ষেত্রটির চারদিকে জঙ্গল এত ঘন যে, দুপুরবেলাতেও মনে হয় সন্ধ্যে। চারপাশে টক ডালিমের গাছ জড়িয়ে আঙুরলতার ঝোপ। মাঝখানে মনোরম তৃণক্ষেত্র। ঘন দূর্বা-ঘাসের গালচে পাতা। এদিকে-ওদিকে বেশ খানিকটা জায়গা ফাঁকা রেখে জঙ্গল সরে গিয়েছে যেন। সেই দূর্বাঘাসে শুয়ে শুয়ে ফরমান আলি উন্মুক্ত নীল আকাশ দেখতো। প্রথম যখন গোপাল আর সে জায়গাটা আবিষ্কার করে, তখন ওরা অবাক হয়ে জায়গাটা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেছিলো, যেন কোনো পরীর দেশে এসে পৌঁচেছে ওরা। ওদের বয়েস তখন খুব কম। বড় জোর দশ-বারো বছর। সেই বয়সে তো মানুষ পরীর দেশই আবিষ্কার করে, আর যখন বড় হয়, তখন সে-দেশেই জীবন কাটাতে হয় তাকে। তখন সেখানে শুধু খিদে, বেকারি, দুঃখ-কষ্ট আর অশান্তি। জীবন তখন ছেনাল ডাইনীর আস্তানার মতো সেই পরীর দেশকে নিয়ে বিদ্রূপের অট্টহাসি হাসে। গোপাল আর সে তখন এ জায়গাটা দেখে কত না খুশী হয়েছিল। ভাস্কো-ডা-গামা ভারতের পথ আবিষ্কার করে কিংবা কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেও সম্ভবত অত খুশী হয়নি। কারণ ওরা তখন তো আর শিশু ছিল না। শিশুরাই শুধু খুশী হতে জানে। এই গভীর রাত্রির ভয়ঙ্কর স্তব্ধতায় একটা কাণ্ড গাছের নীচে শুয়ে শুয়ে গোপালের কথা মনে পড়ছে ফরমান আলির। গোপাল তার সঙ্গী ছিল। তার বাল্যবন্ধু। ছেলেবেলায় একসঙ্গে দুরন্তপনা করেছে। বড় হয়ে দুজনে নিজেদের এলাকার স্কুলে ছেলেমেয়েদের পড়িয়েছে। আজ সেই গোপাল এই পৃথিবীতে নেই ভাবতেই তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। স্বাধীনতার আনন্দ-উৎসব পালন করতে যারা এই এলাকায় এসেছিল, তারা গোপালের পরিবারের ওপর আক্রমণ করে সবাইকে হত্যা করেছে। গোপালকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে গিয়ে ফরমান আলিও মারাত্মক আহত হয়েছে। মরেই যেত। কিন্তু সে মুসলমান বুঝতে পেরে আক্রমণকারীরা তাকে ছেড়ে দিয়েছিল। আর তার সঙ্গীকে তার চোখের সামনেই দু'টুকরো করেছিল তারা। এখন তার মনে হচ্ছে তার জীবনের সমস্ত স্বপ্ন, বেঁচে থাকার একাগ্র বাসনা, প্রাণের গভীর আকাঙ্ক্ষা—সবকিছু গুলিবৃষ্টিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলো সে। তারপর কয়েক-দিন শুধু পাগলের মতো ছুটে বেড়িয়েছে। তাই আক্রমণকারীরা তার ও গোপালের এই এলাকা জুড়ে আর কী কী কাণ্ড করেছে, কিছুই সে জানতে পারেনি। শুধু তার আবছা মনে পড়ছে, কোনো কোনো বাড়িতে আগুন জ্বলছে, কিছু কিছু মেয়েকে ছাগল-ভেড়ার পালের মতো নদী পার করে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কিছু মুণ্ডহীন লাশ ছড়িয়ে রয়েছে। আর মনের মধ্যে গেঁথে আছে এক আহত চোখের সকাতর চাউনি। দৌলতরাম মহাজনের বাড়ির

বাইরে আম গাছের তলায় একটি মৃত শিশুকে পড়ে থাকতে দেখেছিলো ফরমান আলি। চোখ মেলে ওপরের দিকে চেয়েছিলো সে। তার চোখের ওপর সবুজ পাতার ভিড়ে নাখ ফল শূন্যে ঝুলছে। এমন দৃশ্য সে আজ পর্যন্ত কখনো দেখেনি। গোপী সাহুকারের বাড়িতে ধোঁয়া উঠছে, কিন্তু সেখানে কোনো লোক নেই। সামনে মকাইখেতের ধারে দুটো দইয়ের কলসি মুখ-খোলা অবস্থায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে। পায়ে-হাঁটা রাস্তার ওপর দিয়ে দই বয়ে এসেছে। আর তার ওপর পা ফেলে ফেলে আক্রমণকারীরা চলে গেছে। দইয়ের ওপর তাদের পায়ের ছাপ। তারপর হঠাৎ প্রান্তরে গুলির শব্দ। চতুর্দিকে পাহাড়গুলো প্রতিধ্বনি তুলে উত্তর দিলো তার। তারপর আবার গভীর স্তব্ধতায় ডুবে গেলো চারদিক। অমনি ফরমান আলির মনে হলো, না, কোথাও কিছু ঘটছে না, ঘটবেও না। এই শূন্যতা, এই স্তব্ধতাকে কোনো কিছুই পূরণ করতে পারবে না।

ধড়ের জঙ্গলে আজ তার ঘুম আসেনি। এই জঙ্গল তার বড় আপনার। নিজের করতলের মতোই সে এই জঙ্গলটা চেনে। কিন্তু আজকের এই রাত্রিতে সেই জঙ্গলও যেন অচেনা। তার চারপাশে গাছগুলো এক মারাত্মক ষড়যন্ত্র করার জন্যে চুপিচুপি কানাকানি করছে। কোথাও কোনো শব্দ নেই। কোথাও কোনো জন্তু-জানোয়ার চলাফেরা করছে না। কোথাও কোনো পাখির ডানার ঝটপটানি নেই। কোথাও কিছু নড়ছে না, চলছে না। আবার পরক্ষণে ফরমান আলির মনে হলো, তার চারপাশে গাছগুলো যেন ফিসফিস করছে, সরে সরে তার কাছে আসছে। অদৃশ্য চোখ দিয়ে দেখছে তাকে। চারদিক থেকে আঙুল বাড়িয়ে তার গলা টিপে ধরছে। হঠাৎ সে লাফ মেরে উঠে দাঁড়ালো। ভীতসন্ত্রস্ত চোখ মেলে চারদিক দেখতে লাগলো। কিছুই নেই কোথাও। গাছগুলো নিজের নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে। পাতার ফাঁক দিয়ে যেসব নক্ষত্র চোখে পড়ছে, তারাও নিজের জায়গায় ঝিকমিক করছে। হঠাৎ ফরমান আলির মনে হলো, সারা জঙ্গলটা যেন নীরবে হাসছে। এক নীরব অট্টহাসি চারদিক কাঁপিয়ে প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে। আর চারদিকের পাহাড়গুলো তারই প্রতিধ্বনি তুলে বিদ্রূপ করছে। সেই বিদ্রূপ জলের ওপর ঢেউয়ের মতো দূর থেকে দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে। তারপর দূরদিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। এখন চারদিকে আবার সেই স্তব্ধতা। সেই ভয়ানক স্তব্ধতা। ফরমান আলি কপালের ঘাম মুছে গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসলো। অবশেষে ঘুম নেমে এলো তার চোখে। ওইভাবেই বসে বসে ঘুমিয়ে পড়লো সে। ঘুমোবার ইচ্ছে ছিলো না তার। তাই বুঝি চোখে ঘুম নেমে এলো, ঘুমিয়ে পড়লো সে। মাঝে মাঝে চমকে চমকে জেগে উঠছিলো। ঘুমিয়ে পড়ার জন্যে সঙ্কোচ হচ্ছিলো তার, হাত দিয়ে বারবার চোখ ঘষে জেগে থাকার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু পর-ক্ষণেই আবার ঘুমিয়ে পড়ছিলো। এভাবেই রাতটা জেগে ঘুমিয়ে কাটল তার।

তারপর তারাগুলো ক্রমশ বিবর্ণ হয়ে এলে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো সে।

তারাগুলো যখন একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেলো, তখনো সে ঘুমিয়ে। তারপর পুবাকাশে যখন রক্তিম হাওয়া ছড়িয়ে পড়তে লাগলো, তখনো সে ঘুমিয়ে। পাখিদের কলকাকলিতেও তার ঘুম ভাঙলো না। কিন্তু যেই সূর্যের প্রথম আলো তার চোখের পাতায় এসে পড়লো, অমনি সে ধড়মড় করে উঠে বসলো, কেউ যেন তাকে গুলি করেছে। সেই মুহূর্তেই সে সটান উঠে দাঁড়ালো, ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। বস্তুত ভয় পাওয়ার মতো কিছু ছিলো না কোথাও। দিনটা অবিশ্যি খুব চড়া। রাত থেকেই তার খিদে ছিলো। এখন সেই খিদে-তেষ্টা অসহ্য হয়ে উঠেছে। অথচ লোকালয়ে যাওয়ার উপায় নেই। কারণ আগেকার আক্রমণকারীরা পালিয়ে গেছে। এখন সে-জায়গায় এসেছে নতুন আক্রমণকারীর দল। তারা প্রথম দলটাকে মেরে তাড়িয়েছে। আর সেই সঙ্গে গাঁয়ের বাসিন্দাদেরও উটকো লোকজনের মতো পালাতে হয়েছে গাঁ ছেড়ে। কেন ? সে-প্রশ্নের সঠিক উত্তর নেই তার কাছে। সে শুধু জানে, প্রথম দলটা যখন এসেছিলো, তখন হিন্দুরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়েছিলো। আবার অন্য দল যখন এলো, তখন মুসলমানদেরও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পালাতে হলো। অথচ এর আগে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই পরম আত্মীয়ের মতো পাশাপাশি বসবাস করে এসেছে। ফরমান আলি কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, গোপাল এইভাবে মারা যাবে, আর তাকে এইভাবে গাঁ ছেড়ে পালিয়ে এসে জঙ্গলে আশ্রয় খুঁজতে হবে। লোকালয় ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা অবশ্যই তারা দুজনেই ভাবতো। কিন্তু একসঙ্গেই যাওয়ার কথা ভাবতো তারা। লাহোরে গিয়ে পড়াশুনো করার ইচ্ছে ছিলো তাদের। লাহোর ছিল তাদের চোখে পরীর দেশ। লাহোর, তারপর বোম্বাই, বোম্বাইয়ের পর লণ্ডন, নিউইয়র্ক, মস্কো, গোপাল আর ফরমান আলি দুজনে একসঙ্গে মিলে আশ্চর্য আশ্চর্য কল্পলোক রচনা করতো। সারা পৃথিবী পর্যটনের কথা ভাবতো। বিজ্ঞান সম্বন্ধে নতুন নতুন জ্ঞানলাভের কথা চিন্তা করতো। তাদের গ্রাম আর তার চারপাশের পরিবেশটাকে একটা ছোট্ট গণ্ডি বলে মনে হতো। এখন সেই গোপাল মরে গেছে। আর সে জঙ্গলে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তারা তাদের এই জন্মস্থানটুকু ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে যাওয়ার কথা কখনো ভাবেনি। শুধু নিজেদের ইচ্ছেমতো ভ্রমণ করতে চেয়েছিলো তারা। আর এখন অন্যরা তাদের বাড়ি থেকে বিতাড়িত করেছে।

ফরমান আলির খুব জোর খিদে পেয়েছে। তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে। সাবধানে আস্তে আস্তে জঙ্গলের মধ্যে হাঁটতে শুরু করে সে। বন্য পশুর মতো পা টিপে টিপে। খুটখাট শব্দ হলেই কান খাড়া করে শোনে আর চারদিক তাকিয়ে দেখে। ধড়ের নালার দিকে এগিয়ে যায়। তবজের ঝোপ থেকে যে-ঝরনাটা

[illegible] ই দিকে। প্রায় আধ ঘণ্টা একনাগাড়ে হেঁটে সে ঝরনার ধারে পৌঁছ[illegible] ঢক করে অনেকটা জল খেয়ে তেষ্টাটা মিটলো। কিন্তু খিদেটা মারাত্মক। ঝরনার পাড়ে ভয়ঙ্কর বিশাল মূর্তিটা আর প্রেতাত্মারা যেন তাকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছে। অনেকক্ষণ সেগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলো ফরমান আলি। তারপর রেগে গিয়ে ঝরনার জল দু'হাতে ছিটিয়ে ছিটিয়ে ভিজিয়ে একশা করে দেয় মূর্তিগুলো। শত শত বছর ধরে ওরা হয়তো স্নান করেনি। ঝরনার পাড়ে ওরা থাকলেও কেউ ওদের এভাবে কখনো স্নান করানোর কথা ভাবেনি। এখন স্নান করে ওদের ভয়ঙ্কর চেহারা আরো বেশী ভয়ঙ্কর হয়ে ফুটে ওঠে। কুৎসিত ভাবটা আরো বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফরমান আলি তবজের ঝোপ থেকে একটা ডাল ভেঙে নেয়। কাঁটাগুলো ছাড়িয়ে ফেলে সেটাকে দাঁতন বানায়। তবজের দাঁতন দিয়ে দাঁত ঘষতে ঘষতে সে যেন আচারের টক-ঝাল স্বাদ অনুভব করতে থাকে। নিজের জিভকেই খানিকটা বোকা বানাবার চেষ্টা আর কী! কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মুখ লালায় ভরে যায়। হুস্-হাস্ করতে করতে সে দাঁতনটা ফেলে দিয়ে মুখ ধোয়। কিন্তু কেন? খিদে বরং আরো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। গাছে ফল নেই, মাটিতে কোনো ফসলও নেই। অথচ তার দারুণ খিদে। হঠাৎ মিশিরের বাড়ির কথা মনে পড়ে তার। জঙ্গলের শেষ প্রান্তেই ঢলানের নালার পাড়ে। তার ফেলে-যাওয়া বাড়িটায় কিছু-না-কিছু পেয়ে যেতেও পারে সে। এই ভেবে সে মিশিরের বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় সে। চারদিকের অবস্থাটা এখন কেমন, যাওয়ার আগে সেটা একবার দেখে নেওয়া দরকার।

ফরমান আলি একটা উঁচু টিলার ওপর রিয়াড় গাছে উঠে চারদিকটা দেখতে লাগলো।

বাজারটা চোখে পড়ছে। সেখানে কোনো লোক নেই। দোকানগুলো খোলা রয়েছে, কিন্তু ভেতরটা ফাঁকা। সমস্ত দোকান, সেটা হিন্দু-শিখ-মুসলমান, যারই হোক না কেন, একেবারে ফাঁকা! স্তব্ধ, নির্জন। শূন্য আস্তাবলের মতো দেখাচ্ছে। ভগতরামের দোকানের সামনে একটা গাধা দাঁড়িয়ে বাজারের পশ্চিম মুড়োয় ঢকির নালা আর মাঠের নদীটার কাছাকাছি আক্রমণকারীদের একটা দল চোখে পড়ছে। বাজারের মধ্যে খোলা জায়গাটা, যেখানে একটা মসজিদ রয়েছে, সেখানটা একেবারে জনশূন্য। ওখানে মনো গাছে ভগোয়া ঝাণ্ডা উড়ছে। সবুজ ঝাণ্ডাওয়ালারা গাছে চড়ে সেটাকে আর নামিয়ে ফেলার কষ্ট করেনি, তারও চেয়ে উঁচু একটা ডালে নিজেদের সবুজ পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে। এখন দুটো পতাকাই একসঙ্গে আকাশে উড়ছে। থানা, তহশিল অফিস এবং ট্রেজারি বিল্ডিং থেকে আগুন আর ধোঁয়া বেরোচ্ছে। কিছু কিছু বাড়িতে নতুন করে আগুন লাগানো হয়েছে। গোপী সাহুকারের বাড়ির সামনে মাঠের ওপর তাঁবু পড়েছে। কিছু সেপাই খচ্চরগুলোকে দানা

খাওয়ানোর জন্যে তাদের সামনে বস্তা এনে রাখছে। নদীর পশ্চিম পাড়ে, যেদিক থেকে আক্রমণকারীরা এসেছিলো, সেদিক থেকে মাঝে মাঝে গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে, তারপর আবার চারদিকে স্তব্ধতা নেমে আসছে।

ফরমান আলি ভাবলো, ওরা বোধহয় জঙ্গলে আর আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে না। এই ভেবে সে নিজেকে আশ্বস্ত করে মিশিরের বাড়ির দিকে পা বাড়ালো।

সে খুব তাড়াতাড়ি কাঠুরেদের পায়ে-হাঁটা রাস্তা ধরে এগিয়ে চললো। শজারুর গর্তের সামনে দিয়ে হেঁটে ঢলানের ঝরনায় গিয়ে পৌছলো। ঝরনার ধারেই মিশিরের বাড়ি। ঝরনার পেছনের ঝোপে লুকিয়ে সে অনেকক্ষণ দরজাটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। দরজাটা খোলা। ভেতরের ঘরে সামনের দেয়ালেই মিশিরের তোয়ালে ঝুলছে। দেয়ালের তাকে ধর্মপুস্তক চোখে পড়ছে। তাকের নীচে প্রদীপ রাখার জায়গা। সেখানে কাঁসার একটি গেলাস। পরিষ্কার মাজা-ঘষা। ঝকঝক করছে। যেন মিশির এইমাত্র গেলাসটা ওখানে রেখে কোথাও গেছে। এখুনি ফিরবে। ওখান থেকে গেলাসটা নিয়ে চৌকিতে রাখবে। তারপর তোয়ালেটা কাঁধে ফেলে কোশাকুশি নিয়ে পুজোয় বসবে। ফরমান আলি অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলো সেদিকে। কিন্তু যখন ঘর থেকে কারো সাড়া পেলো না, কেউ বাইরে এলো না কিংবা ভেতরেও গেলো না, তখন সে একটা পাথর তুলে নিয়ে দরজায় বেশ জোরে ছুঁড়ে মারলো। তারপর পা টিপে টিপে আবার ঝোপের মধ্যে ফিরে গেলো। দরজাটার দিকে চোখ রেখে বসে রইলো সে। পাথরটা দরজায় লেগে ছিটকে তাকে রাখা গেলাসটার ওপর গিয়ে পড়লো। অমনি গেলাসটা নীচে পড়ে ঝনঝন শব্দ করে উঠলো। সেই শব্দে ফরমান আলিও কেঁপে উঠলো। তার মনে হলো যেন চারদিকে গুলিবৃষ্টি হচ্ছে। তার বুক ধকধক করতে লাগলো। কিন্তু যখন বহুক্ষণ বাড়ি থেকে কোনো সাড়া-শব্দ এলো না, খোলা দরজা যেমনকার তেমনিই খোলা রইলো, তখন ফরমান আলি সাহস করে এগিয়ে গেলো। ঝোপ থেকে বেরিয়ে পাড় ভেঙে উঠে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো সে।

বাড়িতে কেউ ছিলো না। বলতে গেলে ফরমান আলি তো জানতোই, মিশির তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে নিয়ে রজোরির দিকে পালিয়ে গেছে। সে এটাও জানতো যে এবাড়িতে মালিক বলতে এখন কেউ নেই। তা সত্ত্বেও সে ভেতরে গিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে ভারি চিন্তিত হলো। তার মনে পড়লো, আজ থেকে কয়েকদিন আগে বাড়িটা কিরকম গমগম করতো। সংসারে কত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছিলো। মিশিরের জমিজমা সামান্যই। তার স্ত্রী খাটতো খুব। মিশিরের দুটি বয়স্থা সুন্দরী মেয়েও ছিল। সারা বংশের ইজ্জত। খাটা-খাটুনিতেও তারা মায়ের চেয়ে কম ছিলো না। শিশুদের খলখল হাসিতে জঙ্গলের আশপাশ পর্যন্ত সারাদিন মুখর হয়ে থাকতো। আর মিশির বড়

নিশ্চিন্তে নিজের পুজোপাট নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতো। এখন সেই বাড়ি খাঁ খাঁ করছে। রজোরির দিকে চলে গেছে সবাই। ছোট ছোট তিন ছেলে—গঙ্গো, মঙ্গো আর জীওকা। দুটি মেয়ে, যমুনা আর কেশরী। মিশির আর তার স্ত্রী তো রয়েছেই। মিশিরের ঘরনী রাধা। ছোট ছোট চোখ, ছোট ছোট হাত পা। অন্যদের মতো ওরাও জীবনে কখনো নিজেদের অঞ্চল ছেড়ে বাইরে পা বাড়ায়নি। আর আজ তাদেরই কিনা নিজেদের এলাকা ছেড়ে রজোরির দিকে পালাতে হয়েছে। ওরা ওখানে বাপ-দাদার আমল থেকে বাস করে আসছিলো। তহশিল অফিসের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পুরনো চিনার গাছের মতোই। শত শত বছর ধরে তারা এখানে কাটিয়ে আসছে। এ অঞ্চলের মাটিতেই তাদের শেকড় ছিলো, এখানেই তারা ফুলে ফলে বিকশিত হয়ে উঠেছে। এখানেই তারা প্রথম মাথা তুলে সূর্য দেখেছে। এর গন্ধমদির হাওয়ায় ঘ্রাণ নিয়েছে, গভীর মমতায় এই মাটির বুকের স্তন্যসুধা পান করেছে। আর আজ সেই সন্তানেরা মায়ের কোল খালি করে কোথায় চলে গেলো। তারা জানলোই না, ফরমান আলিকেই বা কোথায় যেতে হচ্ছে · কেনই বা যেতে হচ্ছে তাকে, সেটাও জানে না তারা। যেন ওরা নিজেদের বাসভূমি ছেড়ে যায়নি, মৃত্যুপুরীর দরজা পেরিয়ে যেতে হয়েছে তাদের। কারণ যাওয়ার সময় সঙ্গে কিছুই নিয়ে যায়নি তারা। সবকিছু ফেলে রেখে গেছে। কাপড়চোপড়, ঘরবাড়ি, খাট-বিছানা, তৈজসপত্র, মাঠ, মাঠের ফসল, খাবারদাবার, কোশাকুশী—সব কিছু। তাড়াহুড়ো করে কাঁদতে কাঁদতে পালাতে হয়েছে তাদের। অজানা-অচেনা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। যেদিকে রজোরি শহর আছে বলে শুনেছিলো, সেদিকেই হেঁটেছে তারা।

ফরমান আলি বাড়ির উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালো। উনুনে তাওয়া চড়ানো। কিন্তু আগুন নিভে গেছে। বারকোশে মকাইয়ের আটা মাখানোর জন্যে রাখা হয়েছিলো। হুটোপাটিতে বারকোশ উলটে গেছে। মকাইয়ের আটা কিছু বারকোশে, কিছু উঠোনে ছড়িয়ে আছে। হাঁড়িতে কিছু বাসি শাক একেবারে থকথকে হয়ে গেছে। কলসিতে জল। তাকে দিয়াশলাইয়ের বাক্স। আলনায় একটা ময়লা চাদর। ফরমান আলি চাদরে মকাইয়ের আটা বেঁধে নিলো। আটাগুলো বেঁধে নিতে তার বড় খারাপ লাগছিলো। মিশির তো তার নিজের ভাইয়ের মতোই। অথচ আজ নিজের বাড়িতেই চুরি করছে সে। উঠোন থেকে ঘরের মধ্যে গেলো। ঘরের মধ্যে পা বাড়াতে ভয় করছিলো তার। এক-পাশে মিশিরের পুজোপাটের দ্রব্যসামগ্রী। অন্যপাশে ছেলেমেয়েদের শোবার জায়গা। নিকনো পরিচ্ছন্ন মেঝের ওপর বিছানা পাতা রয়েছে। একটা আধ-খোলা ট্রাঙ্ক, তার ভেতর থেকে একটা জামা উঁকি মারছে। দেয়ালে একটা পেরেক, তাতে মেকি মুক্তোর লাল সাতনরী মালা ঝুলছে। ফরমান আলির হঠাৎ মনে পড়লো, যমুনা এই লাল সাতনরী মালাটা পরতো। তার চমৎকার

ফর্সা গলায় মালাটা কী চমৎকার মানাতো! আজ সেই যমুনা কোথায়! রজোরি কি পৌছতে পেরেছে! ফরমান আলি ঘরের এক কোণে একটা বড় হাঁড়া দেখতে পেলো। হাঁড়াটা মাটিতে গড়িয়ে গেছে। সে আস্তে আস্তে হাঁড়ার ঢাকনা খুলে ভেতরে উঁকি মেরে দেখলো। তারপর হাত ভরে তা থেকে ভাজা ভুট্টা বার করতে লাগলো। অনেক ভুট্টা রয়েছে। সম্ভবত প্রথম দলটা মিশিরের বাড়ি পর্যন্ত পৌছনোর আগেই অন্য দল এসে তাদের মেরে তাড়িয়েছে। নইলে এসব জিনিস তার হাতে আসত না। চাদরে ভুট্টা বেঁধে নিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ি থেকে বেরোলো সে। বাইরে এসেই চারদিক একবার ভালো করে দেখলো। তারপর তীরের মতো দৌড়ে ঝোপের আড়ালে চলে গেলো। ওখানে বসে বসে ভুট্টা চিবোতে লাগলো সে। কিছু ভুট্টা পেটে যেতেই খিদের জ্বালাটা একটু কমলো। তখন পেট ভরে জল খেলো। জল খেয়ে চাদরের পুঁটলিটা আবার বেঁধেছেঁদে নিয়ে জঙ্গলে ফিরে চললো। ফরমান আলির ইচ্ছে ছিলো, সে জঙ্গলের ভেতরে ভেতরে ধড় থেকে সবেড়ে চলে যাবে। সেখান থেকে কোট্‌লি, কোট্‌লি-থেকে মীরপুর হয়ে পাকিস্তান। অবশ্য যদি কপাল ভালো হয়। নইলে অন্যান্য হিন্দু অথবা মুসলমান শরণার্থীর মতোই তার লাশ কোনো জঙ্গলে পড়ে পড়ে পচবে। জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ারে ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে। শুধু পড়ে থাকবে সাদা হাড়গুলো। সে ব্যথাতুর চোখে একবার চারদিকে তাকালো, তারপর হাঁটতে লাগলো। প্রায় এক ঘণ্টা পৌনে এক ঘণ্টা হাঁটার পর ঢকির নালার ধারে এসে পৌছলো। সেখানে পৌছে ডুমুর গাছে উঠে আর একবার নিজের জন্মভূমি দেখার ইচ্ছে হলো তার। অমনি সে সেখানেই ডুমুর গাছের তলায় শুকনো সোনালী পাতার ওপর বসে পড়ে কাঁদতে শুরু করলো। তার গাল বেয়ে ঝরঝর করে চোখের জল পড়তে লাগলো। নীরবে কাঁদতে থাকলো সে। কাঁদতে কাঁদতে তার মনটা যখন একটু হালকা হলো, তখন সে চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়ালো। হঠাৎ কে যেন পেছন থেকে এসে জড়িয়ে ধরলো তাকে। অমনি সে চমকে পেছন ফিরে দেখলো, এক অচেনা অজানা দুধের শিশু। ফরমান আলির দিকে চেয়ে সে বলতে লাগলো, 'আব্বা, আব্বা!'

ফরমান আলি জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার আব্বা কোথায়?'

একনাগাড়ে সে বলে চললো, 'আব্বা, আব্বা!'

'তোমার আব্বার নাম কী?'

'আব্বা, আব্বা!'

ছেলেটি ক্রমাগত জোরে চিৎকার করতে লাগলো। ওর চিৎকার শুনে ফরমান আলি ওর মুখে হাত চাপা দিলো, 'চেঁচিয়ো না। শুনে ফেলবে কেউ।' কিন্তু ছেলেটির চিৎকার বিফল হলো না। ঝোপ থেকে একটা ছোট্ট মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফরমান আলির কাছে এসে খাবার চাইতে লাগলো। ফরমান আলি মেয়েটিকে চিনতে পারলো। জামাল পটোয়ারীর মেয়ে। পটোয়ারী

পালিয়ে গেছে। তার বউও পালিয়েছে। ভয়ে আতঙ্কে। আর এই জঙ্গলে পড়ে আছে শুধু দুটি শিশু। খিদে-তেষ্টায় ধুঁকছে। তার কাছে খাবার চাইছে।

ফরমান আলি ওদের কোলে তুলে নিলো। এখন সে কী করবে? কোথায় যাবে? লণ্ডন, নিউইয়র্ক, মস্কো! এই পথযাত্রা তাকে কোথায় নিয়ে যাবে? এই শিশুদের নিয়ে সে শেষ পর্যন্ত কোথায় পৌঁছতে পারে? ওদের যদি সে এখানে ফেলে রেখে যায়, জীবনে কখনো কি সে কারোর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারবে! সে শিশুদের কোলে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে হাঁটতে শুরু করলো। যেদিক থেকে সে এসেছিলো, সেদিকে। হঠাৎ তার ইচ্ছে হলো, একবার সে তার প্রিয় তৃণক্ষেত্রটি দেখে যাবে। সেখানে গিয়ে ঝরনার ধারে শিশুদের খাবার তৈরী করে খাওয়াবে। তারপর ওদের ঘুম পাড়িয়ে বিদায় নেবে। যদি ওদের মা-বাবাই ওদের ফেলে পালাতে পারে, তবে তার চলে যাওয়াটা এমন কিছু না। কিন্তু সে ওদের ক্ষুধাতুর অবস্থায় রেখে যেতে পারবে না।

ঢকির নালা ছাড়িয়ে ঢলানের খালের পাড় ধরে এগিয়ে চললো সে। তৃণক্ষেত্রে যাওয়ার পথে একটা কাপড়চোপড়-ভরা বাক্স দেখতে পেলো। পাশে এক শিখ-শিশু চুপচাপ গম্ভীর হয়ে বসে আছে। তার হাতে একটা ছোট্ট কৃপাণ। ফরমান আলি তাকে চিনতে পারলো। গোরা স্যাকরার ছেলে হুন্ত্যোৎ সিং। বড়জোর বছর সাতেক বয়েস। ফরমান আলি জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি এখানে কী করছো?'

হুন্ত্যোৎ বললো, 'বাপু আমাকে এখানে বসে থাকতে বলেছে।'

'কেন?'

'বললে, আমি এক্ষুনি আসছি। তুমি ততক্ষণ বাক্সটা দেখো। তাই কৃপাণ নিয়ে বসে আছি আমি। বাক্সে হাত দিলে আমি তোমাকে মেরে ফেলবো।'

'তোমার বাপু কখন গেছে?'

'অনেকক্ষণ হলো। মাঝে একটা রাত এলো। খুব ভয় লেগেছিলো আমার। 'বাপু বাপু' বলে কেঁদেছিলাম আমি। তারপর আর-একটা রাত এলো। বুঝতে পারছি নে বাপু কখন ফিরবে!'

'তুমি এখানে কতক্ষণ বসে থাকবে?'

'বাপু ফিরবে। আমার জন্যে ভালো প্রসাদ আনবে।'

'ও আর ফিরবে না বাবা।'

হুন্ত্যোৎ কেঁদে ফেললো। ফরমান আলি ওকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো। ওর আঙুল ধরে বলল, 'চলো।'

হুন্ত্যোৎ বললো, 'আমার ছোট ভাই রয়েছে। ওকেও নিয়ে চলো।'

'কোথায়?'

'ওই ওদিকের ঝোপটায় রয়েছে। কথা বলছে না। আমি ডাকছি। সাড়া

দিচ্ছে না ও।'

ঝোপটার কাছে গিয়ে ফরমান আলি দেখলো, হুজোতের ছোট ভাই মৃত্যুর অগাধ ঘুমে আচ্ছন্ন। চোখ দুটো বন্ধ। চিবুকে একখানা ছোট্ট হাত। যেন কোনো গভীর চিন্তায় মগ্ন।

ফরমান আলি বললো, 'চুপ! ওকে ঘুমোতে দাও। যখন ও উঠবে, এসে নিয়ে যাবো।'

তিনটি শিশুকে নিয়ে সে তৃণক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে চললো। তার আর গোপালের তৃণক্ষেত্র। এই তৃণক্ষেত্র তার আর গোপালের মনোরম স্বপ্নভূমি ছিলো। সেখানে তারা উন্মুক্ত আকাশে মেঘের গম্বুজ দেখতে দেখতে এক নতুন পৃথিবী গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতো। ফরমান আলি সেই তৃণক্ষেত্রে এসে হাজির হলো।

এ জায়গাটা তার নিজস্ব। কারোর জানা ছিলো না জায়গাটা। কেউ আসতেও পারতো না এখানে।

এখানে সে শিশুগুলোর জন্যে খাবার তৈরী করলো। তাদের খাওয়ালো। নিজেও খেলো। দূর্বাঘাসের কোমল গালচেয় শোওয়ালো ওদের। জামাল পটোয়ারীর মেয়ে আর সেই মুসলমান ছেলেটি তো খুব শীগগির ঘুমিয়ে পড়লো, কিন্তু শিখ ছেলেটির চোখে ঘুম নেই।

'তুমি ঘুমোচ্ছো না কেন?'

হুজোৎ উত্তর দিলো, 'তুমি আমাকে মেরে ফেলবে।'

'এ-কথা কে বললো তোমায়?'

'বাপু বলতো। মুসলমানরা ভালো নয়। ওরা আমাদের খুন করে। তুমি মুসলমান না?'

'হ্যাঁ, আমি মুসলমান। কিন্তু আমি তোমাকে মারবো না।'

'কেন?'

'কারণ আমি তোমাদের গুরুকে মানি।'

'আমাদের গুরুকে মানো তুমি?'

'হ্যাঁ, সারা পৃথিবীতে যত বড় বড় গুরু আছে, সবাইকে মানি আমি।'

'তাহলে তুমি কেমন মুসলমান?'

'আমি একটু অন্যরকম মুসলমান।'

হুজোৎ চুপ করে রইলো। ফরমান আলি ওকে আস্তে আস্তে হাত চাপড়ে আদর করতে লাগলো। অনেকক্ষণ পর হুজোৎ জিজ্ঞেস করলো, 'বাপু তোমাদের ভয়ে পালিয়ে গেলো কেন?'

'সে এক বড় গল্প।'

'গল্প! তাহলে তো শুনতেই হবে। শুনবোই আমি গল্পটা।' হুজোৎ নিজের মাথাটা ফরমান আলির কোলে রাখলো। বড় বড় চোখ মেলে ফরমান আলির

মুখের দিকে গভীর আগ্রহে চেয়ে রইলো সে।

ফরমান আলি বললো, 'তাহলে শোনো। এক ছিলো রাজা। তার নাম ভারত। আরো এক রাজা ছিলো।'

হুত্তোৎ বললো, 'আর এক রাজা! বাঃ!'

'হ্যাঁ, অন্য এক রাজাও ছিলো। তার নাম পাকিস্তান। দুজনেরই লোভ ছিলো একটা পরীর ওপর। পরী দেখতে খুব সুন্দরী! আর তার দেশে সুন্দর সুন্দর নদী, সুন্দর সুন্দর বন, সুন্দর সুন্দর সরোবর। সেই পরীর দেশের ওপর লোভ ছিলো আর এক রাজার।'

'আবার একটা রাজা এলো! ইস্, কী মজার গল্প!'

'হ্যাঁ, আর-এক রাজা। পরীর ওপর তার লোভ ছিলো। কেন? না তার বাড়ির কাছেই হলো পরীস্তান। সে প্রথম দুজন রাজার চেয়েও বড়। পরীস্তান আক্রমণ করে সেটাকে দখল করে নেওয়ার খুব ইচ্ছে ছিলো তার। কিন্তু শেষে সে করলো কী, নিজে পরীর দেশ আক্রমণ করলো না।'

'কেন করলো না?'

'কেন করলো না! ওর দেশ তো পরীস্তান থেকে অনেক দূর। তাই সে প্রথম দুজন রাজার মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দিলো। নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করতে করতে যখন দুজনেই কাহিল হয়ে পড়বে, তখন ওরা তাকে পরীর দেশটা ছেড়ে দেবে। পরীটা খুব বিপদে পড়ে গেলো।

তাহলে তো পরীকে বাঁচাতেই হবে। কী করে বাঁচানো যায় ওকে?' হুত্তোৎ বড় ব্যস্ত হয়ে উঠলো। সব গল্পেই পরীকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে হয়। সেজন্যে হুত্তোতেরও দুশ্চিন্তা দেখা দিলো।

ফরমান আলি বললো, 'কী করে বাঁচানো যায়, সেটাই তো এখন ভাবছি। তুমিই বলো।'

'আমি কেন বলবো? তুমি গল্প শোনাচ্ছো না!'

'না, তুমিই বলো। লক্ষ্মী সোনা ছেলে আমার।'

'আচ্ছা, এক কাজ করো। একটা দৈত্য নিয়ে এসো। পরীর বাড়ির সামনে বসিয়ে দাও ওকে। হাতে একটা কৃপাণ দিয়ে। কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেবে না ও। ব্যস্, পরী বেঁচে যাবে।'

'কিন্তু মুশকিল হলো, সেই দৈত্যটা তো থাকে অনেক দূরে।'

'কোথায়?'

'গণরাজ্যে।'

'গণরাজ্য এখান থেকে অনেক দূর?'

'অবিশ্যি গণরাজ্য এখান থেকে এমনিতে খুব দূর না। কিন্তু রাস্তা বড় আঁকাবাঁকা। আর পথে খুব বিপদ।'

'কিচ্ছু ভয় নেই। আমি তোমার সঙ্গে যাবো। সেই দুজন রাজাকেও সঙ্গে

নেবো। আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে যাবো এখান থেকে। গণরাজ্যের দৈত্যকে নিয়ে আসবো এখানে। তারপর আমরা আমাদের পরীকে রক্ষা করবো।'

'আহা, তাহলে আমার এই সুন্দর গল্পটা শেষ হয়।'

হুত্তোৎ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। চোখ দুটো বুজে এলো তার। ফরমান আলির কোলেই ঘুমিয়ে পড়লো সে। নিজের কোলে ঘুমিয়ে পড়া শিশুকে দেখলো ফরমান আলি। সবুজ দূর্বাঘাসের ওপর শুয়ে থাকা শিশু দুটোকেও দেখলো সে। হঠাৎ তার মনে হলো, এখন সে পাকিস্তান যেতে পারবে না, ভারতও যেতে পারবে না। লণ্ডন, নিউইয়র্ক, মস্কো—কোথাও যেতে পারবে না সে। এখন এখানেই থাকতে হবে তাকে। এখানেই নিজের লড়াই লড়তে হবে।

হঠাৎ ফরমান আলি উপলব্ধি করলো, পেলব শুভ্রতায় তার চারদিক ছেয়ে আছে, তার চারপাশে আগুনের শিখার মতো উজ্জ্বল লাল কুঁড়ি। আকাশের দিকে তাকালো সে, সাদা সাদা মেঘের গম্বুজ ভেসে যাচ্ছে। আর সেই গম্বুজে বসে আছে তার পরম সাথী শৈশবের বন্ধু গোপাল। ফরমান আলির দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছে সে।

কাফেলা

বসন্ত সিং বললো, 'এইমাত্র এখান দিয়ে দলটা চলে গেছে। দলটার ওপর হামলা হয়েছে।

মোহন জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কী করে বুঝলে?'

'ভালো করে লক্ষ্য করো, রাস্তার ওপর মাটিতে পা-ঘষার দাগ। আর দ্যাখো, রক্তের ছোপগুলো প্রায় শুকিয়ে এসেছে।'

বসন্ত সিং ও মোহন পশ্চিমদিকে অনেকদূর পর্যন্ত চেয়ে দেখলো। দিগন্ত বিক্ষিপ্ত ধূলিতে আচ্ছন্ন।

মোহনের গলা শুকিয়ে আসছে। চোখ জ্বালা করছে। সাতদিন সে ঘুমোয়নি। অথচ দলটাও চলে গেলো। তার মনে হচ্ছে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেহটা কাঠ হয়ে গেছে। চোখ জ্বালা করছে, কিন্তু চোখে একফোঁটা জল নেই। মুখে থুথু নেই। পায়ে বল নেই। তার মনে হচ্ছে, দলটা চলে গেছে, এখন সে বেশ করে শুকনো কাঠের মতো জ্বলে-পুড়ে শেষ হয়ে যেতে পারে। দলটাকে রক্ষে করার জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে, মনের সমস্ত বল নিয়ে অপেক্ষা করছিলো। আর এই মুহূর্তে তার ইচ্ছে করছে, সে শ্মশানঘাটে চলে যাবে, নিজের ওপর ঘৃতাদি সামগ্রী ঢেলে নিজেকে ভস্মীভূত করবে। নিজেকে এতই শুকনো খটখটে বোধ হচ্ছিলো যে, তার বিশ্বাস, আগুন ধরানোর সঙ্গে সঙ্গে তার শরীর থেকে তীব্র লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। তার পা থরথর করে কেঁপে উঠলো। খপ করে বসন্ত সিং-এর হাত ধরলো সে। তারপর তার অনেকক্ষণ ধূলিধূসর পথের দিকে চেয়ে রইলো।

বসন্ত সিং তার খোঁচা-খোঁচা দাড়িতে আঙুল চালাতে চালাতে জিজ্ঞেস করলো, 'হামিদা তোমায় কী বলেছিলো?'

মোহন বললো, 'চলে যাচ্ছি।'

'রাজী হলো না?'

'না। বলেছিলো, এই দুনিয়াটা আমার কাছে অচেনা লাগছে মোহনভাই। এখানে প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে বিষের জ্বালা। এর হাওয়া-বাতাস যেন আমার রক্ত শুষে নিচ্ছে। আমি এখানে আর থাকতে পারছি নে।'

বসন্ত সিং মোহনের হাত শক্ত করে ধরলো। বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা দীর্ঘশ্বাস প্রাণপণে দমন করলো সে। বললো, 'চলো, ফিরে যাই…

পাহাড়তলিতে নূরমহম্মদের ওখানে বহু লোক জড়ো হয়েছে। ওদের বাঁচাবার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'আমার ঘুম পাচ্ছে।'

'হেঁটে গেলে ঘুম ছেড়ে যাবে।'

ওরা রাস্তা ছেড়ে কাঁকুরে ডাঙায় উঠলো। এখানে খেত নেই, কিন্তু কাঁটা-গাছের ঝোপঝাড় রয়েছে। সূর্যের প্রখর তাপে পাতাগুলো পুড়ে গেছে। গাছগুলোর কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় গায়ে যেন উনুনের আঁচ লাগছে। মাটি থেকে ভাপ যেন ঘূর্ণি হাওয়ায় পাক খেতে খেতে ওপরে উঠছে। গরমে হাঁপাতে হাঁপাতে মোহন আর বসন্ত সিং একসঙ্গে হাঁটছে। কোথাও কোথাও কাঠবিড়ালী গাছের গুঁড়িতে হাঁপাচ্ছে, তাদের পায়ের শব্দে আচমকা লাফ মেরে নিজের নিজের কোটরের দিকে দৌড়ে পালাচ্ছে। হঠাৎ সামনে দিয়ে একটা বড় সাপ সরসর করে রাস্তা দিয়ে চলে গেলো। এক মুহূর্তের জন্যে বসন্ত সিং আর মোহনের পা থেমে গেলো। তারপর আবার হাঁটতে লাগলো ওরা।

মোহন বললো, 'আমি আর হাঁটতে পারছি নে।'

বসন্ত সিং বললো, 'নালার ধারে সাঁকোর নীচে বসবো। একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করবো। কিন্তু বেশীক্ষণ বসা চলবে না। চৌকির লোকজন হয়তো পাহাড়তলির খবর পেয়ে গেছে। দলটারও খবর পেতে পারে। আমাদের তাড়াতাড়ি ওখানে পৌঁছনো উচিত। একটু জোরে হাঁটো। খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লে আমি না হয় তোমাকে বয়ে নিয়ে যাবো।'

মোহন এখন ঠিকভাবে হাঁটতে লাগলো।

নালার ধারে এসে ওরা থামলো। চারদিকে চেয়ে দেখলো, কোনো জনপ্রাণী নেই। নির্জন পৃথিবী। নির্জন আকাশ। একটা চিল পর্যন্ত আকাশে উড়ছে না। নালার জল দয়ে ঘুরপাক খেয়ে ধীরে ধীরে বয়ে চলেছে। বসন্ত সিং খুব মনোযোগ দিয়ে সাঁকোটা দেখতে দেখতে বললো, 'দলটার কিছু লোক এদিক দিয়েও গেছে।'

হঠাৎ মোহন কাছেই একটা ঝোপের নীচে কিছু যেন দেখতে পেলো, 'ওগুলো কী?'

ঝোপে কিছু লাশ পড়ে ছিলো। কেউ কবর খোঁড়ার চেষ্টা করেছে যেন, পণ্ডশ্রম ভেবে ছেড়ে দিয়েছে। কিছু মাটি আর ঘাসপাতা দিয়ে ঢেকে দিয়েছে লাশগুলো। ওপরে বাবলার একটা বড় ডালও রয়েছে। মোহন আর বসন্ত সিং দৌড়ে সেখানে গেলো। ডালটা তুলে ঘাসপাতাগুলো সরাতেই লাশগুলো নজরে পড়লো।

প্রথম লাশটার হাতে একটা শক্ত লাঠি। পায়ে একজোড়া মজবুত জুতো। ময়লা লুঙ্গিতে বাঁধা একটা পুঁটলি। মোহন পুঁটলি খুলে দেখলো, ছোলা। শুকনো ছোলা। ব্যস, আর কিছু নেই। বুকের মাটি সরানো হলো, সেখানে

একটা গভীর ক্ষত। তারপর মাটি সরিয়েও আর কিছু দেখা গেলো না। মাথাটা নেই।

মোহন বললো, 'পিরানদ আর তেলীর লাশ বলে মনে হচ্ছে।'

বসন্ত সিং মাথা নাড়লো, 'না। আমার মনে হয় ফজ্জা কুমোর।'

লাশটা সরিয়ে মোহন দ্বিতীয় লাশ দেখতে শুরু করলো। খালি পা। উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত একটি মেয়ে। বড় জোর বছর সাতেক বয়েস। পরনে সবুজ রঙের সালোয়ার। দাঁত দিয়ে ওপরের ঠোঁট কামড়ে রয়েছে। চোখ বন্ধ। কানে সোনার রিং। শরীরে কোথাও ক্ষতচিহ্ন নেই। মোহন বললো, 'আরে এ তো খোদাবক্সের মেয়ে। একদিন আমি সাঠিপুর থেকে ফিরছিলাম। দুপুরবেলা। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর। মেয়েটি মোষকে জল খাওয়াচ্ছিলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার কাছে লস্যি আছে?' মেয়েটি নালার ধারে কুঁজো রেখেছিলো। এক কুঁজো লস্যি সব ঢকঢক করে খেয়ে ফেললাম আমি। মেয়েটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলো আর হাসছিলো। বললাম, 'আমি তো তোমার সব লস্যি খেয়ে ফেললাম।' ও জবাব দিলো, 'তাতে কী আছে! তুমি তো আমাদের গাঁয়ের লোক। কাল তোমার বাড়িতে গিয়ে এক কুঁজো লস্যি ভরে আনবো।' তারপর মোহন জিজ্ঞেস করলো, 'কিন্তু ও মরলো কী করে?'

বসন্ত সিং চাদর দিয়ে মেয়েটির মুখ ঢেকে দিলো। তারপর মোহনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বড় কষ্টে বললো, 'না জিজ্ঞেস করাই ভালো।'

তৃতীয় লাশের ওপর থেকে যখন মাটি সরানো হলো, তখন প্রথমেই কিছু বইপত্তর বেরলো। একটি দুর্বল পাতলা হাতে বইগুলো ধরে আছে। মোহন বইগুলোর পাতা ওল্টাতে লাগলো। পাতা ওল্টানো যাচ্ছিলো না। রক্তে পাতাগুলো একটার সঙ্গে আর একটা জুড়ে গেছে।

মোহন বললো, 'এটা ভারতের ভূগোল।'

বসন্ত সিং বললো, 'কিন্তু এতে বিভক্ত পাঞ্জাবের কোনো ম্যাপ নেই। গজনীর সুলতান মামুদ থেকে লর্ড ওয়াভেল পর্যন্ত কেউ পাঞ্জাব বিভক্ত করতে সাহস পায়নি। এদিক দিয়েই এসেছে আর্য, গ্রীক, তুর্কী, শক ও হুণ, কিন্তু পাঞ্জাবকে দু-টুকরো করতে পারেনি কেউই।'

'এটা তো ভারতের ইতিহাস, কিন্তু এতে শুধু প্রস্তর- ও ধাতু-যুগেরই আলোচনা রয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে ভারতে যে প্রস্তর- ও ধাতু-যুগ ফিরে এসেছে, তার আলোচনা নেই।' মোহন তৃতীয় বইখানার পাতা ওল্টালো, 'এটা বিজ্ঞান, এটা ড্রইং বুক, এটা…এটা কী?'

মোহন ও বসন্ত সিং দেখলো, ছেলেটির অন্য হাতে একটা পুঁটলি। বুকের কাছে চেপে ধরে আছে সে। পুঁটলি খুলে দেখা গেলো, তার মধ্যে রয়েছে কিছু সালোয়ার, ডুরে জামা, আর একটা নতুন বই—জওহরলালের 'ডিস্‌কভারি অব ইণ্ডিয়া'। সবগুলোই রক্তে রাঙা।

বসন্ত সিং বললো, 'পনেরোই আগস্ট কত খুশী হয়ে নতুন কাপড় তৈরী করেছে। ভেবে ত্থাখো, বই কেনার জন্যে কেমন পয়সা জমিয়েছে!'

মোহন কাঁপা-কাঁপা হাতে বইটা তুললো। বললো, 'জওহরলালজী যদি ভারতকে বুঝতো, তাহলে ও হয়তো এ-ভুল করতো না। সম্ভবত বইপত্তর নিয়েই পড়ে থেকেছে, মানুষের সঙ্গে মেশেনি।...আর তাই হয়তো ছেলেটি মারা পড়লো। সেই সঙ্গে বইগুলোও ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। এই ইতিহাস, এই ভূগোল, এই বিজ্ঞান—মানুষের সমস্ত জ্ঞানভাণ্ডার মাটিতে মিশে গেছে আজ। এই অবোধ শিশুর কাতর মুখখানা দেখে আমার মনে হচ্ছে না, নিজের মৃত্যুর জন্যে ও বিলাপ করছে, বরং ও বিলাপ করছে জ্ঞান দর্শন সাহিত্য বিজ্ঞান তর্কশাস্ত্র বিবেকবুদ্ধি—সবকিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার জন্যে।'

বসন্ত সিং নতুন কাপড়চোপড় থেকে একটা সালোয়ার নিয়ে ছেলেটিকে পরাতে লাগলো।

মোহন জিজ্ঞেস করলো, 'কী করছো?'

বসন্ত সিং উত্তর দিলো, 'আমি ওকে নতুন সালোয়ার পরাবো। ওর রক্তে রাঙা নতুন জামা পরাবো। ওর হাতে 'ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া' দিয়ে ওকে নতুন দিল্লী নিয়ে যাবো। জওহরলালজীর কাছে।'

মোহন দুঃখের হাসি হাসলো, 'নতুন দিল্লী তো অনেক দূর। ওকে বরং কাছাকাছি কোনো গাঁয়ের স্কুলে নিয়ে চলো। জাটদের ছেলেদের জিজ্ঞেস করো, কে এই বইগুলো রক্তে রাঙিয়ে দিয়েছে? তারপর লুধিয়ানার বাজারের ও স্কুল-কলেজের ছেলেদের জিজ্ঞেস করো, এই বইগুলো চেনো তোমরা? জ্ঞান-বিজ্ঞানের জিম্মেদার, তোমাদের ধন-সম্পদ লুট হয়ে যাচ্ছিলো যখন, তখন তোমরা কোথায় ছিলে? ধর্মবটের কোলাহলে ব্যস্ত ছিলে বন্ধু, তোমরাই তোমাদের পরম বন্ধু বইগুলোর ওপর ছুরি চালালে! আর হিন্দু, শিখ আর মুসলমান ছাত্র মিলে তোমরা বিজ্ঞান-সাহিত্য-দর্শনের সঙ্গে প্রতারণা করলে!'

মোহন হঠাৎ বইটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

বসন্ত সিংও উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'ভুলে যাচ্ছো বন্ধু, দলটাকে যারা পৌঁছে দিতে গেছে, তাদের মধ্যে আমাদের পাঁচজন ছাত্রও রয়েছে।'

মোহন উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, 'পাঁচ হাজারের মধ্যে পাঁচজন, কিংবা পাঁচ লক্ষের মধ্যে পাঁচজন!...পাঁচ কম পাঁচ লক্ষকে কি সাম্প্রদায়িকতার কেউটে দংশন করেনি?'

বসন্ত সিং ছেলেটিকে কাপড় পরাতে পরাতে কিছু ভাবছিলো। ভেবে জবাব দিতে যাচ্ছিলো, এমন সময় সাঁকোর ওপরে পায়ের শব্দ শোনা গেলো। দুই বন্ধু ঘুরে দেখলো, চার-পাঁচজন লোক দৌড়তে দৌড়তে তাদের দিকেই আসছে। ওদের সামনে কুলবন্ত সিং আর গোপলাল।

বসন্ত সিং জিজ্ঞেস করলো, 'কী খবর কুলবন্ত?'

বসন্ত সিং-এর ছোট ভাই কুলবন্ত। জবাব দিলো, 'দলের ওপর হামলা হয়েছে। আমরা অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি। জগজিৎ মারা গেছে। জাটরা দলে খুব ভারী।' একটু থামলো সে। তারপর মোহনের দিকে চেয়ে বললো, 'দশ-বারোজন লোক মারা গেছে। হামিদাকে তুলে নিয়ে গেছে ওরা।'

মোহন কাঁপতে লাগলো।

বসন্ত সিং-এর ঘাড়ের শিরাগুলো ফুলে উঠলো। মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠলো তার। মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা চেনো ওদের?'

কুলবন্ত বলল, 'হ্যাঁ, আমাদের গাঁয়েরই লোক সব। মোতি, ঢেরা, শামসের সিং আর নাঘো। ওরা গাঁয়ের হিন্দু আর শিখদের ভয় দেখিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে দলে টেনে নিয়েছে ওদের। ওরা এখন পাহাড়তলিতে চড়াও হতে যাচ্ছে। নূর মহম্মদ নম্বরদারের বাড়ি।'

বসন্ত সিং জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা ক'জন রয়েছো?'

কুলবন্ত বলল, 'এখন গাঁয়ে যাওয়া মানে মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া।'

'আমার সঙ্গে কে আসবে? আমি গাঁয়ে যাচ্ছি।'

কুলবন্ত তার জামা ধরে ফেলল। অনুনয়ের কণ্ঠে বলল, 'তোমাকে মেরে ফেলবে ওরা। এসময় যেও না। ওয়াহ্ গুরুর দিব্যি।'

বসন্ত সিং নিজের জামা ছাড়িয়ে নিয়ে বেশ কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আমার সঙ্গে কে যেতে চাও বলো?'

কুলবন্ত সিং আর তার চারজন সঙ্গী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মোহন আর বসন্ত সিং গাঁয়ের দিকে হাঁটতে লাগলো। কিন্তু ওরা দাঁড়িয়ে রইল সেইভাবেই। মোহন আর বসন্ত সিং অনেকটা চলে এলো, কিন্তু ওরা দাঁড়িয়েই রইলো। অনেক দূর এসে মোহন একবার পেছন ফিরে তাকাতেই বসন্ত সিং বললো, 'চলে এসো। ওরা আর আসবে না। মরে গেছে ওরা।'

তারপর মোহন আর বসন্ত সিং দৌড়ল গাঁয়ের দিকে। গাঁয়ের চৌহদ্দিতে পৌঁছে ওরা থামল একটু। একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকালো। মোহন জিজ্ঞেস, করল, 'তোমার কাছে রিভলবার আছে?'

'হ্যাঁ।'

'আমার কাছেও রয়েছে।'

'এগিয়ে চলো।'

ওরা আবার হাঁটতে লাগলো। বসন্ত সিং-এর বাড়ি পর্যন্ত এলো ওরা, কিন্তু কারোর সঙ্গে দেখা হলো না। দরজা বন্ধ। চারদিকে স্তব্ধতা। তেলীর ঘরের দরজা ভেঙে পড়ে আছে। উঠোনে ভাঙা-ফাটা হাঁড়ি চোখে পড়ছে। আর একটু এগোতেই দাতা হালুইকরকে দেখা গেলো। সে একটা কুড়ুলে ধার দিচ্ছে।

মোহন বলল, 'তুমিও দাতারাম! হাতা নাড়তে নাড়তে কুড়ুলে চলে এলে? জয় হিন্দু ধরম কি!'

দাতারাম লজ্জিত হয়ে বলল, 'সবাই লুটে নিচ্ছে। তাই ভাবলাম, আমিই বা পিছে পড়ে থাকি কেন!'

বসন্ত সিং ওর হাত থেকে কুড়ুলটা কেড়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো, 'তেলীদের পাড়ায় তোমার বাড়ি। চিরকাল ওরা তোমার দোকানে খেয়েছে, তোমার রুজি-রোজগার চালিয়েছে। লজ্জা করে না তোমার?'

দাতারাম চেঁচিয়ে উঠল, 'লজ্জার জন্যে শুধু আমিই পড়ে আছি! মোতি, নাঘো, শামশেরকে বলো না? গাঁয়ের জোয়ান চ্যাংড়াদের বলো, তবেই বুঝি কথা। এক বুড়ো হালুইকরের কুড়ুল কেড়ে নিয়ে খুব বাহাদুরি দেখাচ্ছো!'

কিন্তু তখন মোহন ও বসন্ত সিং অনেকটা চলে এসেছে।

পুকুরের পাড়ে একটা বটগাছ। তার নীচে একটা খুঁটিতে লাল লেটার-বক্স টাঙানো। সেখানে দুটো গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। মহারাজ পালোয়ান আর ঝব্বো স্যাকরা, ফজ্জা কুমোরের বাড়ি থেকে বড় বড় বোঁচকা বেঁধে নিয়ে বেরিয়ে আসছে। মোহন ও বসন্ত সিংকে দেখে ওরা থমকে দাঁড়ালো। মোহন গিয়ে মহারাজ পালোয়ানের জামার কলার ধরলো 'ওরা হামিদাকে কোথায় নিয়ে গেছে বলো।'

মহারাজ মোহনের হাতে একটা জোরে ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো। দা-টা শক্ত করে ধরলো সে। বসন্ত সিং তার সামনে রিভলবার ধরে বলল, 'শীগ্‌গীর বলো। আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

মহারাজের মুখ থেকে ফেনা গড়াতে লাগল, কিন্তু ও নিরুপায়। ঝব্বো স্যাকরা কাঁপতে কাঁপতে বললো, 'ওরা বলছিলো, সবাই নাঘোর বাড়িতে জমা হবে। ওখানেই ভোজ খাওয়ানো হবে। সারা গাঁয়েই হামিদার নেমন্তন্ন। ওখানেই...' হঠাৎ সে চুপ করে গেলো। মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলো সে।

মোহন কাঁপতে লাগলো। বসন্ত সিং বললো, 'তোমরা আমাদের সঙ্গে নাঘোর বাড়ি চলো।'

মহারাজ আর ঝব্বো দুজনেই যেতে অস্বীকার করল। ঝব্বো বললো, 'নাঘোর কাছে রাইফেল আছে। শামশেরের কাছে রিভলবার আছে। আমি শুনেছি, ওরা তোমাকেও শেষ করে দেবে।'

মোহন ও বসন্ত সিং দ্রুত হাঁটতে লাগলো। পিপুল গাছের নীচে অনেক লোক জড়ো হয়েছে, কারণ সামনেই নাঘোর বাড়ি। ওদের হাতে তরোয়াল, বর্শা, দা, আর কুড়ুল। নাঘোর বাড়ি থেকে মাঝে মাঝে একটা আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ছে, অমনি পাশবিক উল্লাসে চিৎকার করে উঠছে লোকগুলো। একটা লোক ঢোল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর্তনাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঢোল বাজাতে শুরু করছে। দু-চারজন লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে নাচানাচি করছে।

মোহন ও বসন্ত সিংকে সামনে আসতে দেখেই লোকগুলো হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলো। ঢোলওয়ালা ঢোল বাজানো বন্ধ করলো। নাচছিলো যারা, তাদের পা

থেমে গেলো। কেউ কেউ তরোয়াল বর্শা কুড়ুল সামলে ধরলো। যারা এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো, তারা দলের মধ্যে এক জায়গায় এসে জড়ো হলো, মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো মোহন ও বসন্ত সিংকে।

মোহন ও বসন্ত সিং পিপুল গাছের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। তাদের পেছনে নাঘোর বাড়ি। সেখান থেকে মাঝে মাঝে একটা আর্ত চিৎকার ভেসে আসছিলো। সামনে লোকজন। এই গাঁয়েরই তারা। দীর্ঘকাল এদের সঙ্গেই একত্রে বসবাস করে আসছে বসন্ত সিং। তারই ভাই-বন্ধু আত্মীয়-স্বজন জ্ঞাতি-গোষ্ঠী। হিন্দু ও শিখ। এবং আটশো বছর ধরে এদেরই ভাই-বন্ধু আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কের প্রীতিবন্ধনে পাশাপাশি বাস করে আসছে মুসলমান। আর এখন ১৯৪৭ সালের ১৬ই আগস্ট বিকেলবেলা ওদের চেহারা দেখে মনে হয় না, বসন্ত সিং-এর সঙ্গে একদিন তাদের কোনো সম্পর্ক ছিলো।

নাঘোর বাড়ি থেকে আবার একটা আর্ত চিৎকার ভেসে এলো। বসন্ত সিং কঠোর স্বরে বললো, 'ঢোল বাজাও এখন। থেমে গেলো কেন? ভেতরে তো সেই হামিদা রয়েছে, যাকে কোলে নিয়ে খাইয়ে দিতে তোমরা। রল্‌দো খুড়ো, তুমি নাচতে নাচতে থেমে গেলে কেন? তোমারই তো মেয়ে হামিদা, যাকে 'মেয়ে আমার, মেয়ে আমার' বলতে বলতে তোমার মুখ কখনো ক্লান্ত হতো না। তোমার সেই মেয়েই হামিদা, যে ছেলেবেলায় তোমার মুখ থেকে খাবার কেড়ে নিয়ে খেয়ে নিত। তোমারই হামিদা বানু যে লুধিয়ানায় পড়তো। তুমিই তার বিয়েতে নিজের ট্যাঁক থেকে যৌতুক কিনে দেবে বলেছিলে। হামিদার এই সেই বিয়ে দিচ্ছ তুমি, না?'

নাঘোর বাড়ি থেকে আবার সেই তীক্ষ্ণ চিৎকার ছড়িয়ে পড়লো। মোহন বললো, 'আমি ভেতরে যাচ্ছি।'

বসন্ত সিং নিষেধ করল, 'থামো।' তারপর ভিড়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'শুনলাম, তোমরা না-কি আমাকে খুন করতে চাও?'

লোকজন সবাই স্তব্ধ।

বসন্ত সিং নিজের রিভলবার তাদের সামনে ছুঁড়ে দিলো। মোহনও নিজের রিভলবার ফেলে দিয়ে বলল, 'বসন্ত সিং, আমি ভেতরে যাচ্ছি। তুমি ওদের বোঝাও।'

বসন্ত সিং বললো, 'থামো। এরা এখন—একটু দাঁড়াও, আমিও সঙ্গে যাচ্ছি।'

'কিন্তু……মোতিকে আমি বোঝাতে পারব। আমার কথা শুনবে ও। যাচ্ছি আমি।' বলতে বলতে মোহন নাঘোর বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলো।

লোকগুলো পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে রইলো।

ভেতর থেকে দরজায় খটখট করার শব্দ এলো। তারপর কেউ যেন দরজা খুললো। হঠাৎ গুলির শব্দ। সেই সঙ্গে একটি মেয়ের আর্তনাদ। তারপর চার-দিকে স্তব্ধতা।

বসন্ত সিং লোকগুলোর দিকে ফিরে তাকালো, 'আচ্ছা, এবার আমি নিজে যাচ্ছি।' সে ভেতরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালো।

ভিড়ের মধ্যে একজন বলল, 'ভেতরে যেও না। ওরা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে আছে। তোমাকেও মেরে ফেলবে।'

আর একজন বললো, 'এই রিভলবারটা সাথে নিয়ে যাও বসন্ত সিং।' সে রিভলবারটা বসন্ত সিং-এর দিকে ছুঁড়ে দিলো।

রিভলবারটা ওখানেই পড়ে রইলো। সেটাকে পায়ে লাথি মেরে সে লোক-গুলোকে বলল, 'এই রিভলবার তোমাদের মতো ভীতুদের জন্যে।' ভেতরে চলে গেলো সে।

ভেতরে দরজায় খটখট শব্দ। কেউ যেন দরজা খুললো। হঠাৎ দড়াম করে কিছু একটা পড়ে যাওয়ার আওয়াজ। আবার দরজা বন্ধ হলো। আবার চারদিকে স্তব্ধতা।

ভিড়ের মধ্যে লোকগুলোর যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এলো। বুক ঢিপঢিপ করতে লাগলো। হাত থেকে কুড়ুল খসে পড়লো তাদের।

অনেকক্ষণ পরে দরজা খুলল। বসন্ত সিং আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো। ডান কাঁধে মোহনের লাশ, বাঁ কাঁধে হামিদার। দু'টি লাশ থেকেই দরদর করে রক্ত ঝরছে। সে নাঘোর বাড়ির সদর দরজায় এসে দাঁড়ালো।

সামনে লোকগুলো পাথরের মতো বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

বসন্ত সিং হতাশ গলায় বললো, 'আমার গুরুজন, আমার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন, তোমরা আমাদের বহু বছরের পরিশ্রম জলে ভাসিয়ে দিলে। পুরনো জগতের ধ্যান-ধারণায় বিভ্রান্ত হয়ে নতুন জগৎকে দশ বছর পেছনে ঠেলে দিলে। আমি এখন গাঁয়ের চণ্ডীমণ্ডপে যাচ্ছি। পথভ্রষ্ট বন্ধুদের পথ চেয়ে থাকব সেখানে। কারণ আজ সন্ধ্যে হতে না হতেই পাহাড়তলিতে নূর মহম্মদের বাড়িতে পৌঁছতে হবে। সেখানে যে সব লোক জড়ো হয়েছে, তাদের বাঁচাতে হবে। এতে কে কে সাহায্য করতে চাও আমাকে?'

লোকগুলো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। নিজের জায়গা থেকে এক পা-ও নাড়লো না কেউ।

বসন্ত সিং দুটো লাশই কাঁধে নিয়ে মাথা হেঁট করে আস্তে আস্তে সেখান থেকে হাঁটতে লাগলো। চণ্ডীমণ্ডপে পৌঁছে চারদিকে তাকালো। সেখানে কেউ আসেনি। চণ্ডীমণ্ডপ মল্লযুদ্ধের একটা আখড়াও বটে। এখানে সে চাষীদের সঙ্গে বড় বড় লড়াইয়ে যোগ দিয়েছে। কয়েকবার হারতেও হয়েছে তাকে। কিন্তু এমন পরাজয় কখনো কপালে জোটেনি।

বসন্ত সিং চণ্ডীমণ্ডপের খোলা জায়গাটার দিকে এগিয়ে গেলো। জায়গাটার মাঝখানে একটা লাল রঙের পতাকা পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। সেই পতাকার নীচে গিয়ে সে দাঁড়াল। একা এবং নিঃসঙ্গ। তার বাঁ কাঁধে হামিদার লাশ,

ডান কাঁধে মোহনের। সেই দুটো লাশই কাঁধে নিয়ে সে একাকী পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে। ইণ্টারন্যাশনাল গাইছিলো সে।

অনেকক্ষণ সে একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাইলো। কিন্তু কেউ এলো না। তার পা দুটো তেতে আঙরার মতো লাল হয়ে উঠেছে। হামিদা ও মোহনের রক্ত আর তার ঘাম একসঙ্গে মিলে শুকনো মাটিতে গড়িয়ে পড়ছে। এবং তার একক কণ্ঠস্বর দুপুরের স্তব্ধতায় চারদিকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। শুধু একটি পতাকা পত্‌পত্‌ করে উড়ছে হাওয়ায়।

সে সারাটা দুপুর নিজের দুই মৃত সঙ্গীকে কাঁধে নিয়ে গেয়ে চললো...... কেউ এলো না। স্তব্ধ দিগন্ত। শূন্য চণ্ডীমণ্ডপ। নির্জন পৃথিবী।

বিকেলের কাছাকাছি বসন্ত সিং দেখলো, একজন দুজন করে নিরস্ত্র কৃষক পাড়া দিয়ে মাথা নীচু করে এসে চণ্ডীমণ্ডপে জড়ো হচ্ছে।

ভগতরাম

এইমাত্র ছেলেটা আমার বাঁ হাতের কড়ে আঙুল দাঁতে এমন জোরে কামড়ে দিয়েছে যে আমি চিৎকার না করে থাকতে পারিনি। রেগে গিয়ে দু-তিন চড় কষিয়েছি ওকে। বেচারা তখন থেকে কুকুরের বাচ্চার মতো হাঁ-হাঁ করে কাঁদছে। বদমাশ ছেলেটা দেখতে লাজুক-লাজুক, কিন্তু তার ক্ষীণ পাতলা হাত দুটিতে জড়িয়ে ধরে যখন, তখন দড়ির ফাঁসের মতো মনে হয়। ওর দাঁতগুলো তো দুধেরই দাঁত, কিন্তু কামড়াতে কাঠবিড়ালীকেও হার মানিয়ে দেয়। এই ছোট্ট শিশুর সরল দুষ্টুমি দেখে আমার শৈশবের একটি ঘটনা মনে পড়লো। এ পর্যন্ত আমি ঘটনাটিকে নিতান্তই একটা সাধারণ ঘটনা বলে মনে করতাম এবং বড় হয়ে ঘটনাটি একদম ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু দেখুন না, বিস্মৃতিও কিরকম আশ্চর্য বিশ্বাসঘাতকতা করে, তার ছায়াতলে কত না আশ্চর্য রহস্য ঘুমিয়ে থাকে। বাহ্যত ঘটনাটি সামান্যই। শৈশবে আমাদের গ্রামের জনৈক ভগতরামের বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলটা কামড়ে দিয়েছিলাম এবং সে আমায় চড়-চাপড় না মেরে আপেল ও আলুবোখরা দিয়েছিলো। ঘটনাটি এতদিন ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু ভানুমতীর ঝাঁপির কেরামতিটাই দেখুন একবার। মামুলী ঘটনাটা এতদিন একটি ঘুমন্ত সাপের মতো স্মৃতির স্তূপে চাপা ছিলো। যেই আমার ছেলেটি আমার কড়ে আঙুল দাঁতে কামড়ে দিয়েছে এবং আমি তাকে পিটুনি লাগিয়েছি, অমনি পঁচিশ-তিরিশ বছরের ঘুমন্ত সাপটি জেগে উঠেছে ফণা তুলে আমার স্মৃতির চার দেয়ালের মধ্যে ফোঁসফোঁস করছে। কে এখন তাকে মেরে তাড়াতে পারে! বরং তাকে এখন দুধ খাওয়াতে হবে। বেশ তো, ঘটনাটি আগে শুনে নিন। আগেই যেটা বলে নিয়েছি, এটা শৈশবের ঘটনা, তখন আমরা রঙপুর গাঁয়ে বাস করছি। রঙপুর জোড়ী তহশিলের সদর, সেজন্যে এখন সেটা পদমর্যাদায় ছোটখাটো এক শহর। কিন্তু আমরা যখন সেখানে থাকতাম, তখন তার জনসংখ্যা খুব বেশী ছিলো না। বড় জোর আড়াই-তিন শো ঘরের বসতি। তার মধ্যে অধিকাংশই ছিল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ঘর, দশ-বারো ঘর জোলা আর কামারের। পাঁচ-ছ ঘর ছুতোর, ওইরকমই চামার আর ধোপা। আর সারা গ্রামটা কুড়িয়ে-বাড়িয়ে আট-দশ ঘর মুসলমান হবে। কিন্তু তাদের যা অবস্থা, কহতব্য নয়। সেজন্যে এখানে তাদের বর্ণনা দেওয়াটাই অর্থহীন।

গ্রামে সমাজের মুখিয়া ছিল লালা কংশীরাম। সেটা তো ব্রাহ্মণ সমাজের

মূলনীতি অনুসারে—কোন ব্রাহ্মণেরই সমাজের মুখিয়া হওয়া উচিত। তাছাড়া গ্রামে ব্রাহ্মণের সংখ্যাটাই বেশী। তার ওপর গ্রামের ক্ষত্রিয়রাও লালা কংশী-রামকেই নিজেদের মুখিয়া হিসেবে নির্বাচন করেছিলো। গ্রামের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে বেশী শিক্ষিত, অর্থাৎ নতুন শহরেও পড়ে এসেছে। যে চিঠিপত্র ডাক-ঘরের লোকেরাও পড়তে পারে না, সে-সবও গড়গড় করে পড়ে ফেলে সে। তমসুক, হুণ্ডি, নালিশ, সমন, সাক্ষ্য, শনাক্তকরণ ছাড়াও নতুন শহরের বড় আদালতের সমস্ত কাজেই পাকাপোক্ত। সেজন্যে গ্রামের বিপদে-আপদে প্রত্যেকেই লালা কংশীরামকে খোঁজে, সে কংশীরামের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে হোক আর না হোক। লালা কংশীরামও আজ পর্যন্ত কখনো কারোর বিপদে সাহায্য করতে অস্বীকার করেনি। সেজন্যেই সে গ্রামের মুখিয়া। গ্রামের মোড়ল। এবং রঙপুরের বাইরেও যতদূর পর্যন্ত ধানক্ষেত চোখে পড়ে, সর্বত্রই সুনাম তার।

এইরকম ভদ্রলোক লালার মেজ ভাই বংশীরাম দাদার প্রত্যেকটি সৎকাজে সাহায্য করে, তবু গ্রামের লোক তাকে অতটা ভালো চোখে দেখে না। কারণ সে ব্রাহ্মণ-ধর্ম ত্যাগ করেছে। তারপর গুরু নানকের শিষ্য হয়ে পন্থে সামিল হয়েছে। নিজের বাড়িতে একটা ছোট গুরুদ্বারও তৈরি করেছে সে এবং নতুন শহর থেকে দেখতে-সুশ্রী ভালোমানুষ-গোছের এক পাঠককে আনিয়ে গ্রামে শিখ মতবাদ প্রচারের ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

লালা বংশীরাম শিখ হয়ে যেতেই গ্রামে হৈ-চৈ পড়ে গেলো, বৈধ-অবৈধর প্রশ্ন দেখা দিলো। মুসলমান ও শিখদের জন্য একটা ধর্মীয় প্রশ্ন ছিলই। তার ওপর ভেড়া-ছাগল মোরগ-মুরগীর জীবন-মৃত্যুর প্রশ্নটাও রয়েছে। কিন্তু মানুষের বাজনা-বাদ্যির আখড়ায় পশুদের আওয়াজ কে শোনে!

লালা বংশীরামের ছোট ভাইয়ের নাম ভগতরাম। শৈশবে আমি যার বুড়ো আঙুলটা কামড়ে দিয়েছিলাম, এ সেই লোকটি। কেমন করে ঘটেছিলো, সেটা পরে বলবো। এখন তো তার কীর্তিকলাপটাই দেখুন—মানে, বেজায় লম্পট, ভবঘুরে, বদমাশ। নাম তার ভগতরাম। কিন্তু আসলে লোকটা রামের ভক্ত নয়, শয়তানের ভক্ত। রঙপুরে লম্পটগিরি বদমায়েশি নেই। লম্পটগিরি বেহায়াপনার নাম বেঁচে আছে শুধু ভগতরামের জন্যে। নইলে রঙপুর এমনি ভদ্রলোকের গ্রাম যে সেখানে ফেরেশ্‌তারা আসতেও ভয় পায়।

সততা, শুদ্ধতা, ধর্মকর্মের পবিত্র জ্যোতিতে প্রত্যেকটি মানুষের মুখ-চোখ উজ্জ্বল। কখনো মারপিট হয় না। ধার-দেনা ঠিক সময়ে আদায় হয়। আদায় না হলে জমি-জায়গা নীলাম হয়ে যায়। তারপর লালা কংশীরাম দেনাদারকে আবার টাকা দিয়ে কাজে লাগায়। মুসলমান বেচারারা এমন দুর্বল এবং সংখ্যায় এত কম যে ঝগড়া করার সাহসই নেই তাদের। সবাই বসে বসে মসজিদের গম্বুজ ও মিনারগুলির দিকে নীরবে চেয়ে থাকে। কারণ গ্রামে ওদের আজান দেওয়া নিষেধ।

নীচু জাত, অচ্ছুতদের সমস্ত কাজকর্মই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের কাছেই। কিন্তু ওরাও টুঁ শব্দ করতে পারে না। এ-ছাড়া জীবন যে অন্য কোনরকম হতে পারে, সেটা বোঝেই না তারা। যেটা চলছে, সেটাই ঠিক। মুসলমানরাও তাই মনে করে। এই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, চামার প্রভৃতি যত লোক রয়েছে, সবাই এক সঙ্গে মিলে ভগতরামকে গালিগালাজ দেয়। কারণ ওর জাতপাতের তো কোন বালাই নেই।

ভগতরাম আস্ত গোঁয়ার। কথাবার্তা চোয়াড়ের মতো, দেখতেও চোয়াড়। মোটা বুদ্ধি, বড় বড় হাত-পা, বড় বড় দাঁত। সব সময় বত্রিশটে দাঁত বার করেই আছে। ঠোঁট দিয়ে লালা গড়ায় টপটপ করে। যখন হাসে, দাঁতের পুরো মাড়ী বেরিয়ে পড়ে। গ্রামের সব লোকের মাথা ন্যাড়ামুড়ো করে কামানো, প্রত্যেক হিন্দুর মাথায় টিকি। কিন্তু ভগতরাম বেলুচীদের মতো মাথায় লম্বা লম্বা চুল রেখেছে, টিকি উধাও। মাথায় একগাদা উকুন। প্রায়ই বাড়ির বাইরে বসে বসে উকুন বাছে। দিনে দু-তিনবার করে মাথায় সরষের তেল মাথে। মাঝখানে সিঁথি কেটে, জুলফি পরিপাটি করে, গলায় ফুলের মালা পরে গ্রামের ঝরণার চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। এই বেলেল্লাপনার জন্যে সে কয়েকবার মারও খেয়েছে, কিন্তু তাতে তার কিছুই শিক্ষা হয়নি। গায়ের চামড়া বেজায় পুরু। আমার তো মনে হয়, ওর কাণ্ডজ্ঞান বলতে কিছু নেই। আক্কেলই গজায়নি এখনো ওর। জানোয়ারকে মানুষ বানিয়ে দিলে যা হয়! ভগতরাম তো শতকরা একশো ভাগই জানোয়ার। তাই গ্রামের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ধনী, দরিদ্র, হিন্দু, মুসলমান, স্যাকরা, চামার – সবাই ঘেন্না করে ওকে।

কিন্তু যেহেতু লালা কংশীরামের ছোট ভাই এবং গ্রামের সবচেয়ে বড় ঘরের একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি, সেজন্যে অপছন্দ সত্ত্বেও গ্রামের লোক তার বেঢপ গড়ন ও বেহায়া চাল-চলন বরদাস্ত করে। আজ পর্যন্ত করেই এসেছে। কিন্তু আমরা যখন রঙপুরে এলাম, তখন তার দাদা নাজেহাল হয়ে ভগতরামকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। একটা আটাচাকি দিয়েছে, সেখানে কাজ করে সে। রাত্রে সেখানেই ঘুমোয়। কারণ আটাচাকিটা দিন-রাতই চলে। কখন কার আটার দরকার হয়ে পড়ে, চাদরে বেঁধে কিংবা ভেড়ার খালে ভুট্টা কিংবা গম নিয়ে এসে হাজির হয়, তার ঠিক নেই। তাছাড়া সারাদিনেও যেসব গম বা ভুট্টা পেষা হয় না, সেগুলো ওখানেই থাকে। সেসব দেখাশোনার জন্যেও ওখানে একজনের থাকা দরকার। এইসব সাত-পাঁচ ভেবেচিন্তেই কংশীরাম তার ছোট ভাই ভগতরামকে আটাচাকিতে কাজ করার দায়িত্বটা ছেড়ে দিয়েছে। লালা কংশীরামের আটাচাকি গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে নামকরা, বলতে গেলে, সারা গ্রামের গম-ভুট্টা ওখানেই পেষাই হয়। আরো একটা আটা-চাকি আছে, কিন্তু সেটা সাধারণত মুসলমান, অচ্ছুত ও নীচু জাতের লোকদের জন্যেই। অবিশ্যি যখন বড় আটাচাকিটা চলতে চলতে বন্ধ হয়ে যায়, বিরাট চাকতিটা কাজ

করতে অস্বীকার করে, কিংবা যখন চাকতির পাটায় পাথুরে দাঁত তৈরী করার জন্যে সেটাকে উপুড় করে ফেলা হয়, তখন অন্য আটাচাকির মালিকের কয়েক-দিন বেশ ভালোই আমদানি হতে থাকে। নইলে বড় আটাচাকিতে খদ্দেরের ভিড় লেগেই থাকে।

বড় আটাচাকিটা যখন চলে, তখন অচ্ছুত কিংবা মুসলমানদের কারোর সাহস নেই, আর সাহসই বা বলবো কেন, তাদের ধারণাতেই আসে না যে তারা বড় চাকিতে গম বা ভুট্টা পিষতে পারে।

প্রথম প্রথম যখন ভগতরাম কাজের দেখাশোনা করতে লাগলো, তখন কিছু দিন এই নিয়ম-কানুনই বজায় রইলো। কিন্তু পরে তার বেয়াড়াপনা, কিংবা বলতে পারেন, তার শয়তানিপনা মাথায় ভর করলো। ভাবলো, চালিয়ে যাই, কি আছে এতে! যে আসবে আসুক, আটা পিষে নিয়ে যাক। পাথরের দুটো চাকতি বৈ তো নয়! তার ওপর এসব গম-ভুট্টা কুকুরেও খায়। বরং এর ফলে আটাচাকির আমদানিটাও বাড়বে, অন্য আটাচাকিটার হাল এমনিতেই খারাপ, আরো খারাপ হয়ে পড়বে। এমন কি সেটা হয়তো বন্ধই হয়ে যেতে পারে। মোট কথা, এই রকমই কোন খারাপ চিন্তা তার মাথায় ঢুকেছিলো। যার ফলে সে গ্রামের যত চামার, অচ্ছুত,নীচু জাত, সবাইকে তার আটাচাকিতে আমন্ত্রণ জানালো।

প্রথমে তো লোকগুলো বেশ জোরালোভাবেই অস্বীকার করলো, 'সেটা কি হতে পারে? কি সব বলছো লালা। তোমরা হলে রাজা, আমরা প্রজা। এটা তোমাদের আটাচাকি,ওটা আমাদের। আমরা এখানে এসেই বা পেষাই করবো কেন? না বাবা, ও কাজ আমাদের দ্বারা হবে না। অন্য কিছু করতে বলো, করতে রাজী আছি। কিন্তু এ কাজে আমরা নেই।'

কিন্তু ভগতরাম শেষ পর্যন্ত চালাকিতেই বেচারাদের ফুসলিয়ে নিলো। ওরা ঠিক করলো, ওদের গম-ভুট্টা নিয়ে ওরা তার আটাচকিতেই আসবে, সেখানেই পেষাই করবে।

এমন কথা কি আর সমাজে ঢাকা-চাপা থাকে! সমাজে শোরগোল পড়ে গেলো। হৈ-হট্টগোল শুরু হলো। রোজ ভগতরামের সঙ্গে ঝগড়া হতে লাগলো। তাগড়া লোক। সেজন্যে গালিগালাজও চুপচাপ সহ্য করে নেয়। হেসেই উড়িয়ে দেয় ব্যাপারটা। কিন্তু একদিন রেগে গিয়ে সে দু-চারজনকে পিটুনি দিলো। তারপর সে নিজেই পিটুনি খেলো একদিন। ব্যাপারটা গড়াতে গড়াতে লালা কংশীরামের কাছে গিয়ে পৌছলো। সে ভগতরামকে ডেকে আনিয়ে বোঝালো খুব। নরম সুরে, ঠাণ্ডা গলায়, গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে খুব বোঝালো। উঁচু-নীচু সম্বন্ধে জ্ঞান দিলো।

কিন্তু যার মনের মধ্যে হাড়-বজ্জাতি রয়েছে, ধর্ম-কর্মের কথা তার কানে ঢুকবে কেন? এক কানে শুনলো, আর-এক কান দিয়ে বার করে দিলো। আগে

যখন নিজেদের বাড়িতে থাকতো, তখন সেই খানিকটা রয়ে-সয়ে চলতো। কিছুটা ভয়ও ছিলো যে দাদা কি বলবে! কিন্তু এখন তো সে রাতদিন আটা-চাকিতেই পড়ে থাকে, সেখানে তাকে বাধা দেয়, কার সাধ্যি। এখন সে নিজেই সেখানকার হর্তাকর্তা। তারপর ইদানীং ভাঙ ধরেছে। এক মুসলমান ফকির নিজের স্ত্রী ও যুবতী মেয়ে নিয়ে নদীর ওপারে এসে ঘাঁটি গেড়েছে, সেখানেও যাতায়াত শুরু করেছে সে।

যতই দিন যায়, আটাচাকির কাজে ভগতরামের অবহেলা ততই বাড়তে থাকে। দিনের বেশীর ভাগটাই ফকির সাহেবের আখড়ায় চরস-গাঁজা খেয়ে কাটে। দাদা তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলো। গ্রামের ভদ্রলোক মুসলমানরাও অনেক কটূক্তি শোনালো। কিন্তু সে তখন অন্য নেশায় মত্ত। আরো কিছুদিন গেলে খবর পাওয়া গেলো যে ভগতরাম নতুন শহরে গিয়ে মুসলমান হয়ে ফকিরের মেয়েকে বিয়ে করেছে। এই খবরে সারা গ্রাম তোলপাড়।

যখন গ্রামের লোকেরা ভগতরামকে কালো-টিকিওয়ালা উঁচু লাল টুপি পরে ঘুরে বেড়াতে দেখলো, ভগতরামের সৌভাগ্য যে সে ভয়ে গ্রামের দিকে পা বাড়ায়নি, নইলে তার দাদা কংশীরাম ও বংশীরাম নিশ্চয়ই প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়তো।

কিন্তু ভগতরাম যখন তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েই গ্রামে এলো, তখনই বা তার দাদারা কি করতে পারলো তার! সে সরাসরি তার বড় দাদার আটাচাকিতে গিয়েই ঠাঁই নিলো। স্বামী-স্ত্রী মিলে বাস করতে লাগলো সেখানে। ভগতরাম এখন খুব খুশী। সাদা থানের সালোয়ার-পাঞ্জাবি পরে মাথা তুলে গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায়, গাঁয়ের বউ-ঝিদের সঙ্গে অন্য ধর্ম অন্য সম্প্রদায়ের লোকের মতো বোলচাল করে। এমনি দশ নম্বরের বদমাশ! মা যখন আমায় গালিগালাজ দেয়, আমার স্বভাব-চরিত্র নাকি ভগতরামের মতো, আমি তখন প্রায়ই কেঁদে ফেলি। ভগতরামের ওপর আমার দারুণ রাগ। একেই তো সে আমাদের ধর্ম ত্যাগ করেছে, এমন লোককে কি কেউ ভালোবাসে! তার ওপর শয়তানিটা দেখো, মুসলমান হতে না-হতেই গাঁয়ের মুসলমানদের উস্কানি দিতে শুরু করেছে তারা মসজিদের মিনারে চড়ে আজান দিক। কেউ তার কথা মানতে চায়নি। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলেছে, আজ পর্যন্ত গাঁয়ে কখনো এমন কাজ হয়নি। তাতে বদমাশটা খুব হাসলো। তারপর নিজে ওজু করে মসজিদের মিনারে চড়ে আজান দিলো। তার গম্ভীর গলার আজান গ্রামের চারদিক কাঁপিয়ে, নদীর ধারের নাসপাতি গাছগুলোতে এবং আরো দূরে দেবদারু গাছে ঢাকা পাহাড়ে পাহাড়ে যেন ধমক-দেওয়া প্রতিধ্বনি তুললো। গ্রামের প্রত্যেকটি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বুক এক অজানা আতঙ্কে কেঁপে উঠলো। ঘোর কলিযুগ, ঘোর কলিযুগ! নিশ্চয়ই কয়েক দিনের মধ্যে প্রলয়ের অবতারের আবির্ভাব হবে—হায় রাম! হায় রাম! লালা কংশীরাম ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা বড় যজ্ঞ

করলো, প্রায়শ্চিত্ত করলো। ছোট ভাই ভগতরামকে সে সমাজচ্যুত করলো, পিতৃসম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করলো তাকে। তারপর পুরনো আটাচাকির জলের স্রোতে বাঁধ দিয়ে আর-একটা চমৎকার আটাচাকি তৈরী করে দিলো।

যে পুরনো আটাচাকিটায় ভগতরাম ও তার স্ত্রী থাকতো, সেটার অবস্থা এমনিতেই খুব শোচনীয় ছিলো। খদ্দেরপাতি কমতে কমতে বন্ধ হয়ে যাওয়ার দাখিল। তারপর যে কয়েক ঘর মুসলমান বাকী ছিল, তারাও হাত গুটিয়ে নিলো। কারণ গ্রামের সমাজ-জীবন থেকে ভগতরামকে পতিত করা হয়েছে। তা ছাড়া কেউ পছন্দও করতো না তাকে।

তখন ভগতরামের স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা। লোকে বলে, বিয়ের আগে থেকেই সে নাকি অন্তঃসত্ত্বা। ফকির' ভগতরামের ঘাড়ে মেয়েটিকে চাপিয়ে দিয়ে ফেরার হয়েছে। কেউ একরকম বলে, কেউ বা অন্যরকম। যত মুখ, তত কথা। তবে সত্যি কথা বলতে কি, ভগতরাম স্ত্রীকে সব সময়ে খুশী রাখার চেষ্টা করতো। সেজন্যে সে সব রকমের মেহনত করতে প্রস্তুত। কিন্তু গ্রামের কেউ তাকে কাজ দিতে রাজী নয়। এমন একটা লোফারের পক্ষে এই ভদ্রলোকের গ্রামে কাজ যোগাড় করা কি সহজ কথা!

সেই রাতটির কথা আমি এখনো ভুলতে পারিনি। ভগতরামের স্ত্রীর প্রসব হবে। তাই সে সকাল থেকেই আমাদের বাড়ি এসে হত্যে দিয়ে পড়েছে। মাকে কাকুতি-মিনতি করে, পায়ে মাথা খুঁড়ে বলছে, 'তুমি চলো মা। তুমি গেলে আমার বিবি বেঁচে যাবে।' কিন্তু মা বড় বড় ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণদের বাড়ি দাইগিরি করতে যায়, তাই সে ভগতরামকে জবাব দিয়ে দিলো।

মাঝরাতে ভগতরাম ফের এসে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে করে নানারকম দিব্যি দিতে লাগলো। কিন্তু আমরা দরজা না খুলে ঘাপটি মেরে শুয়ে রইলাম। পরদিন সকালে খবর পেলাম, ভগতরামের স্ত্রী প্রসব-যন্ত্রণায় মারা গেছে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়নি। ভগতরাম খুব কাঁদলো, মাথা কুটে কুটে কাঁদলো। কিন্তু সেটা কি আর সত্যিকারের চোখের জল, মানুষের চোখের জল কি? ওটা পশুর চোখের জল। দুঃখ-কষ্ট পেলে পশুদের চোখে যেমন জল পড়ে, ঠিক তেমনি। কারণ, কয়েকদিনের মধ্যেই সে তার স্ত্রীর কথা ভুলে গেলো। এমন কি মুসলমান নামটাও ত্যাগ করলো। এখন সে নিজেকে আর খোদাবক্স নামে নয়, ভগতরাম বলে পরিচয় দেয়। আর সেইভাবেই সে গাঁয়ের অলিগলিতে চক্কর দিয়ে ঘোরে। কিন্তু ধন্যি হিন্দু জাত! কেউ তাকে মুখ দিলো না। এমন কি তার দাদাও কথা বলা দূরে থাক, তার দিকে চোখ তুলে তাকালো না পর্যন্ত।

কয়েক দিন পরে ভগতরাম গ্রাম ছেড়ে কোথায় যেন চলে গেলো। তিন-চার মাস পরে যখন ফিরলো, তখন তার কাছে দু-তিন ডজন সাপ, বেশ কিছু ছুঁচো, নেউল, আর বিভিন্ন ধরনের আরো অনেক জন্তু-জানোয়ার। সেই সঙ্গে

খাঁচায় একটি ময়না। চমৎকার কথা বলে। আমি তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা খাঁচার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাখিটার গান শুনি। গ্রামের অনেক ছেলে-ছোকরাই আমার সঙ্গে ভগতরামের কাছে যাওয়া-আসা করে। এখন তার কাছে অনেক শেকড়-বাকড়। বলে, পৃথিবীর যে কোন রোগ সে তুড়ি মেরে দূর করে দিতে পারে। এই তুক-তাক দিয়ে সে আস্তে আস্তে লোক টানতে লাগলো। ভালো আমদানি শুরু হলো তার। মা গ্রামের নামকরা দাই, মেয়েদের ব্যাধি-বালাইয়ের চিকিৎসা জানে সে, ভগতরামের এই বহুরূপীগিরি তার কাছে ভালো ঠেকলো না। কিন্তু তার কি করার আছে এতে! তবে হ্যাঁ, যেদিন সামনা-সামনি পড়ে যেতো দুজনে, সেদিন মা ওকে খুব কথা শোনাতো। সেই বাক্যবাণ শুনে ভগতরাম হয় হেসে উড়িয়ে দিতো, নয় তো নিজের মাথা চুলকাতো। তারপর জোরে হো-হো করে হাসতে হাসতে চলে যেতো। চিরকালের পাজি বদমাশ তো! দেখতে দেখতে হলো কি—ভগতরামের শেকড়-বাকড়ে সারা গ্রামটাই বাঁধা পড়লো। পাড়াপড়শীরা তার কাছে আসতে শুরু করলো। তারপর সে গ্রামের ছোট্ট বাজারটায় এক চামারের দোকানের আধ-খানা ভাড়া নিয়ে সেখানে বসে বসে ওষুধ বিক্রি করতে লাগলো।

আধখানা দোকানে মোলু চামার জুতো তৈরি করে। যখনই দেখো, মোলু চামার, তার স্ত্রী ও বিধবা বোন রামদুলী সব সময় জুতো সেলাই করছে। অপর আধখানায় ভগতরাম নতুন খদ্দেরের মাথায় টুপি পরায়। সাপ খেলায়, সাপকে দিয়ে নিজের জিভ দংশন করায়, সেঁকোবিষ খেয়ে বলে যে তার দেহে বিষের কোন ক্রিয়া হয় না, কারণ তার কাছে এমন বিষহরি শেকড় রয়েছে, যে রকম প্রাণঘাতী বিষই হোক না কেন, এর কাছে সব জব্দ। মোট কথা, এমনি সব উড়ো কথা, গালগপ্পো আর ধাপ্পাবাজিতে আকাট মূর্খ সাদাসিধে গাঁয়ের মানুষগুলোকে ঠকিয়ে নিজের পকেট ভর্তি করে। এসব কথা শুনতে শুনতে মা জ্বলে মরে। কিন্তু আমরা কি করতে পারি ওর! কারণ গ্রামের লোকগুলো সবাই ওর পক্ষে। পকেটেও টাকা রয়েছে। এখন সে গাঁয়ের বাইরে নদীর ওপারে মাটির একটা কাঁচা ঘর তৈরি করে নিয়েছে। অবসর সময়ে নিজের ছোট্ট বাগানটায় কাজ করে সে। ভগতরামের ওপর আমার দারুণ ঘেন্না। ওর ঘরে আমি কক্ষনো যাইনি। কিন্তু দোকানের বাইরে খাঁচায় ঝোলানো থাকতো সেই যে চমৎকার ময়নাটা, এখন সেটাকে সে নিজের ঘরে নিয়ে গেছে। ফলে পাখিটাকে দেখার জন্যে মাঝে মাঝে আমাকেও যেতে হয় সেখানে। ওর কপাল ভালো যে আমায় কখনো তুক-তাক করেনি। নইলে আমি ঠিক করেই রেখে-ছিলাম, যদি ও আমায় কখনো তুক করে, গুলতি দিয়ে ঢিল ছুঁড়ে ওর মাথা ফুটো করে দেবো।

ভগতরামের কাজ-কারবার খুব জমে উঠেছিলো। কিন্তু সেই সময় সে এমন এক কাণ্ড করে বসলো যে গ্রামের লোকেরা আবার চটে গেলো তার ওপর।

এই ঘটনার পরে গ্রামে এবং আশপাশের গ্রামগুলোতে তার কোন বিদ্যেই আর খাটলো না।

আসলে ঘটনাটা এই। লালা বংশীরাম তার ছোট ভাই ভগতরামকে বলে পাঠিয়েছিলো যে মোলু চামারের বিধবা বোন রামদুলীর পেটের সন্তান নষ্ট করার জন্যে সে যেন কোন ওষুধ দেয়। কিন্তু ভগতরাম তো একঘরে হয়েছে, এমন সুযোগ ছেড়ে সে কি কোন ভালো মানুষের উপকার করে! বলাই বাহুল্য, সে পরিষ্কার 'না' বলে দিলো। বরং উল্টে ব্যাপারটাকে এমন প্রচার করে দিলো যে লালা বংশীরামকে কয়েক মাসের জন্যে গ্রাম ছেড়ে নতুন শহরে চলে যেতে হলো। নইলে রামদুলীর জন্যে মুখ লুকোনো মুশকিল হয়ে পড়েছিলো। ঘটনাটা চারদিকে এমনি ছড়িয়ে পড়লো যে বংশীরামের দাদা লালা কংশীরাম মাকে অনুরোধ করলো, এমন একটা লজ্জাকর ব্যাপার থেকে সে যেন তাদের সবাইকে উদ্ধার করে। মা তাদের বংশের বাঁধা দাই। কিন্তু মাও রাজী হলো না। তার ফলে, ন মাস ধরে রামদুলীকে সেই অবৈধ সন্তান পেটে নিয়ে বয়ে বেড়াতে হলো, আর সারা গাঁয়ে বেইজ্জতি হলো তার। তারপর সেই অবৈধ সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো এবং জ্ঞাতি-গোষ্ঠী রামদুলীকে জাতিচ্যুত করলো। তার দাদা-বৌদিও তাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলো। এই অবস্থায় যখন তাকে আশ্রয় দেবার মতো কেউ রইলো না, ক্ষিদে-তেষ্টায় এখানে-ওখানে ঠোক্কর খেয়ে বেড়াচ্ছিলো, ছেলের আহার বলতে বুকের দুধ, সেটুকুও শুকিয়ে গেলো যখন তখন সে ভগতরামের ঘরে গিয়ে হাজির হলো। বদমাশটা তো সেই অপেক্ষাতেই ছিলো। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘরে আশ্রয় দিলো ওকে। বিয়ে-সাঙা না করেই ওরা বেশ হাসিতে খুশিতে বসবাস করতে লাগলো। এর আগে গ্রামে কখনো এরকম ঘটনা ঘটেনি। এমন স্বেচ্ছাচার বেলেল্লাপনা—এমন বেহায়াপনা বেয়াড়াপনা কি চোখে দেখা যায়! তার পরিণাম দাঁড়ালো এই, ভগতরামের দোকান তুলে দেওয়া হলো। তাকে বেশ করে শাসন করে দেওয়া হলো এই বলে যে এর পর যদি কখনো সে গ্রামের দিকে পা বাড়ায়, তবে যেন প্রাণের মায়া ত্যাগ করে আসে।

ভগতরাম এখন নিজের ঘরেই থাকে। ঘর ও বাগানের আশেপাশে যেটুকু জমি সে কিনেছিলো, তাতে চাষ-আবাদ করে নিজের, রামদুলীর আর তাদের অবৈধ সন্তানটার দিন গুজরান হয়। গ্রামের লোকের ধারণা, ওকে বড় ভাবনা-চিন্তায় দিন কাটাতে হচ্ছে। পাথর কি কখনো জলে ভেজে? তেমনি এসব ঘটনাও ভগতরামের চিন্তায় কোন রেখাপাত করেনি। তার স্বভাব-চরিত্রের কোনই পরিবর্তন হয়নি। তার কীর্তিকলাপে নিজের মা-বাবা, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, এমনকি নিজের গ্রামের মান-মর্যাদা যে ধূলিসাৎ হয়েছে, এ-ভাবনা তার মনে কখনোই উঁকি দেয়নি। তেমনি হাসি-খুশি, তেমনি ফুর্তি—যেন কখনো কিছুই ঘটেনি। যেন এখনও সে গ্রামের মধ্যে তার দাদার চমৎকার টিনের চালের

বাড়িতেই বাস করছে। আমি একদিন তাকে তার ঘরে দুপুরবেলা দেখেছিলাম। উঠোনে একটা খাটে শুয়ে শুয়ে রামদুলীকে চুমু খাচ্ছিলো। তার আগে আমি কখনো কোন পুরুষকে ও স্ত্রীলোককে পরস্পর চুমু খেতে দেখিনি। তাই সেই দৃশ্য দেখে আমি তো একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছি, মার কথাগুলো যেন স্পষ্ট শুনতে পেলাম আমি, 'কখনো ভুলেও ভগতরামের ঘরের দিকে চাইঁবি নে। ও বেজায় পাজি।' এখন দেখছি, মার কথাগুলো খুব সত্যি। ভদ্রলোক কি কখনো এরকম হয়! রাগে-দুঃখে আমার চোখ দুটো জলে ভরে উঠলো। আমি ফিরেই যাচ্ছিলাম, এমন সময় ময়নাটা আমায় দেখে ফেললো। অমনি সে চিৎকার করে বলতে লাগলো, 'এসো লক্ষ্মী সোনা ছেলে, মিষ্টি দেবো। এসো লক্ষ্মী সোনা ছেলে, মিষ্টি দেবো।' ময়নার কথা শুনে ভগতরাম তাড়াতাড়ি উঠে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। পাজিটা বোধ হয় আমায় ধরতে চায়! কিন্তু আমি সহজে তোমায় ধরা দিচ্ছি নে। খুনী, ডাকাত! আমি কাঁদতে কাঁদতে সামনে দৌড়তে লাগলাম। পেছনে ভগতরাম দৌড়তে দৌড়তে বলছে, 'কথা শুনে যাও খোকা। কথা শুনে যাও।' আমি কি এতই বোকা, যে দাঁড়াবো! আমি উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তেই থাকলাম। হঠাৎ সে আমার ঘাড়টা ধরে ফেললো। অমনি আমি তার বুড়ো আঙুলটা কট্ করে কামড়ে দিয়েছি। এমন জোরে কামড়ে দিয়েছি যে ও যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলো। কিন্তু ও আমায় চড়-চাপড় মারলো না, কিছুই করলো না। কিন্তু ছাড়লোও না আমায়। ঘাড় ধরে নিজের ঘরের উঠোনে টেনে নিয়ে গেলো। এখন আমার পালাবার সাধ্যিও নেই। সে রামদুলীকে দেখিয়ে বললো, 'ও তোমার মাসি হয়। ওকে 'রাম রাম' বলো।'

আমি বললাম, 'ও তোমার মাসি। আমি ওকে 'রাম রাম' বলবো না।'

সে হেসে বললো, 'দেখো, এ হচ্ছে তোমার ছোট ভাই মল্লু। ওর সঙ্গে খেলাধুলো করো।'

'আমি ওর সঙ্গে খেলবো না। মা বলে, রামদুলীর ছেলে হারামী। ও হারামী ছেলে··· !'

সঙ্গে সঙ্গে রামদুলী ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। ভগতরাম হা হা করে হেসে উঠলো। তার কুৎসিত বীভৎস দাঁত ও দাঁতের মাড়ী ঠোঁটের বাইরে বেরিয়ে এলো। বলতে লাগগো, 'আপেল খাবে? আপেল? আলুবোখরা? আলুবোখরা? হা-হা হা······ !'

আমি মাথা নেড়ে অস্বীকার করলাম।

সে জোর করে অনেক আপেল ও আলুবোখরা আমার পকেটে পুরে দিতে দিতে আবার হেসে বললো, 'এই ময়নাটা তোমার খুব পছন্দ, না? নিয়ে যাও ওটা।'

সে খাঁচাটা নামিয়ে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো।

আমি বললাম, 'তোমার ময়নার ওপর কেউ থুতুও ফেলবে না। মা বলে,

ভগতরাম মানুষ নয়, জানোয়ার। ছেড়ে দাও আমায়। তোমার ময়না-টয়না আমার দরকার নেই…'

সে হাসতে হাসতে আমায় ছেড়ে দিয়ে বললো, 'বেশ, তাই যাও।'

পাজিটার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে দৌড়তে দৌড়তে সোজা বাড়িতে এসে নিঃশ্বাস ফেললাম। বাড়ি ফিরে মাকে সমস্ত ঘটনাটা বলতেই মা তো প্রথমেই আমার ওপর ভীষণ চটে গেলো। তারপর সে ভগতরামকে গালিগালাজ দিলো খুব, তার আপেল আর আলুবোখরাগুলো ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিলো।

তারপর আমি আর কখনো ভগতরামের ঘরে যাইনি।

কয়েক মাস পরে লালা বংশীরাম যখন নতুন শহর থেকে ফিরলো, তখন সে মোলু চামারকে বলে অশালীন ব্যবহার ও মেয়ে ফুসলিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে ভগতরামের ওপর মামলা দায়ের করলো। ছ-সাত মাস জেলে কাটালো সে। শেষ পর্যন্ত কৃতকর্মের ফল ফললো। জেলখানায় তার স্বাস্থ্য খুব ভেঙে পড়েছিলো। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে যখন সে এলো, লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো যে ভগতরামের মুখে আগেকার সেই হাসি-খুশি ভাবটাও আর নেই। আগেকার মতো আর বুক ফুলিয়ে চলাফেরাও করে না। এখন সামনের দিকে একটু ঝুঁকে হাঁটে। খানিকটা মন-মরা। কিন্তু সে-সব কয়েকদিনের জন্যেই। তারপর আবার সেই বেহায়াপনা বেয়াড়াপনা। লোফারের মতো এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলো। গ্রামে গ্রামে গিয়ে নিজের শেকড়-বাকড়ের ব্যবসা শুরু করে দিলো। কিন্তু ভদ্রলোকেরা তাকে একেবারেই আস্কারা দিতো না। হিন্দু, মুসলমান—সব ধর্মের সব জাতের লোকই তাকে দুশ্চরিত্র লম্পট বলেই জানতো। আর আমাদের গ্রামে তো তার খারাপ স্বভাব-চরিত্র প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছিলো। মা ছেলেকে উপদেশ দেওয়ার সময় বলতো, 'দেখো বাছা, খারাপ কাজ যদি করো, তোমার দশাও ওই ভগতরামের মতো হবে।'

তার জীবনটা যেমন উদ্দেশ্যহীন খাপছাড়া, তার মৃত্যুটাও তেমনি একেবারে খাপছাড়া…

আমি তাকে মরতে দেখিনি। কিন্তু যারা তাকে মরতে দেখেছিলো, তারা তার পাগলামির জন্যে আজও হাসে। মরার আগে সে নাকি আনন্দে-আহ্লাদে আটখানা হয়ে ছিলো। সে আর রামতুলী নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ছিলো। নদীর দুকূল-ছাপানো প্লাবনের রঙ্গ দেখছিলো। বর্ষার প্রবল বৃষ্টিপাতে নদীর জল বিধ্বংসী ঘূর্ণাবর্ত তৈরি করে বয়ে যাচ্ছিলো। হঠাৎ সে দেখলো, যেখানটায় সে দাঁড়িয়ে আছে, তার কাছেই তিন-চারটি ভেড়ার বাচ্চা ঘূর্ণাবর্তে পাক খেতে খেতে ভেসে আসছে আর ভীত কণ্ঠে 'ব্যা ব্যা' করে চিৎকার করছে। এক মুহূর্তের জন্যে ভগতরাম বাচ্চাগুলোর দিকে তাকালো, পরের মুহূর্তেই তাকে দেখা গেলো সেই ঘূর্ণাবর্তে পাক খেতে, বাচ্চাগুলোকে বাঁচাবার বৃথা চেষ্টা করছে সে। চেষ্টা করতে গিয়েই সে নিজের প্রাণটাও দিলো। পরদিন প্লাবনের বেগ কমে এলে

নদীর বাঁকে তুঙ্ গাছে আটকানো অবস্থায় তার লাশটা পাওয়া গেলো। কিরকম গোঁয়ারতুমি আহাম্মুকি মরণ! যেমন পশুর জীবন, তেমনি পশুর মৃত্যু! অস্বাভাবিক, বেয়াড়া। এরকম মৃত্যুর কি কোনো মানে হয়? কিন্তু তার ভালো দাদারা ভালো কাজই করলো। সে তো আগেই জাতিচ্যুত হয়েছে। এখন সে না হিন্দু, না মুসলমান, না অচ্ছুত। তবু তারা ধর্মত উচিত কাজই করলো। লাশ বাড়িতে এনে নাওয়ালো। তারপর প্রথানুযায়ী ঘটা করে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে চিতায় আগুন দিলো। সে-সময় আমি সেখানেই উপস্থিত ছিলাম……

কিন্তু সেটা ১৯২০ সালের কথা। আর আজ ১৯৭৪। আমার ছোট্ট ছেলেটি আমার কড়ে আঙুলটা জোরে কামড়ে দিয়েছে, আমি রেগে গিয়ে দু-তিন চড় কষে দিয়েছি। বেচারী সোফায় মুখ গুঁজে কাঁদছে আর আমি ভাবছি। আমি ভাবছি, ভগতরাম, তুমি তো একটা দশ নম্বরের বদমাশ ছিলে। তোমার কোন জাত ছিলো না। গোঁয়ার, লম্পট, ভণ্ড ব্যবসায়ী। শেকড়বাকড় বিক্রি করে বেড়াতে। লোককে ঠকিয়ে পয়সাকড়ি নিতে। এক মুসলমান ফকিরের মেয়েকে বিয়ে করেছিলে। এক অচ্ছুত বিধবাকে বিয়ে-টিয়ে না করেই ঘরেরেখেছিলে। ভগতরাম, তুমি জেলের হাওয়া খেয়ে এসেছো, গ্রামের লোকেরা তোমায় জানতো, লোফার, গুণ্ডা বলে। লোকেরা তোমায় ঘেন্না করতো, হয়তো আজও করে। শুধু আমাদের গ্রামে নয়, প্রত্যেকটি গ্রামে, প্রত্যেকটি শহরে, সব জায়গায়। আজ আমি ভাবছি, ভগতরাম, সম্ভবত আমি তোমায় ঠিক চিনতে পারিনি। তোমায় চিনতে ভুল করেছিলাম (যারা রেলগাড়ি তৈরি করে, অথচ লোকদের না খাইয়ে মারে; যারা বিশাল বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করে, অথচ ঈশ্বরের সৃষ্টিকে উলঙ্গ করে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে বাধ্য করে; নারীর মর্যাদা কেড়ে নিয়ে নারীর মর্যাদার ধ্বজাধারী সাজে; নিজের হৃদণ্ডের বউয়ের জন্যে বেশ্যালয় এবং সন্তান-সন্ততির জন্যে অনাথ-আশ্রম বানায়, আর সমাজের হট্টমন্দিরে বসে বসে তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করে, তুমিতাদের চেয়েঅনেক বড়, মহৎ ও সজ্জন। যারা ট্রাক্টর, উড়োজাহাজ, স্কুল, ইউনিভার্সিটি, থিয়েটার, সিনেমা, এম্পায়ার বিল্ডিং, নাচঘর, ব্যাঙ্ক, ময়ূর-সিংহাসন, গ্রন্থ, উপনিষদ, দর্শন সৃষ্টি করে, ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে বিতর্ক করে এবং মাঝে মাঝে প্রায়ই সমগ্র মানব-জাতিকে অন্ধকার জগতে নিক্ষেপ করে তাদের উদ্বিগ্ন ও ক্লিষ্ট করে তোলে, তুমি সেই সব লোকদের চেয়ে অনেক বড়, মহৎ। ভগতরাম, তুমি কি শুধুই ভণ্ড ব্যাপারী, ভুয়ো শেকড়বাকড়ের কারবারী, লম্পট-দুশ্চরিত্র! না না, তুমি সত্যিকারের একজন কবি। ভগতরাম, তুমি সেই কবি যারা প্রত্যেক শতাব্দীতে, প্রত্যেক বছরে, সব জায়গায়, সব গ্রামে জন্মগ্রহণ করে, কিছু তথাকথিত সেই সব বড় মানুষেরা, ভালো লোকেরা, সৎ লোকেরা তাদের বুঝতে চায় না কিছুতেই। বন্ধু, তুমি সেই কবি, এসো, হাত মেলাও!)

কিন্তু আজ ভগতরাম আমার সঙ্গে হাত মেলাতে পারে না। কারণ সে মারা গেছে। ১৯২০ সালের বন্যায় ভেড়ার বাচ্চাগুলোকে বাঁচাতে গিয়ে মারা গেছে। সেই নদীটার ধারেই তার চিতা জ্বালানো হয়েছিলো। তার মৃত্যুতে কেউ কাঁদে নি। তার চিতার অগ্নিশিখা উঁচু থেকে আরো উঁচুতে আকাশের দিকে উঠেছিলো। লাল লাল অগ্নিশিখা, আগুনের পাতা, আগুনের কুঁড়ি, আগুনের ফুল ফুটছিলো তার চিতায়। চিতা জ্বলছিলো, অথচ কারো চোখে জল ছিল না। বিশ্বচরাচরও নির্বিকার। স্বচ্ছ আকাশ, গাঢ় নীল। চমৎকার রোদ্দুর, ঝকঝকে, কোমল ও উষ্ণ। কোথাও কোথাও সাদা মেঘের স্তূপ, রাজহংস যেন সাঁতার কাটছিলো। নদীর জল তখন গান গেয়ে গেয়ে, ঘূর্ণাবর্তে পাক খেতে খেতে তার চিতার কাছ দিয়ে বয়ে যাচ্ছিলো। সমস্ত সৃষ্টি খুশী। স্রষ্টা খুশী। কবি নিজেও খুশী। কারণ আজ তার হৃদয় অগ্নিশিখায় পরিণত হয়েছে, তার আত্মা ফুলে রূপান্তরিত হয়েছে। যে আগুনের শিখা তোমার হৃদয়ে, সেই আগুনের ফুল সমস্ত জায়গায় ছড়ানো, যা তোমার অন্তরে এবং আমার অন্তরে, অন্তরে এবং বাইরে, সমস্ত জায়গায় রয়েছে। সমস্ত জায়গা, সমস্ত সৃষ্টি, প্রত্যেকটি কবি, প্রত্যেকটি মানুষকে একাকার করে দিয়েছে। এরকম যার মৃত্যু, সে সৌভাগ্যবান। ভগতরাম······

নতুন ক্রীতদাস

[কোরিয়ার যুদ্ধে নিহত প্রথম মার্কিন সৈনিকের উদ্দেশ্যে]

এ-চিঠি আমি সৈনিক কেন্থ শ্যাড্রককে লিখছি। বয়স কুড়ি বছর। সাকিন পশ্চিম ভার্জিনিয়া, আমেরিকা। কোরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে সেখানকার জনসাধারণের বিরুদ্ধে মুখোমুখি লড়াই করতে করতে মার্কিন সৈন্যদের মধ্যে সে প্রথম নিহত হয়। কোরিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে আমেরিকা থেকে পাঠানো হয়েছিলো তাকে।

আমি তার মৃত্যুর খবর পড়েছি গতকাল সন্ধ্যের খবরের কাগজ ফ্রী-প্রেস বুলেটিনে। জেনারেল ম্যাকআরথারের মিলিটারি হেড-কোয়ার্টার কিন্তু খুব আড়ম্বর করে তার মৃত্যুর খবর ছেপেছে। কিন্তু সে-খবরে এতটুকু দুঃখের লেশমাত্র নেই। মৃতের আত্মীয়স্বজনের পক্ষ থেকেও কোন সমবেদনা জানানো হয়নি। তার জীবন অথবা স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধেও কোন আলোকপাত করা হয়নি। এমন কি তার দেহের গঠন কিংবা চেহারা সম্বন্ধেও কিছু জানা যায়নি। কারণ, এই খবরের সঙ্গে যে-ছবিটি ছাপা হয়েছে, সেটি মার্কিন জেনারেল ম্যাকআরথারের। আর নিহত হয়েছে কেন্থ শ্যাড্রক।

আমি তার মৃত্যুর খবর পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে চিঠি লিখতে মনস্থির করেছি। আমি জানি, মৃত ব্যক্তি আমার চিঠি পড়তে পারে না। কিন্তু আমার নিশ্চয়ই আশা রয়েছে যে অন্য কোন সৈনিক যদি এই চিঠিখানি পড়ে, তবে সে শ্যাড্রকের যুদ্ধ-পোশাকের বাঁ-দিকের ভিতরের পকেটে এটা রেখে দেবে, যেখানে শ্যাড্রক তার সোনার ঘড়িটি রেখে দিয়েছে, যেখানে তার প্রিয়তমার সহাস্য মুখের ছবি ও তার মায়ের শেষ চিঠিখানি রয়েছে। তারপর যখন জেনারেল ম্যাকআরথার মৃত কর্মচারীর জিনিসপত্র তার উত্তরাধিকারীদের প্রত্যর্পণ করবেন, আমি আশা করছি, আমার এই চিঠিখানিও সেইসব জিনিস-পত্রের সঙ্গে পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় গিয়ে পৌছবে। তার আত্মীয়স্বজনেরা চিঠিখানি পড়বে। পড়বে তার বন্ধু-বান্ধব এবং অন্যান্য হাজার হাজার তরুণ শ্যাড্রক, যাদের বয়স কুড়ি, পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় বাস করে, যাদের জন্য এই প্রথম নিহত ব্যক্তিটির মতোই সাজানো মৃত্যু অপেক্ষা করছে। সেজন্যে এই চিঠিখানি অত্যন্ত জরুরী। কারণ, মৃতব্যক্তি দ্বিতীয়বার জীবন ফিরে পেতে পারে না ঠিকই, কিন্তু যারা বেঁচে আছে, তাদের বাঁচিয়ে রাখা যেতে পারে।

সৈনিক শ্যাড্রক, তুমি এখনো পর্যন্ত কোরিয়ার কোনো উঁচু টিলার ওপর মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছো, আর আমি তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করে কার্তুজের গুলিটিও দেখতে পাচ্ছি। তোমার চোখের ব্যাকুলতা আর রোদ্দুরে ঝিকমিক করে ওঠা তোমার সোনালী চুল দেখে আমার মন ক্ষোভ ও দুঃখে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে। আমি জিজ্ঞেস করছি, কে তোমায় এখানে এনেছিলো, যে তোমার কাছ থেকে তোমার যৌবন, তোমার প্রেমিকা, তোমার মায়ের স্নেহ কেড়ে নিয়েছে এবং তোমাকে তোমার জন্মভূমি থেকে এত দূরে এক অপরিচিত অজানা টিলার ওপর মরতে বাধ্য করেছে? সে কে, যে তোমার হাতে বন্দুক তুলে দিয়ে বলেছিলো, যাও, অচেনা কোরিয়ার প্রান্তরে পর্বতে গিয়ে তোমার বিশ বছরের যৌবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার বুক গুলিবিদ্ধ করো?···তারা কে? ···কোন্ ক্ষমতাগর্বী তারা? তাদের চিনে নেওয়া প্রয়োজন আমাদের। শান্তির জন্য তৃষ্ণার্ত জগৎ এ-প্রশ্নের উত্তর চায়।

তুমি হয়তো ভাবছো, এ তো আশ্চর্য লোক, নিজে নিঝঞ্ঝাটে থেকেও তোমায় চিঠি লিখছে! মাফ করবে। আমি তাড়াতাড়িতে আমার পরিচয় দিতেই ভুলে গেছি। আমার নাম কৃষণ চন্দর। কিছু কাল আগে আমি লাহোরের এক ছোট্ট গলিতে বাস করতাম। গলিটার নাম ছিল চৌক মতি। জানিনে আজকাল লোকেরা সেটাকে কি বলে! কারণ, সেটাই স্বাভাবিক। এটা তোমার বিশ্বাস হবে কিনা জানিনে, যারা তোমার কাছ থেকে তোমার জীবনটা কেড়ে নিয়েছে তারাই আমার কাছ থেকে আমার জন্মভূমি, আমার শহর, আমার গলিটাও ছিনিয়ে নিয়েছে। আর তুমি যেমন আজ তোমার বাড়িতে ফিরে যেতে পারছো না, তেমনি আমিও আমার সেই গলিতে ফিরতে পারছিনে।···এগুলো কি সবই কাকতালীয় ঘটনা, না নেহাতই দৈব-দুর্বিপাক, কিংবা এসব কি তোমার আমার ওপর শুধুমাত্র এক দুর্ভাগ্যের প্রভাব! না এটা কিছু রাজনীতিবিদ ও অত্যাচারী ক্ষমতাগর্বীর এক ভয়ঙ্কর অত্যাচারের ষড়যন্ত্র যারা তোমার কাছ থেকে তোমার জীবন এবং আমার কাছ থেকে আমার জন্মভূমি কেড়ে নিয়েছে? আমাদের দু'জনকে মিলেই এ-প্রশ্নের জবাব খুঁজতে হবে। কারণ অতীত ও বর্তমান মিলিয়েই ভবিষ্যতের পথ খুঁজতে হয়।

এটা সত্যি যে আমি তোমাদের আমেরিকায় কখনো যাইনি। আমার কখনো পাসপোর্টই জোটেনি। না ইংরেজ সরকার দিয়েছে, না কংগ্রেস সরকার। তা সত্ত্বেও আমি তোমাদের আমেরিকাটাকে বেশ ভালোই চিনি। তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তার কমনীয়তা, তার ভেতরের কদর্যতা, সমস্তই আমার কাছে স্পষ্ট। একটি ছোট্ট গল্পে আমি প্রথম আমেরিকার পরিচয় পাই। আমার পড়া প্রথম ইংরেজী বইয়ে। সেটা ছিল আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের গল্প। কিভাবে তারা সর্বদা সত্যকথা বলে, সত্যের প্রতি অবিচল থাকে, সেই সব কথা। এ-গল্প আমার শৈশবকে দারুণ প্রভাবিত করেছিল। আমি বুঝেছিলাম,

আমেরিকা নিশ্চয়ই সত্যবাদীদের দেশ, সেখানে কেউ কখনো মিথ্যে বলে না। তারপর আমি বড় হয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্যে এক আমেরিকান কলেজে ভর্তি হই। লাহোরের ফার্মন ক্রীশ্চান কলেজে। আমি সেখানেই আমেরিকার শ্রেষ্ঠ সাধারণ মানুষদের সাক্ষাৎ পাই, যারা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করেছে, ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্যে ক্রীতদাসত্বের অবসান ঘটাতে দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে, নিজের ভাইদের সঙ্গেই গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, হাবশী ক্রীতদাসদের মুক্তি দেওয়ার জন্যে সব রকমের চেষ্টা করেছে, যে-জন্যে তারা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির হৃদয়ে সমুন্নত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার আসন পেয়েছে। এই আমেরিকাকে আমি অবনত মস্তকে প্রণাম জানাই। স্বাধীনতার উপলব্ধি, স্বাধীনতা বিষয়ক রচনা ও বাণীর মর্যাদা ও মূল্যবোধ আমি আমার মার্কিন অধ্যাপকদের কাছ থেকেই লাভ করেছি। তাঁরাই আমাকে শিখিয়েছেন সাধারণ মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখতে। আমি আব্রাহাম লিঙ্কনকে দেখেছি, আমেরিকার সমুদ্রতীরে দণ্ডায়মানা স্বাধীনতার দেবীকে দেখেছি। আমি মার্ক টোয়েন পড়েছি, ওয়াল্ট হুইটম্যান পড়েছি। তাঁদের রচনাসমূহ পড়ে মনে হয়েছে, তাঁরা যেন আমাদের বাড়িতে ছায়ার মতো আমাদের সঙ্গেই বসবাস করেছেন। তারপর একদিন ইতিহাসের অধ্যাপক আমায় একখানি গ্রামোফোন-রেকর্ড উপহার দিলেন। সেটা ছিল পল রোবসনের গান। তাঁর স্বরধ্বনিতে যেন সমস্ত ব্যথা-বেদনা, সমস্ত আনন্দ ঝরে পড়ছিল। আমার চোখের সামনে আমেরিকার উপত্যকায় যেন লক্ষ লক্ষ হলুদ ড্যাফোডিল ফুটে উঠলো। লক্ষ লক্ষ ধবধবে ফর্সা হাত আমেরিকার কারখানাগুলো চালাতে শুরু করলো। হাজার হাজার শিশুকে বইয়ের ব্যাগ বগলে নিয়ে হাসতে হাসতে স্কুল থেকে ফিরতে দেখলাম। তাদের সেই হাসিতে যেন শত শত নদীর কলধ্বনি, যে নদীগুলি রাইয়ের ঘন জঙ্গলে লোকচক্ষুর আড়ালে ফুলপরীদের মতো তন্ময় হয়ে মনোহর ভঙ্গিতে নৃত্য করে। আশ্চর্য, পল রোবসনের একটি রাগিণীতেই কতো না জাদুমন্ত্র প্রচ্ছন্ন রয়েছে—আমেরিকার অবারিত সৌন্দর্য, তার ভুবনমোহিনী রূপ—

পল রোবসনের কাছে এবং আমার অন্যান্য মার্কিন বন্ধুদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কারণ তাঁদের সাহায্যেই অপরিচয়ের ঘোমটা তুলে আমেরিকার জনসাধারণের সুন্দর মুখখানি দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমার এবং সেখানকার সাধারণ মানুষ তো অবিকল আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মতোই। একই রকমের সাদাসিধে। মন খুলে কথা বলা সহজ সরল মানুষ, যেমন এদেশের মানুষগুলো।

কিন্তু অন্য আমেরিকাও রয়েছে। সেটা সাধারণ মানুষের আমেরিকা নয়। সাধারণ মানুষের অধিকার লুণ্ঠনকারী শাসকগোষ্ঠী, সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলী ও বড় বড় ব্যবসায়ীদের আমেরিকা। ফোর্ড, ডোহান, রকফেলার, মরগান এবং

এমনি আরো শত শত ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কারের আমেরিকা, আমি যাদের নামও জানিনে। কিন্তু আমি অবশ্যই জানি যে এটা সেই আমেরিকা, যে তোমাকে কোরিয়ায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত করেছে, এবং তাদের হাত যদি কখনো আমার ওপরে পড়ে, তাহলে আমাকেও মৃত্যুশয্যায় শায়িত হতে হবে, কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। এই বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী সোনা, রুপো, লোহা, কয়লা, আলু, তেল, বিষাক্ত ওষুধপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র-জাতীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রাসাদের প্রভু। এরা এমনি মানুষ যে প্রত্যেকটি জীবিত অথবা জড় বস্তুকেই ব্যক্তিগত মুনাফার জন্যে বিক্রি করে। সামান্য মুনাফার জন্যে তোমাকেও তারা কোরিয়ায় বিক্রি করে দিয়েছে। সম্ভবত তোমার হাতে বন্দুক তুলে দেওয়ার সময় তারা নিশ্চয়ই তোমায় গোপন রহস্যটি জানায়নি, হয়তো শুধু বলেছে, মার্কিন জাতির অধিকার রক্ষার জন্যেই তুমি কোরিয়া যাচ্ছো। সে-সময় সেই উপদেষ্টামণ্ডলীকে তোমার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, কী সেই মার্কিন অধিকার এবং তারা কোরিয়ায় কী কাজ করছে। সেই অধিকারগুলি কি আমেরিকায়, বিশেষত পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় ফিরিয়ে আনা যায় না? তাহলে তো মানুষ অকৃত্রিম দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সেগুলোর যথার্থ রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে! শ্যাড্রক, তোমাদের সেই উপদেষ্টা-মণ্ডলীকে এ-কথা জিজ্ঞেস না করে তুমি দারুণ বিশ্বাসঘাতকতা করেছো। সে-জন্যে তোমায় কঠিনতম শাস্তিও ভোগ করতে হয়েছে। আমি জানি, এ-অপরাধে তুমি একাই চূড়ান্ত অপরাধী নও। আমি তোমায় দোষ দিচ্ছি নে। কারণ আমি জানি, আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী ব্যবসায়ীরা কতো অভিজ্ঞ ও ধূর্ত। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির একদিন আগেও, পার্ল হারবারের দিনটি পর্যন্তও, এই ব্যবসায়ীরা জাপানকে লোহা পাঠিয়েছিল, দু সেণ্ট মুনাফার জন্যে তারা তাদের দেশকে বিক্রি করে ফেলেছিল। সম্ভবত তোমাকে তারা সেই দু সেণ্ট মুনাফার যোগ্যও বিবেচনা করে না! আর এখন তো তোমার মতো হাজার হাজার হাজার মার্কিন শ্যাড্রক গুলির লক্ষ্যস্থলে পরিণত হচ্ছে। কখন ওদের বোধবুদ্ধি জাগ্রত হবে যে ওরা যে-বস্তুর জন্যে লড়াই করছে, সেটা আমেরিকার সর্ব-সাধারণের অধিকারের বস্তু নয়। সেটা হয়তো একচাঙড় কয়লা, যার ওপর দাবি রয়েছে কোরিয়াবাসীদের, একবিন্দু কেরোসিন যেটা দাবি করতে পারে মধ্যপ্রাচ্যের লোকেরাই, কিংবা হয়তো একটি রবার গাছ অথবা একটি টিনের খনি যেগুলির ওপর যথার্থই দাবি রয়েছে মালয়বাসীদের অথবা ইন্দোচীনাদের। এসব জায়গায় তোমরা নিজেদের আদর্শ প্রচার করতে আসোনি, এসেছিলে অন্যদের অধিকার লুণ্ঠন করতে। তোমরা তোমাদের উপদেষ্টামণ্ডলীকে এ-ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস না করে ভুল করেছো। আমি জানি, মানুষ পৃথিবীতে অনেক কাজ অনিচ্ছাকৃতভাবেই করে থাকে। কিন্তু আমি মনে করি, যখন একজন হাতে বন্দুক তুলে নেয় কিংবা অপরের বাড়িতে অনধিকারপ্রবেশ করে, তখন তার নিজেকেই অনেক প্রশ্ন করা উচিত: এটা কি সঠিক হচ্ছে? এ-ছাড়া

কি অন্য কোনো পথ নেই? আমি কি সত্যপথে রয়েছি? অপরের বাড়িতে আমার প্রবেশ করার অধিকার আছে কি? হাতে বন্দুক তুলে নেওয়ার আগে অবশ্যই তার এসবের মীমাংসা করে নেওয়া দরকার। কারণ বন্দুক প্রাণনাশ করে, প্রাণদান করে না। আমাদের এশিয়ায় তো একটা চমৎকার প্রথা রয়েছে, কারোর বাড়িতে কেউ কিছু চাইতে গেলে বন্দুক নিয়ে যায় না, ফুল নিয়ে যায়। আমি শুনেছি, তোমাদের পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় তো বড় বড় চমৎকার ফুল ফোটে —বন্ধু, তোমরা এশিয়ায় ফুল নিয়ে আসোনি, বন্দুক নিয়ে এসেছিলে। সেজন্যেই এশীয়-মার্কিন সম্পর্কের গল্পটি এরকম দুঃখ ও বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছে। এ-গল্প শুরু হয়েছে আজ থেকে অনেক বছর আগে। ১৮৫৪ সালে মার্কিন কমোডোর পেরি তাঁর ছোট্ট নৌবহর নিয়ে জাপানের সমুদ্রতীরে এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, তোমরা তোমাদের দেশের সমস্ত দরজা খুলে দাও, দেশের অভ্যন্তরে আমেরিকাকে বাণিজ্য করতে দাও। একটু ভেবে দেখো, ১৮৫৪ সালে পেরি জাপানে গিয়ে উপস্থিত হলেন, আর ১৮৫৯ সালে নিকলসন দিল্লীর দরজায় করাঘাত করলেন। তারপর ব্যাঙ্কক ছাড়িয়ে আরো আরো আগে আমাদের এশীয় দেশগুলিতে ইংরেজ, গ্রীক, পর্তুগীজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীদের লুঠতরাজ শুরু হয়ে গেলো। আসলে ওরা এশিয়ায় এসেছিল মুনাফা আর লুঠ-পাট করতে, কিন্তু পৃথিবীকে বোঝাতে চাইছিল যে ওরা অসভ্য বর্বর৷ এশিয়ায় খ্রীষ্টীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আজ এশিয়ার প্রত্যেকটি দেশে দেশপ্রেমিকেরা নিজেদের স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে দেখে সাম্রাজ্য-বাদীরা এখন নিজেদের সেই বুলিটা ত্যাগ করেছে। আজ তারা বলছে, আমরা এশিয়ায় সমাজতন্ত্রকে, কম্যুনিজমকে প্রবেশ করতে দেবো না। আমরা নিজেদের সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলবো। আজ প্রচার বদলে গেছে, প্রচারবিদরা বদলায়নি। সেই মৃত্যুর সওদাগরেরাই আজ পোশাক পাল্টে এসেছে। কিন্তু আমি তাদের চেহারাটা ঘোমটার আড়াল থাকা সত্ত্বেও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। আমি চাই, তুমিও সেটা দেখো এবং তোমার মতো যেসব লক্ষ লক্ষ মার্কিন যুবককে যুদ্ধের ইন্ধন হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, তারাও দেখুক। এই হলো অন্য আমেরিকার চেহারা, যে পরোপকার ও দানশীলতার ঘোমটা পরে আছে। ঘোমটা সরিয়ে দাও বন্ধু, দেখবে, তার মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এসেছে।

আমি তোমায় মার্কিন ও পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের গল্প বলছি। ১৮৫৮ সালে চীনে দেশপ্রেমিকরা বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সেই বিদ্রোহ নির্মম হাতে দমন করেছিল। পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতার সেই দেশের দ্বারগুলি পুনরায় আগন্তুক দস্যুদের জন্য খুলে দিতে হয়েছিল। দস্যুরা তো তাই চেয়েছিল। তারা চেয়েছিল চীনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সেখানকার জনসাধারণের শ্রম লুণ্ঠন করতে, তার নদীগুলিতে নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করতে, তার খনিজ সম্পদ ও

উৎপন্ন মূল্যবান সামগ্রী থেকে চীনা জনসাধারণকে বঞ্চিত করে রাখতে ও তাদের দেশের মান-মর্যাদাকে পদতলে দলিত-পিষ্ট করে দিতে। বলাই বাহুল্য, এ সবই ঘটেছিল। তারপর প্রথম মহাযুদ্ধ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে স্পষ্ট মনে হয়েছিল, সমগ্র চীন ও সমগ্র জাপান বলদর্পীদের পদতলে এসে পড়লো বুঝি। এমন কি কোরিয়াও। সমগ্র কোরিয়াটাকে আটত্রিশ খণ্ডে বিভক্ত করে মার্কিন ডলার তার পদতলে নিয়ে এসেছিল। কোরিয়ার মতো একটা সুন্দর দেশও খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গিয়েছিল। কমপক্ষে চার হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতা তার। আমি যদি তোমায় বলি, এটা এক অমানুষিক অপরাধ, তাহলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। কারণ আজ পর্যন্ত কোনো জাতির হৃদয় এভাবে এতোগুলি খণ্ডে খণ্ডিত হয়নি। দীর্ঘকাল ধরে কোরিয়া ছিল এক দেশ, এক জাতি, এক ভাষা, এক সঙ্গীত। পাশ্চাত্য ও মার্কিন ষড়যন্ত্র এবং যুদ্ধের পরেও সে এক থাকবে। আমার মতে, একটি জাতিকে দ্বিখণ্ডিত করার অধিকার কোনো বহিরাগত ক্ষমতার থাকতে পারে না। এবং যদি কেউ সেটা করে, তাকে আমরা সমাজবাদের পূজারী বলিনে, বলি, সমাজবাদের শত্রু।

কোরিয়ার ওপর কোরিয়াবাসীদেরই অধিকার রয়েছে, যেমনটি আমেরিকার ওপর অধিকার রয়েছে আমেরিকানদের। ওরা যেভাবে চায়, সেভাবেই নিজেদের ভাগ্য রূপায়িত করুক। যেরকম শাসনব্যবস্থা চায়, সেরকম শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলুক, পছন্দমতো সরকার নির্বাচন করুক। নিজেদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটাক। তাদের ভেতরের ও বাইরের পালিশ কেমন হবে, তাদের পতাকার রঙ কী হবে, সমস্ত ব্যাপারে তাদের অধিকারটাই সর্বাগ্রে। তাদের ওপর কোনো মতামত জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার অধিকার কোনো বহিরাগতের নেই। যদি কোরিয়ার লোকেরা একসঙ্গে বসে নিজেরাই সলা-পরামর্শ করে এসবের মীমাংসা করে নিতে পারে, সবচেয়ে ভালো। কিন্তু মত-বিরোধের ফলে যদি তারা গৃহযুদ্ধের মাধ্যমেই নিষ্পত্তি করতে চায়, তাতেও অপরের কিছু বলার এখতিয়ার নেই। সে তাদের পরামর্শ দিতে পারে, তাদের গৃহযুদ্ধকে ভালো অথবা মন্দ বলতে পারে, কিন্তু বন্দুক তুলে তাদের ঘরে প্রবেশ করতে পারে না। আমেরিকাতেও তো গৃহযুদ্ধ হয়েছিল, উত্তর আমেরিকা ক্রীতদাসপ্রথার বিরুদ্ধে দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল, কয়েক বছর ধরেই চলেছিল সেটা। কিন্তু বেচারা কোরিয়াবাসীরা তো তাতে কোনো-রকম নাক গলায়নি! তাছাড়া বৃটেনের গৃহযুদ্ধের কথাও আমাদের মনে আছে। যখন তারা সেখানকার সম্রাট প্রথম চার্লসের মস্তক ছেদন করেছিল, তখনও কোরিয়ার সম্রাট বৃটেনের শাহী শাসনব্যবস্থাকে পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেনি। তাহলে আজকেই বা কেন বৃটেন কোরিয়ার সমুদ্রে নিজেদের নৌবহর পাঠাচ্ছে। কী জন্য? সেই আটত্রিশ খণ্ডের রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্যেই কি? আশ্চর্য নয়, যদি ব্যাপারটা এই রকমই গড়াতে থাকে, আর সাম্রাজ্যবাদী

আমেরিকাকে যদি এইভাবেই পিছু হটতে হয়, তবে একদিন বৃটেনকে হয়তো তার বিষুবরেখা রক্ষণাবেক্ষণে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হবে।

কিন্তু আজকে এশীয়রা এই আটত্রিশ খণ্ডে বিভক্ত করার প্রণালীটির সঙ্গে সুপরিচিত হয়ে উঠেছে। তাদের বেশ ভালোভাবেই জানা আছে যে এই আটত্রিশ খণ্ডকে রক্ষা করার জন্যেই মার্কিন সৈন্যদের পাঠানো হচ্ছে না, বরং অন্য দেশকেও খণ্ড-বিখণ্ড করার জন্যে পাঠানো হচ্ছে তাদের। তারা এশিয়ার হৃদয় বিদীর্ণ করে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বেরিয়ে যেতে চায়। আর এই ভেদনীতি অনুসরণকারী সাম্রাজ্যবাদীরা যে-দেশের ওপর দিয়ে যায়, তাকেই দ্বিখণ্ডিত করে। মধ্যপ্রাচ্যের ওপর দিয়ে গেলে সেটা আরব ও ইজরায়েলে দ্বিধাবিভক্ত হয়। ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে যখন যায় ভারতবর্ষেই ভারত ও পাকিস্তান দুটি পৃথক দেশ গড়ে ওঠে, ইন্দোচীনের ওপর দিয়ে গেলে ইন্দোচীন ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া প্রভৃতিতে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, ইন্দোনেশিয়ার মধ্য দিয়ে গেলে নিউগিনি, ইন্দোনেশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই বিচ্ছিন্নতাবাদ এশিয়ার জাতিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করে না, বরং দুর্বল করে, যাতে তাদের ওপর নিজেদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখা যায়, সাম্রাজ্যবাদীদের একচ্ছত্র শাসনের নীচে দাবিয়ে রাখা যায়। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা এশীয়দের মধ্য থেকে নিজেদের দালাল ও কাঠের পুতুল খোঁজে, নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য তাদের প্রকৃত জাতীয় সরকার বলে বর্ণনা করে। তারপর সেখানকার প্রকৃত দেশ-প্রেমিকদের 'কম্যুনিস্ট' আখ্যা দিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে এবং সেই সাক্ষীগোপাল 'যথার্থ জাতীয় সরকারে'র ছত্রছায়ায় নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন বজায় রাখে। যুদ্ধের আগে এবং যুদ্ধের পরে এটাই ঘটেছে। কিন্তু যুদ্ধের পরে সমগ্র এশিয়ায় যখন জাতীয় আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছে, তখন সাম্রাজ্যবাদ ভূগর্ভে আশ্রয় নিয়েছে, নিজেদের দালালদের ছুঁড়ে দিয়েছে ওপরে। কিন্তু তাদের দিয়েও কাজ হচ্ছে না দেখে নিজেরাই তখন বন্দুক নিয়ে কোরিয়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। এটা সাম্রাজ্যবাদের শেষ লড়াই। বন্ধু, সেজন্যেই আজ বন্দুকের গুলিটি তোমার বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে।

আমি চাই ব্যাপারটা ভালো করে বুঝে নাও তুমি এবং তোমার মতো অন্যান্য হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মার্কিন যুবকও এই সত্যটা উপলব্ধি করুক। কারণ এই উপলব্ধির ওপরই পৃথিবীর শান্তি নির্ভর করছে। আজ মার্কিন জনসাধারণ ও মার্কিন যুবকদের ওপর এক কঠিন দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। আমার আশা রয়েছে, ইতিহাসের এক দাবি পূরণ করার জন্য তারা অবশ্যই আমাদের সাহায্য করবে। কারণ তারা এক এক করে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি-শ্যাড্রকে পরিণত হচ্ছে। তাই আমেরিকার যে শাসকগোষ্ঠী কোরিয়ায় যুদ্ধ ছড়িয়ে রেখেছে, সেই শাসকগোষ্ঠীকে তাদের বলা উচিত, তারা এই যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে নয়, বরং এশিয়ার জনসাধারণের পক্ষে। তাদের অবশ্যই বলা উচিত, আমরা এশিয়ায় কোনো

'ইজম'-এর বিরুদ্ধে লড়তে চাই নে, সেটা কমিউনিজমই হোক আর বুদ্ধিজমই হোক। সেটা এশীয়দের ব্যাপার। তারা যে 'ইজম' চায়, সেটাই রাখুক, যা চায় না তা ধ্বংস করুক। তাদের ভাগ্যের নিয়ামক তারা নিজেরাই। যদি আমেরিকা অন্য জাতির ভাগ্যের নিয়ামক হওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে আমরা কিছুতেই সেই অন্যায়ের সাথে সহযোগিতা করবো না। আমরা সাম্রাজ্যবাদের নতুন ক্রীতদাসে পরিণত হতে চাই নে কখনো, না ইউরোপে, না আমেরিকায়, না কোরিয়ায়, না এশিয়ার কোনো প্রান্তরে। জনসাধারণকে তাদের নিজ ভাগ্য তৈরি করতে দাও, দেখবে, তারা কেমন চমৎকার ভাগ্য গড়ে তোলে।

আমার এই চিঠি পড়ে তুমি ধরে নিও না যে তোমার মৃত্যুর জন্য আমার এতোটুকু দুঃখ নেই। কথা সেটা নয়। আসলে তোমার জন্যে আজ আমার চোখে একবিন্দু অশ্রুও নেই। বহুকাল আগেই আমার চোখের অশ্রু নিঃশেষ হয়ে গেছে। আমি আমার হৃদয় দিয়েই এতো দারিদ্র্য, সমাজের এতো অবিচার-অনাচার দেখেছি যে, তাই দেখে দেখে আমার চোখের অশ্রু শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তোমার মৃত্যুতে সত্যি আমি শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছি। তোমার হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে আমার হৃদয়ে দুঃখ ও ক্ষোভ ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু তোমার আসল হত্যাকারী কে? সে কি উত্তর কোরিয়ার সেই সৈন্যটি, যে তার স্ত্রী ও শিশুদের রক্ষা করার কথা মনে করে তোমার বুকে গুলি ছুঁড়েছে? সেটাও এক মর্মস্পর্শী গল্প। শুনবে?

১৯০৫ সালে রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধ বাধে এবং জাপান লড়াই করতে করতে চীনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। সেই তখনকার কথা বলছি। বিজয়ী জাপানের সৈন্যদলে এক মার্কিন যুবক লেফটেন্যান্টও ছিলেন। তাঁকে পাঠানো হয়েছিল আমেরিকার ওয়েস্ট পয়েন্ট থেকে। সেই সামরিক অফিসার-টির নাম ছিল ম্যাক আরথার। অফিসারটি ভিনদেশী হয়েও উচ্চ পদমর্যাদা নিয়ে জাপানী সৈন্যদলের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এখন সমস্ত ঘটনা গভীরভাবে চিন্তা করে বুঝতে পারছি, সম্ভবত লেফটেন্যান্ট ম্যাক আরথার ১৯০৫ সালেও উত্তর ইউরোপের এশীয় ভূখণ্ডে নিজেদের ব্যবসার জন্যে বড় বাজার খুঁজছিলেন, এবং এশিয়ার দেশগুলির ওপর লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে বসে ছিলেন। আমি বুঝতে পারছি, ১৯০৫ সালে ম্যাক আরথার যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলেন, বড় কষ্টে সেটা পূর্ণ হয়েছে ১৯৪৫ সালে। আমার সন্দেহ হচ্ছে, ১৯০৫ সালে সেই মার্কিন লেফটেন্যান্ট যখন কোরিয়ার সমুদ্রে জাহাজে চড়ে যাচ্ছিলেন, তখনই তোমার মৃত্যুর পরোয়ানা ছিল তাঁর পকেটে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা তোমার জন্মের বহু আগেই তোমার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছিল। আজ যখন এ-বিষয়ে গভীর-ভাবে চিন্তা করছি, তখন আমার সারা অন্তঃকরণ এমন শীতল হয়ে আসছে যে তোমার মৃত্যুতেও আমার চোখে অশ্রু আসছে না। ক্রোধের অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয়ে উঠছে সেই স্বৈরাচারীদের বিরুদ্ধে যারা আমেরিকার উনিশ-কুড়ি বছরের

ছেলেদের কোরিয়ার বধ্যভূমিতে নিক্ষেপ করছে। ওদের তো এখনোও স্কুল-কলেজে পড়ার সময়। ওদের যুদ্ধের খেলায় মেতে ওঠার বয়েস তো এটা নয়, ফুটবল হকি টেনিস খেলার বয়েস। সারা যৌবনকালটাই তো পড়ে ছিল তাদের সামনে, সে-যৌবন কাটানোর অধিকারও ছিল তাদের। সেই অধিকার যারা তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে, চোখে অশ্রু নিয়ে আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবো না। সেজন্যেই আজ তোমার জন্যে আমার চোখে অশ্রু নেই।

কিন্তু তার জন্যে তুমি আবার এটুকু বুঝে নিও না যে তোমার মৃত্যুর জন্যে আমার কোনো দুঃখ নেই। সম্ভবত তোমার মৃত্যুতে তোমাদের জেনারেল ম্যাক আরথার যতো না দুঃখ পেয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশী দুঃখ পেয়েছি আমি। কারণ জেনারেল ম্যাক আরথারের কাছে তোমার স্থান সামরিক মানচিত্রে একটা ছোট্ট আলপিনের চেয়ে বেশী নয়। কিন্তু আমি জানি, এর আগে একবার বলেছিও যে, যুদ্ধক্ষেত্রে একজন সৈন্যের মৃত্যু ঘটলে কী হয়!

সৈনিক কেন্থ শ্যাড্রক, বয়স কুড়ি বছর, সাকিন পশ্চিম ভার্জিনিয়া, আমেরিকা—কোরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বহু মূল্যবান জিনিসেরই মৃত্যু ঘটেছে। সেই সঙ্গে একটি গ্রন্থের মৃত্যু ঘটেছে, একটি গানের মৃত্যু ঘটেছে, তাজমহলের মতো সুন্দর কোনো প্রাসাদের মৃত্যু ঘটেছে। বিজ্ঞানের কোনো নতুন আবিষ্কার, শিল্পকলার কোনো নতুন ভাবনা, যা আজ পর্যন্ত কেউ উদ্ভাবন করতে পারেনি, সারা পৃথিবীকে বিষণ্ণ ও শোকাতুর করে রেখে সে-সবের মৃত্যু ঘটেছে। হয়তো শ্যাড্রকের মৃত্যু জেনারেল ম্যাক আরথারের কাছে একটা আলপিনের চেয়ে বেশী ক্ষতি নয়, কিন্তু অকপট হৃদয়ের যে-লোকগুলো শ্যাড্রককে যথার্থই ভালোবাসতো, শ্যাড্রকের মৃত্যুতে তারা আন্তরিক-ভাবেই শোকবিহ্বল। ভালভাবেই তারা জানে, এ মৃত্যু অর্থহীন। কোনো যথার্থ মূল্যের বিনিময়ে এ-মৃত্যু নয়। কারণ তারা মনে করে, আমাদের এই দেশ, এতো দৈন্যদশা, এতো মরু অঞ্চল থাকা সত্ত্বেও বড় সুন্দর মনোহর। এখানকার উর্বর জমি ও উপত্যকাগুলি ধান, গম, যব, ভুট্টা, বজরা, কাপাস, পাট-শণ প্রভৃতি শস্যে উপচে পড়ে। এখানে শত শত হাজার হাজার পাহাড় ও পার্বত্য অঞ্চলে সবুজ অরণ্য পান্নার মতো উজ্জ্বল দেখায়, বড় বড় শিলাস্তরগুলি সোনা, রুপো, দস্তা ও অভ্রে ঝকঝক করে। এখানে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত নদী ও উন্মুক্ত সরোবরগুলি তাদের কুমারী বুকে বিদ্যুতের মতো তাপ ও স্নেহসুধার মতো শক্তি লুকিয়ে রেখেছে। এখানে আমরা সকলেই সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারি, আরো উন্নত জীবন-যাপন করতে পারি। এই ধরিত্রী এতোই সমৃদ্ধ, স্নেহময়ী ও ঐশ্বর্যশালিনী, যদি আমরা চেষ্টা করি, সে আমাদের চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষাও পূরণ করার ক্ষমতা রাখে।

আবার যদি আমরা পৃথিবী থেকে চোখ তুলে বিশ্বের অন্য সৃষ্টিসম্ভারের

দিকে তাকিয়ে দেখি, মহাকাশে লক্ষ লক্ষ চন্দ্র-সূর্য, কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্রকে অবিরাম ঘুরতে দেখি। এতো অসংখ্য পৃথিবী রয়েছে যে, যদি একটু চেষ্টা করা যায়, প্রত্যেকটি মানুষ একটি করে নক্ষত্র পেতে পারে। সৃষ্টির অপার রহস্য হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের নির্ভীক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে অপেক্ষা করছে। শুধুমাত্র যেটা প্রয়োজন, সেটা হলো, কোরিয়ার এক ছোট্ট টিলার ওপর যুদ্ধ করার পরিবর্তে স্থান ও কালের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টি ফেরানো। শুধুমাত্র দরকার, মারাত্মক ও প্রাণঘাতী অ্যাটম বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কার করার পেছনে কোটি কোটি টাকা খরচ না করে সেই টাকা জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্পকলার জন্য ব্যয় করা, তাহলে মানুষ সত্যি সত্যি মানুষ হয়ে সৃষ্টির মূলকেন্দ্রে এসে দাঁড়াতে পারে। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং এ-ব্যাপারে আমি সুনিশ্চিত।

আমি যখন তোমায় এই শেষ লাইন কটি লিখছি, মুহূর্তের জন্য জানলার বাইরের দৃশ্যটা আমার চোখে পড়লো। যেখানে বসে আছি সেখান থেকেই প্রকৃতির এক মনোমুগ্ধকর সৌম্য দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। নিম্নভূমিতে দাঁড়িয়ে অন্ধকার ঝোপঝাড় থেকে উত্তুঙ্গ মাথা তুলে নারকেলের বাঁকাচোরা গাছগুলি বহুদূর পর্যন্ত চলে গেছে, গাছগুলির মাথায় পাখির ডানার মতো সবুজ সতেজ পাতা। দূরের সুদৃশ্য পাহাড় ও টিলাগুলি বর্ষার মেঘছায়ায় অজানা আকাশের কতো না নীলিমা গায়ে মেখে ঝকমক করছে। এইসব দেখছি আর ভাবছি, এই টিলাগুলি থেকে বহু দূরে অন্য কোনো এক টিলার ওপর তোমার মৃতদেহ নিঃসঙ্গ, শীতল, গুলিবিদ্ধ হয়ে নিবিড় স্তব্ধতায় পড়ে রয়েছে। তোমার কথা মনে পড়ছে আমার, সৈনিক কেন্থ শ্যাড্রক, পশ্চিম ভার্জিনিয়ার বাসিন্দা। সেই সঙ্গে আমার মনে পড়ছে অন্য শত শত শ্যাড্রকের কথা, তোমারই মতো যাদের বয়স কুড়ি বছর, যারা পশ্চিম ভার্জিনিয়া, কনসাস ওহিও, সিনাই, টেক্সাস, বোস্টন আর শিকাগোতে বাস করে। সৈনিক কেন্থ শ্যাড্রকের কথা মনে পড়ছে, যার বয়স এখনো কুড়ি ছোঁয়নি, উনিশ, আঠারো, ষোলো বছর বয়স যাদের। তারপর আমার মনে পড়লো মাত্র তিন বছর বয়সের কেন্থ শ্যাড্রককে, যে আমার ছেলে। ভাবতে ভাবতে আমি বিড়বিড় করে বলছি, না না, এটা হতে পারে না। তারা ওকে আবার কোনো ক্রীতদাসে পরিণত করতে পারে না, ওর হাতে বন্দুক তুলে দিয়ে কোনো টিলার ওপর খুন হওয়ার জন্য পাঠিয়ে দিতে পারে না। সেজন্যে আমার জানলার বাইরে বহুদূরে টিলার ওপর তোমার লাশ দেখতে পেয়েই আমি আমার জন্যেই মনস্থির করছি—শান্তি চাই। এখুনি শান্তি চাই। শান্তি চাই আমার জীবিতকালেই। শান্তি চাই সর্বকালে।

বিশ্বাসঘাতক

১৯৪৭ সালের ২রা আগস্ট। আমি তখন দাদুর বাড়িতে থাকি। আমার দাদুর বাড়ি লালাগাঁওয়ে। লালাগাঁও কেল্লা শোভা সিং স্টেশনের কাছেই। সেখানে আমাদের ব্রাহ্মণদের বাস বেশী। তারপর ক্ষত্রিয়। তারপর মুসলমান। আমার দাদুর বাড়ি গুরু-গোঁসাইয়ের বাড়ি নামে পরিচিত। মর্যাদার দিক দিয়ে ব্রাহ্মণ-দের মধ্যে সবার ওপরে। হাজার হাজার বছর ধরে আমরা এই গাঁয়ে বসবাস করে আসছি। শোনা যায়, এক সময় সারা এলাকাটাই আমাদের রাজত্ব ছিল। এখনো লালাগাঁওয়ে 'বড়বাড়ি' বলতে আমার দাদুদের অট্টালিকাটিই বোঝায়। সেটি নাকি সেকালে রামপাল ব্রাহ্মণ নিজের গৌরবের প্রতীক হিসেবেই নির্মাণ করেছিলেন। সেটা কি আর বাসভবন, পুরনো আমলের যেন এক দুর্গ! তার উত্তরে পশ্চিমে বহুদূর বিস্তৃত বালুকাময় টিলা আর অনাবাদী পতিত জমি। সেখানে শুধু কাঁটা-গুল্ম আর নলখাগড়ার বন। নলখাগড়ার সাদা ফুলের ওপর আনন্দের ঢেউ খেলে। মাঠের ওপর দিয়ে যখন হাওয়া বয়ে যায়, তখন নল-খাগড়ার ডগাগুলো এমনি দুলতে থাকে, দেখে মনে হয় যেন বিজন মরুভূমিতে ঝাঁক ঝাঁক উটপাখি ডানা ঝাপটে ছুটে যাচ্ছে। নলখাগড়ার বন আমার খুব পছন্দ। শাদাঁর মা যখন দুপুরবেলা ঘুমিয়ে পড়ে, তখন শাদাঁ আর আমি এখানে দেখা-সাক্ষাৎ করি। সে যাই হোক, অট্টালিকার সদর দরজার সামনে দিয়ে একটা কাঁচা রাস্তা উর্বর জমিগুলোর মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। আমি যে-সময়ের কথা বলছি, তখন জমিতে আখের গাছগুলো বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে। অনেক উৎসাহী প্রেমিক-প্রেমিকাকেই নিরাপদ আশ্রয় দিয়ে থাকে সবুজ আখের মাঠ। আমার আর শাদাঁর ফর্সা কপালে কটা চুলের গোছা এলোমেলো হয়ে যায়। শাদাঁর বড় বড় চোখে বিস্ময় ও ভাবনার ছায়া খেলে যায়। তখন কাঁটাগুল্ম ও নলখাগড়ার জঙ্গলে বয়ে যাওয়া হাওয়া আমাদের দুজনের মনে যেন চুপিচুপি এক অদ্ভুত বার্তা শোনাতে থাকে। হাওয়ার মৃদুমন্দ ধ্বনিতে এক অদেখা স্বপ্নের ঘুঙুর বাজতে লাগে। যে-প্রেম সব প্রাচীর, সব অবরোধ, সমস্ত সাগর-উপসাগর ডিঙিয়ে অন্ধকার দিগন্তে উজ্জ্বল ইন্দ্রধনুর মতো ভাস্বর হয়ে ওঠে, এই হাওয়া তার রেশম-কোমল ঝিরঝির শব্দে সেইসব চমৎকার প্রেমের উপাখ্যান ফিরে ফিরে শোনায়। নলখাগড়ার বনে হাওয়া তবু তো কথা বলে, কিছু আখ-খেতে সমাজ, সভ্যতা আর পুরনো সংস্কারের ভয়ে তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। যেখানে

বাতাসও ভীত-সন্ত্রস্ত, সেখানে কি আর প্রেমের অবকাশ আছে! তাই আমরা নলখাগড়ার বনেই আশ্রয় নিই। নলখাগড়ার গাছগুলোর মাথায় লম্বা লম্বা রেশম কোমল হালকা সাদা ঝুঁটি আমাদের ভালোবাসার মতোই গর্বোদ্ধত দেখায়।

২রা আগস্টের দুপুরবেলার কথা হচ্ছে। আমাদের পেছনে নলখাগড়ার বন। বনের পেছনে আমাদের গ্রাম। আমাদের সামনে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত অনাবাদী জমি। সকালে বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আকাশে সাদা মেঘের আনাগোনা, মোরগের মতো বুক ফুলিয়ে নিজের পালকে বৃষ্টিকণা লুকিয়ে কোথায় যেন উড়ে চলেছে। ভিজে-ভিজে বাতাস। মাটিতে সোঁদা-সোঁদা গন্ধ। ঝকঝকে পশ্চিমে দিগন্ত, মৃদু আলো ছড়ানো; যেন এখুনি এক মনোমুগ্ধকর রামধনু সৃষ্টি করবে। আমার হাত শাদাঁর হাতে। আমরা দুজনেই সেই দিগন্তের দিকে চেয়ে ছিলাম, যেন আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এক পর্যটকের মতো ওই ঝকঝকে পরিষ্কার পথ ধরে আসবে।

আমি শাদাঁর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বললাম, 'একদিন তুমি আমায় ভুলে যাবে!'

শাদাঁর বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। কিন্তু চুপ করে রইল সে। আমার কথার কোনো জবাব দিলো না। কী-ই বা জবাব দেবে! সৃষ্টির সেই আদ্যিকাল থেকেই তো নারী পুরুষকে, পুরুষ নারীকে জিজ্ঞেস করে আসছে এ-কথা। কতো পুরনো প্রশ্ন! কিন্তু প্রতিবারই নতুন মনে হয়। মনে হয়, যেন এই প্রথম জিজ্ঞেস করা হলো কথাটা।

আমি আবার বললাম, 'একদিন তোমার বিয়ে হয়ে যাবে।'

আমার দিকে না চেয়ে সে দিগন্তের দিকে চেয়েই মৃদুকণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, আমার বিয়ে হয়ে যাবে। যেমন তোমার হয়েছে, ঠিক তেমনি করেই।'

'আমার বিয়ে তো আমার মা-বাবা ছেলেবেলাতেই দিয়ে দিয়েছে।'

'আর তুমি কি মনে করছ, আমি আমার মর্জি-মতো বিয়ে করতে পারব?'

আমি মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

দিগন্ত থেকে চোখ সরিয়ে নিলো শাদাঁ। দিগন্ত যেন নৈরাশ্যে ছেয়ে গেছে এখন। সে আমার চিবুক ধরে মুখটা ওপরে তুললো। নিজের গোলাপী গাল রাখল আমার গালে। ধীরে ধীরে স্পষ্ট গলায় বলল, 'হ্যাঁ, ওইভাবে আমারও বিয়ে হয়ে যাবে একদিন। ছেলেপিলে হবে। তাদের জন্যে একজন ভালো মা হতে হবে আমাকে। নিজের স্বামীর জন্যে একজন বাধ্য সৎ-স্বভাবের স্ত্রী হতে হবে। আমার ঘরবাড়ি হবে। সুখ বলো আনন্দ বলো, একটি মেয়ে জীবনে যা কিছু চায়, আমার ভাগ্যে সবই জুটবে। কিন্তু মনের খুব গভীরে, গভীর থেকে আরো গভীরে, যেখানে মেয়েদের প্রাণ থাকে, সেখানে তুমি সব সময়েই থাকবে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাকে মনে পড়বে তোমার?'

শাদাঁ কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় নলখাগড়ার বনে কোথায় যেন সর-

সর একটা শব্দ হলো। একদম চুপ করে গেলো সে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে আমরা দুজনেই আওয়াজটার দিকে কান খাড়া করে রইলাম। বিস্ময়ে ও ভয়ে। এসময় এদিকে তো কেউ আসে না!

শব্দটা ক্রমশই কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। আমরা দুজনে পরস্পরকে চোখ টিপে উঠে দাঁড়ালাম। পা টিপে টিপে ঝোপটার অন্যদিকে চলে গেলাম। হঠাৎ শব্দটা এক জায়গায় গিয়ে থেমে গেলো। একজন বলল, 'আস্‌সালামো আলায়কুম্‌!'

অন্যজন জবাব দিলো, 'ওয়ালেকুমুস্‌ সালাম্‌।'

দ্বিতীয় ব্যক্তির গলার স্বর সহজেই চিনতে পারল শাদাঁ। সে চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল, আমি তাড়াতাড়ি তার মুখ হাত দিয়ে চাপা দিলাম। আমিও চিনতে পেরেছিলাম তার কণ্ঠস্বর। শাদাঁর ভাই তফেল। শাদাঁ আর তফেল দুজনেই লাহোর কলেজে পড়াশোনা করে। গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে গ্রামেএসেছে।

প্রথম ব্যক্তি বলল, 'আমি আলিপুর সৈয়দান থেকে আসছি। পীর কলন্দর শাহ্‌ পাঠিয়েছেন আমাকে।'

'পীর কলন্দর শাহ্‌ কে?'

'জবরগঞ্জের পীর কলন্দর শাহ্‌।'

'কী খবর?'

'খবরটা নম্বরদার সর্‌বুলন্দের কাছে পৌঁছে দিতে বলা হয়েছে।'

'আমি সর্‌বুলন্দের ছেলে তফেল।'

নবাগত বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, 'পীর কলন্দর শাহ্‌ বলেছেন, আপনারা লালাগাঁওয়ে এখনো কাজটা শুরু করেন নি। এটা ভারি অন্যায়। পনেরোই আগস্টের রাত্রির মধ্যেই সমস্ত ফয়সালা হয়ে যাওয়া উচিত।'

'কী ফয়সালা?'

'পীর কলন্দর শাহ্‌ বলেছেন, গাঁয়ে যতো যুবক রয়েছে, পনেরোই আগস্টের রাত্রির মধ্যেই সবাইকে খুন করতে হবে। এ-ছাড়া হিন্দু যুবতী মেয়েদের, যারা ইতিমধ্যেই এখানে এসে জমা হয়েছে, আর আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে এখানে আসছে, তাদের সবাইকেই আটকে রাখতে হবে। অবিশ্যি বৃদ্ধ মেয়ে-পুরুষ আর শিশুদের ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।'

শাদাঁ এসে আমার বুকে লেগে গেলো। আমাদের দুজনের বুক ঢিপঢিপ করছিল। পরস্পরের দিকে চেয়ে দেখলাম আমরা। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলাম।

কিছুক্ষণ পর তফেল বলল, 'আমার আব্বাও যে একটা খবর তোমাদের পীর কলন্দর শাহ্‌কে দিতে বলেছেন।'

'কী খবর?'

'আব্বা বলেছেন যে এ-কাজ আমাদের দ্বারা হবে না। কতো কাল থেকে

আমরা এ-গাঁয়ে একসঙ্গে বাস করে আসছি। আমাদের দ্বারা এ-কাজ সম্ভব নয়।'

নবাগত তফেলকে প্রায় ধমক দিয়ে বলল, 'সেরকম হলে আলিপুর সৈয়দান থেকে এসে আমরা নিজেরাই এ-কাজ করব।'

তফেল চুপ করে রইল। নলখাগাড়ার বনে আলাদা আলাদা পথ ধরে ক্রমশ দূরে চলে যাওয়া পায়ের শব্দ শোনা গেলো অনেকক্ষণ। একটু পরেই সারা জঙ্গলে স্তব্ধতা নেমে এলো।

আমি তাড়াতাড়ি শাদাঁকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দিয়ে বললাম, 'তুমি এক্ষুনি বাড়ি চলে যাও।'

সে আরো বেশী করে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'না না, আমি যাবো না। তুমি যেখানে যাবে, আমি সেখানেই যাবো।'

ম্লান হাসি হেসে বললাম, 'তুমি তো সবই শুনলে, তাই না?'

'না না, ওরা এ-কাজ করতে পারবে না। সত্যি বলছি, ওরা এটা করতে পারে না। আমরা সবাই তো একই পৃথিবীর সন্তান।'

'পৃথিবী তো কখনো বিষ ঢেলে দেয় না শাদাঁ। এই পৃথিবী থেকে সবুজ অঙ্কুরোদ্গম হয়। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ, যখন বাইরে লু বইতে শুরু করে, তখন দেখতে না-দেখতে সবুজ-শ্যামল মাঠ পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। তাতে পৃথিবীর কী দোষ, বলো?'

শাদাঁ মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি নিজের কাছ থেকেই তখন তাকে সরিয়ে দিতে দিতে বললাম, তুমি শীগগির বাড়ি যাও। নইলে বিপদ ঘটে যাবে। হাজারবার মেলামেশা করলেও যার মীমাংসা হয় না, আজই কি আর তার পথ খুঁজে পাওয়া যাবে? ওরা খুব চতুর শাদাঁ। ওরা আমাদের দেশটাকে টুকরো টুকরো করতে চাইছে। সবার আগে ওরা আমাদের মনকে টুকরো টুকরো করেছে। আসলে ভাঙনটা তো প্রথমে মনেই শুরু হয়।'

শাদাঁ অভিযোগের সুরে বলল, 'আমায় বলছ এ-কথা?'

'না, তোমাকে নয়। হয়তো আমি এ-কথা এখন নলখাগড়ার বনকে বলছি, পশ্চিমী হাওয়াকে বলছি। ভবঘুরে হয়ে যে-পথে নামতে হবে, হয়তো সেই পথকেই আমি বলছি এ-কথা। তুমি এখন তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও তো। আমাকে পাড়ায় গিয়ে খবর দিতে হবে।'

শাদা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলো। আমি পাড়ায় গিয়ে সবাইকে খবরটা দিলাম। ক-দিন থেকে আশপাশের গ্রাম থেকে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিয়ে-হওয়া মেয়েরা লালাগাঁওয়ে এসে আশ্রয় নিচ্ছিল। খবর শুনতেই চারদিকে কান্নাকাটি পড়ে গেলো। কিছুক্ষণ পরেই নম্বরদার সরবুলন্দ দৌড়তে দৌড়তে আমাদের বাড়ি এলো। সে আমার দিদিমা মাতা ঈশ্বর কৌরকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করে। আমার দিদিমা গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে বৃদ্ধা। গ্রামের সব হিন্দু, শিখ, মুসলমান—

কেউ-ই তাঁর কথা ফেলতে পারে না। বয়েস পঁচাশি বছর। কিন্তু দেখাতো যেন একশো বছরের বুড়ি। তিনি এসেই নম্বরদারের গায়ে হাত রাখলেন। গাল দিয়ে বললেন, 'আয় সর্‌বুলন্দ।'

সর্‌বুলন্দ মাতা ঈশ্বর কৌরের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। তারপর বলল, 'মা, আমরা তোমার ছেলে। আমাদের প্রাণ থাকতে এ-গাঁয়ের কোনো বউ-ঝির দিকে চোখ তুলে তাকানোর ক্ষমতা আলিপুর সৈয়দানের কারোর নেই। এটাই গাঁয়ের সব মুসলমানের কথা।'

শুকনো ঠোঁটে খুশির হাসি খেলে গেলো। মাতা ঈশ্বর কৌর জানেন নম্বরদার সর্‌বুলন্দ কখনো মিথ্যে বলে না। নিশ্চিন্ত হলেন তিনি। আর তাঁর নিশ্চিন্ত হওয়া মানে সবারই নিশ্চিন্ত হওয়া। বেঁধে-ফেলা বিছানাপত্তর খুলে ফেলা হলো। বোঁচকা থেকে জিনিসপত্তর বার করা হলো। মাঝ-বয়েসী মেয়েরা রান্নাবান্না নিয়ে পড়ল। বয়স্কা মেয়েরা আয়নার সামনে বসে তাদের বড় বড় চোখে কাজল পরতে শুরু করল, আর নিজেদের রূপ দেখে নিজেরাই লজ্জা পেয়ে ঘোমটায় মুখ ঢাকতে লাগল।

দু-তিন দিন নিশ্চিন্তেই কাটল। কোনোরকম দুশ্চিন্তার কারণ ঘটেনি। হিন্দু মুসলমান উভয়ে মিলেই গাঁয়ের চারদিকে পাহারা দিলো। ভাবনার কথা বলতে একটাই, আশপাশের অঞ্চল থেকে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়রা লালাগাঁওয়ে আশ্রয় নিতে আসছিল দলে দলে। কোথাও কোনো ঝগড়া-বিবাদ নেই। কিন্তু ঝড়বৃষ্টি আসার আগে পাখি যেমন বাতাস শুঁকে তা বুঝতে পারে তারপর নিজের বাসা ছেড়ে বিপরীত দিকে উড়তে শুরু করে, তেমনি চারদিক থেকে হিন্দুদের ছোট ছোট দল লালাগাঁওয়ে আসতে লাগল।

পাঁচই আগস্ট আলিপুর সৈয়দান গ্রামের দিক থেকে ঢোলের শব্দ শোনা গেলো। ঢোলের শব্দ ক্রমশ জোরালো হতে হতে কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। পাড়ায় মেয়েরা চীৎকার করে কান্নাকাটি শুরু করল। অনেক মেয়েই অজ্ঞান হয়ে পড়ল। ছেলেপিলেদের আর্ত চিৎকারে চারদিক কেঁপে উঠল। ঠিক সে-সময় নম্বরদার সর্‌বুলন্দ এসে বলল, 'আলিপুর সৈয়দান থেকে পাঁচশো মুসলমানের এক দঙ্গল আসছে। মোকাবিলা করার জন্যে আমরা মাত্র পঞ্চাশজন মুসলমান রয়েছি। আপনাদের রক্ষে করতে পারব না। আপনারা নিজেরাই ভেবে দেখুন কি করবেন।'

সর্‌বুলন্দ যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কী যে হুটোপাটি শুরু হলো, তা বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই। মা মেয়েকে ভুলে গেলো, মেয়ে বাবাকে, বাবা নিজের ছেলেপিলেকে। যে যেদিকে পারল, দৌড় দিলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই অতোবড় প্রাসাদ একেবারে খাঁ খাঁ করতে লাগল। শুধু এক অন্ধকার কোণে দিদিমা একটা খাটের ওপর চুপচাপ বসে রইলেন। আমি তাঁর পায়ের কাছে এসে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, 'হ্যাঁ রে গাধা, তুই যাসনি?'

'দিদিমা, আমি তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাব।'

'কি করে নিয়ে যাবি? আমি তো হাঁটতেই পারি না।'

'আমি তোমায় কাঁধে করে নিয়ে যাব।'

'আমার নিজের ছেলেই আমায় নিয়ে গেলো না, তো তুই কি নিয়ে যাবি!'

'আমি নিয়ে যাব।' আমি তাকে কাঁধে তুলে নেওয়ার জন্যে এগিয়ে গেলাম।

'খবরদার, আমার গায়ে যে হাত দেবে, আমি তাকে আস্ত রাখব না।'

ঢোলের শব্দ আরো কাছে এগিয়ে আসতে লাগল।

'কিন্তু দিদিমা, আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ? ওরা অনেকদূর এসে পড়েছে।'

'আমি একটু বেশীই শুনতে পাচ্ছি। আর ভগবানের দয়ায় যা শুনছি, তা যেন আর কখনো না শুনতে হয়। আমায় এখানেই থাকতে দে। তুই চলে যা। ওরা আমায় কিছু বলবে না। পীর কলন্দর শাহ্‌, তাই না? পীর কলন্দর শাহ একবার আসুক তো আমার সামনে! ওর তখন জন্মই হয়নি, ওর মায়ের বিয়েতে আমি আলিপুর সৈয়দান গিয়েছিলাম। ওর মাকে বিয়ের ডালি দিয়ে এসেছিলাম। সত্যি সত্যি ও একবার আমার সামনে আসুক।'

'কিন্তু দিদিমা—

'তুই চলে যা। বলছিনে বারবার। নিজের রক্ত আমার মাথায় মাখাস নে। আমি অতো বকতে পারি নে।

দিদিমা খাটের ওপর পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন। আমার দিকে পেছন ফিরে। আমি মাথা নীচু করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম।

সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে আখ-খেতের ওপর দিয়ে পায়ে-হাঁটা পথ ধরলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেলো। হাঁটা পথ ছেড়ে আমি বাড়ির অন্যপাশে চলে এলাম, নলখাগড়ার বনের দিকে। ঢোলের শব্দের সঙ্গে 'আল্লাহো আকবর' ধ্বনি এখন পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। আল্লাহো আকবর' মানে ঈশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং মানুষ অত্যন্ত ক্ষুদ্র। সংকীর্ণ দৃষ্টি, নীচ, ইতর কোথাকার! সভ্যতার উচ্চতর মিনারে চড়েও নিজেদের কুমতলবের কথা তারস্বরে ঘোষণা করতে লজ্জা পায় না। কারণ ওরা মানুষ, ঈশ্বর তো নয়! তাই আমি ওদের সরব চিৎকারের কোনো গুরুত্ব দিলাম না। আমি আর শাদাঁ যেখানে দুপুরবেলা বসে কাটাতাম, সেই নলখাগড়ার ঝোপটাকে শেষবারের মতো দেখার জন্যে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু এখন সেখানে কেউ নেই। বেদনাভারাক্রান্ত চোখে জায়গাটার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলাম আমি। কি এমন আহামরি জায়গা! এক বালুকাময় টিলা। সেখানে আমরা দু'জনে বসতাম। সামনে অনাবাদী পতিত জমি। দিগন্ত মেটে রঙের মেঘে ছেয়ে আছে। এখানে সবুজ গাছপালা নেই, চমৎকার ফুল নেই, বর্ণাঢ্য গোধূলি নেই। ঝর্ণা, পাহাড়, জল, সরোবর—কিছুই নেই। এসব থাকলে না-হয় জায়গাটা নিয়ে কাব্য করা যেতো। তবু জায়গাটাকে এক টুকরো স্বর্গ বলে মনে হচ্ছে কেন?

আমি আস্তে আস্তে উচ্চারণ করলাম, 'শার্দা ! শার্দা !!' আমাদের দেখা করার এটাই নিয়ম ছিল। সে এসে নলখাগড়ার মধ্যে লুকিয়ে পড়ত। আমি যখন তাকে সাড়া দিতাম, অমনি সে বেরিয়ে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরত। আমি জানতাম, সে এখন এখানে নেই। তবু আমার অবুঝ মন বলে উঠল, 'শার্দা ! শার্দা !!'

কিন্তু সেখানে কেউ ছিল না। ঝোপটা যেমনকার তেমনিই চুপচাপ দাঁড়িয়ে। নলখাগড়ার সাদা ফুলের ঝুঁটি সন্ধ্যের আধো অন্ধকারকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে কেল্লা শোভা সিং রেল-স্টেশনের দিকে দৌড়তে লাগলাম। রাত সাড়ে আটটার গাড়ি ধরে যদি নারোয়াল পৌঁছতে পারি, তাহলে লাহোর যাওয়ার ট্রেন ধরতে পারব। লাহোরে আমার বাবা থাকেন।

প্রায় পৌণে এক ঘণ্টা ছুটতে ছুটতে কেল্লা শোভা সিং স্টেশনের কাছে এসে যখন পৌঁছলাম, তখন অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়েছে। স্টেশনের কাছেই এক বিশাল বটগাছ। তার প্রায় ডজনখানেক ডাল মাটির ওপর ঝুলছে। সেখানে অন্ধকার আরো ঘন। সেই অন্ধকারে যেন এক অদ্ভুত ভয় জড়িয়ে আছে। প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যুর সম্ভাবনা। সাহস করে আমি সামনে এগিয়ে গেলাম। হঠাৎ বটগাছের একটা ডালের আড়াল থেকে এক ছায়ামূর্তি এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি হাত তুলতেই দেখলাম, শার্দা আমার দুই বাহুর মধ্যে। মাথার চুল তার আলুথালু। পরনের জামা ছেঁড়া-ফাটা। খালি পায়েই সে ছুটতে ছুটতে এসেছে।

সে আমাকে এক নিঃশ্বাসে বলল, 'আমি তফেলকে সবকিছু বলে দিয়েছি। সে তোমায় সাবধানে লাহোর পৌঁছে দেবে।'

'তফেল আমায় মেরে ফেলবে না তো ?'

'না। আমি ওর কাছে কসম খেয়েছি, ওর দোস্ত আফতাবকে আমি বিয়ে করব। সে বিয়ে করার জন্যে এক যুগ থেকে আমার পেছনে লেগে আছে।' সে ভীতবিহ্বল কণ্ঠে কথাগুলো দ্রুত বলে গেলো। খর নিঃশ্বাস পড়ছিল তার।

'কিন্তু তফেল কোথায় ?'

'ওই স্টেশনে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। লাহোর পৌঁছে সেখান থেকে সে আমার নামে একটা চিঠি নিয়ে আসবে। তোমার নিজের হাতে লেখা। আর যদি সে চিঠি না আনে, তাহলে আমি নিজের প্রাণ দেবো।' হঠাৎ সে থেমে গেলো। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঠাণ্ডা শীতল গলায় বলল, 'এখন যাও তুমি।'

হঠাৎ যেন আমার পায়ের তলার মাটি সরে গেলো। আমার পা দুটো যেন অবশ হয়ে পড়ল। আমি সেখানেই মাটির ওপর বসে পড়ে শার্দার পা জড়িয়ে ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললাম, কি করে যাবো ? তোমাকে ফেলে আমি কি করে যাবো শার্দা ? না না, আমি যাবো না।'

'ওঠো। এখন তোমার স্ত্রীর কথা, বাচ্চাদের কথা ভাবো। তোমার বাবা মা ভাই বোনের কথা চিন্তা করো। তাদের সবাইকেই দেখাশোনা করার দায়িত্ব তোমার।'

আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, 'উচ্ছন্নে যাক সব। আমি এখানেই থাকব। মুসলমান হয়ে তোমাকে বিয়ে করব।'

'তাহলে তোমার ওপর আমার কিন্তু এতটুকু ভক্তিশ্রদ্ধা থাকবে না।' শাদা মৃদুকণ্ঠে বলল। আদর করে আমাকে মাটি থেকে ওঠালো। একটা শিশুর মতো নিজের বুকে টেনে নিলো আমায়। নরম হাতে আমার চোখের জল মুছে দিতে লাগল। তার অশ্রু-ভারাক্রান্ত চোখ যেন আমাকে বলছে, 'এসো, আজ শেষবারের মতো আমি নিজের হাতে তোমার চোখের জল মুছে দিই। কারণ, এর পর আর কখনো তোমার চোখের জলে আমার হাত ভিজবে না। জীবন-ভর তুমি আমার জন্যে কাঁদবে। আমিও জীবন-ভর তোমার জন্যে কাঁদব। আমাদের চোখ থেকে এই ঝরে-পড়া অশ্রু সাত সমুদ্র হয়ে আমাদের দুজনের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করবে। কিন্তু আমি জানি, এই ব্যবধানের জন্যেই সুন্দর স্বচ্ছন্দ জীবনের যাত্রাপথে স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসার প্রতিটি অনুকূল বাঁকে তোমায় মনে পড়বে আমার। সন্ধ্যায় তাড়াহুড়ো করে যখন আমি আমার প্রিয় স্বামীকে গরম গরম খাবার তৈরী করে খাওয়াবো, তখন তোমার কথা স্মরণ করব আমি। রাতের স্তব্ধতায় নিজের ছেলেকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে যখন ঘুম-পাড়ানী গান গাইব, তখন স্মরণ করব তোমাকে। আর যখন সব শেষ হয়ে যাবে, জীবনের সব দায়িত্ব চুকে যাবে, মৃত্যু আমার চোখের পাতায় অন্তিম স্পর্শ দিতে আসবে, সে-সময়েও তোমাকে স্মরণ করব। আমার শেষ নিঃশ্বাসে, আমার হৃদয়ের শেষ স্পন্দনে, আমার ঠোঁটের শেষ আন্দোলনে তুমি আমার প্রার্থনা হয়ে আসবে। তারপর তুমি আমার আত্মার সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে যাবে।'

স্মৃতি……স্মৃতি……স্মৃতি যদি সম্পদ হতো, তাহলে পৃথিবীতে কোনো দরিদ্র থাকত না, ভালোবাসার কাঙাল থাকত না কেউ। একবার শাদা নিজেই একথা বলেছিল আমাকে। কিন্তু আজ সেকথা মনে করিয়ে দেওয়া উচিত মনে হলো না আমার। সে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছিল, আমি তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করলাম। তারপর নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে স্টেশনের দিকে ছুটে গেলাম। কারণ গাড়ি তখন আউট-সিগন্যালের কাছে এসে পড়েছে।

স্টেশনের সিঁড়িতে উঠতে উঠতে ফিরে তাকালাম আমি। অন্ধকার ছায়ায় শাদা চুপচাপ দাঁড়িয়ে। দূরে প্রাসাদোপম অট্টালিকায় ঢোল বাজছে। আর অট্টালিকার ওপাশে আমাদের নলখাগড়ার জঙ্গল পুড়ে যাচ্ছে।

দুই

লাহোর স্টেশনে আমাকে পৌছে দিয়ে তফেল বলল, 'শুয়োরের বাচ্চা পাপের বাঁচি বামুন, শাদাঁ যদি আমায় কসম খাইয়ে না নিতো, গাড়িতেই সাবাড় করে দিতাম তোকে। নে, এখন এই কাগজটায় তোর কুশল সংবাদ লিখে দে। অন্য কিছু লিখবি নে। নইলে তোর মুণ্ডু উড়িয়ে দেবো।'

আমি ভয়ে ভয়ে শাদাঁকে লিখলাম, 'শাদাঁ, তোর ভাই আমাকে লাহোরে বেশ ভালোভাবেই পৌছে দিয়েছে। যতোক্ষণ বেঁচে থাকব, তোর এই উপকার মনে থাকবে।'

তফেল শেষ কথাটা কেটে দিলো, 'এর আবার কি দরকার?' কাগজটাকে ভাঁজ করে পকেটে পুরলো সে। তারপর আমাকে ধমক দিয়ে বলল, 'নে, এখন পালা। আমার চোখের সামনে থেকে দূর হ। তোকে দেখলে আমার মাথায় খুন চাপছে। বামুন কুকুর!'

আমি শীগগীর সেখান থেকে চলে এলাম। স্টেশনের বাইরে এসে একটা টাঙ্গায় উঠলাম। শাহে আলিমীর দোর গোড়ায় এসে টাঙ্গাওয়ালা আমাকে নামিয়ে দিলো। শাহে আলিমীর ভেতরে যেতে চাইল না সে। সুতরাং পায়ে হেঁটে ভেতরে গেলাম। সয়র্ কি বান্দা বড় গলি হয়ে সুতর মণ্ডিতে নিজেদের বাড়ির দিকে এগোলাম। রাস্তায় একটি ছেলে কখনো আমার আগে কখনো আমার পিছে হাঁটছিল।

আমি ওকে বললাম, 'আমি যে এখানে এই একলা ঘুরে বেড়াচ্ছি, তার মানে বুঝতেই পারছ, আমিও তৈরী।'

একথা শুনেই ছেলেটি কেটে পড়ল। অমনি আমি নিজের বাড়ির দিকে ঘুরলাম। বাড়িতে গিয়ে দেখি দরজায় তালা দেওয়া। বাড়িতে কেউ-ই নেই। বাবা মা ভাই বোন সবাই চলে গেছে কোথায়। কোথায় গেছে, তারও হদিশ নেই। কারণ আশে পাশের বাড়িগুলোও তালাবন্ধ। চারদিক খাঁ খাঁ করছে। এখন কোথায় যাবো আমি, কিছুই বুঝে উঠতে পারছি নে। এমন বিপদ যে চোখে জলও আসে না। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে। বড় কষ্টে ঢোক গিললাম আমি। এদিক-ওদিক খুঁজে গলির ভাঙা নর্দমা থেকে একটা পাথর তুলে এনে দরজার তালা ভাঙলাম। তারপর ভেতরে প্রবেশ করলাম।

বাড়ি খাঁ খাঁ করছে। দামী জিনিসপত্তর কিছুই নেই। দরকারী জিনিস যা কিছু সবই নিয়ে গেছে। রান্নাঘরে গিয়ে দেখলাম, হাঁড়ি থালা-বাসন রয়েছে,

কিন্তু খাবার নেই কিছুই। কল খুলে জল খেলাম। তারপর ওপর তলায় গিয়ে একটা খাটে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম।

সারাটা রাত্রি এভাবে কাটল। কখনো ঘুমিয়ে কখনো জেগে। রাত্রে কখনো কখনো এমন স্তব্ধতা নেমে আসে, যেন সারা শহরে কেউ বেঁচে নেই। আবার কখনো কখনো এমন চিৎকার ভেসে আসে, যেন কসাইখানায় ছাগল মৃত্যু-যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। কখনো কোথাও গুলির শব্দ, কখনো বা চারদিকে পটকা ফাটার আওয়াজ। তারপর আবার হঠাৎ স্তব্ধতায় ছেয়ে যাচ্ছে চারদিক।

এক দিন এক রাত্রি আমি বাড়ীতেই লুকিয়ে রইলাম। কিন্তু খিদে এমন তীব্র হয়ে উঠল যে, শেষ পর্যন্ত বেরোতেই হলো। রাস্তায় কোনো বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়নি। হাঁটতে হাঁটতে সূতর মণ্ডী থেকে লোহারী গেট, লোহারী গেট থেকে ভাই গেট, ভাই গেট থেকে বাদশাহী মসজিদের দিকে চলে এলাম। কেন এলাম, সে-সব তখন মাথায় আসছে না। সেখান থেকে হীরা মণ্ডী চলে গেলাম। হীরা মণ্ডিতে আনোয়ার কাবাবওয়ালার কাছ থেকে কাবাব কিনে খেতে শুরু করলাম। আনোয়ার কাবাবওয়ালা আমাকে চিনতে পারল। আমাকে চোখ টিপল সে। কিন্তু বলল না কিছু। কারণ দু-তিনজন মাস্তান গোছের মুসলমান তার দোকান থেকে কাবাব নিচ্ছিল। তারা চলে যেতেই সে ভীত কণ্ঠে বলল, 'পণ্ডিতজী, আপনি এখানে কেন? খোদার দোহাই, এখখুনি চলে যান এখান থেকে।'

আমি হতাশ গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় যাবো?'

'আরে, আপনার বন্ধু মিয়াঁ, হাজি আর বরক তাজির ওখানে গান শুনছে। আপনি চলে যান ওখানে।'

আমি মিয়াঁর নাম শুনে আনোয়ারের সঙ্গে জোরে করমর্দন করলাম। ইস্, এই বিপদে মিয়াঁর কথা আমার মনেই পড়েনি। মিয়াঁর সঙ্গে আমার দারুণ দোস্তি। মিয়াঁ, হাজি, বরক আর আমি রোজ রাতে আড্ডা জমাতাম। আমি পেছনের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে তাজির ঘরে প্রবেশ করলাম। ভেতরে হাজি, বরক আর মিয়াঁ বসে রয়েছে। আর তাজি সেজেগুজে চতুর্দশীর চাঁদ হয়ে গান গাইছে। আমাকে দেখেই তার মুখ-চোখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। হাজির চেহারাও বিবর্ণ। কিন্তু সত্যিই সাবাস জানাতে হয় মিয়াঁকে। সে তখুনি উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। বরকও আমার হাত ধরে নিজের কাছে বসালো।

মিয়াঁ জিজ্ঞেস করল, 'কোত্থেকে আসছ?'

আমি আমার দুর্ভাগ্যের কথা জানালাম ওকে।

তাজি বলল, 'আপনি পণ্ডিতজীকে নিয়ে যান এখান থেকে। কিছু হয়ে গেলে আমায় দোষ দেবেন না কিন্তু।'

মিয়াঁ তাজির ভাইয়ের কাছ থেকে একটা লুঙ্গি আর একটা লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবি চেয়ে নিলো। সেগুলো পরালো আমাকে। তারপর আমরা সবাই

তাজির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলাম। নীচে এসে মিয়াঁর গাড়িতে উঠে বসলাম আমরা। মিয়াঁ দ্রুতবেগে গাড়ি চালিয়ে নিজের বাড়ির কাছে এসে থামল। ভারতনগরে তার দোতলা বাড়ি। স্টেশনের কাছেই।

আমি বৌদিকে আদাব করলাম, কিন্তু সে একদম সিঁটিয়ে রইল। কিছু বলল না, চুপচাপ দেখতে লাগল আমাকে। যেন কোনো মানুষকে দেখছে না, কোনো মৃত ব্যক্তির দিকে চেয়ে আছে ও। আমার কিছুটা আশ্চর্য বোধ হলো। কারণ দশ বছর ধরে মেট্যাল পেইন্ট কোম্পানীতে আমার আর মিয়াঁর অংশ রয়েছে। এখন আমি সেখান থেকে আলাদা হয়ে নিজে পাবলিশিং কোম্পানী খুলেছি। কিন্তু আমাদের দুজনের মন কখনো আলাদা হয়নি। বিয়ে-শাদি সুখ-দুঃখে পরস্পর সহোদরের মতোই এক সঙ্গে থেকেছি। আজ পর্যন্ত সে আমাকে কখনো কোনো খারাপ কথা বলেনি। আমি জানি, আমার আর মিয়াঁর গাঢ় বন্ধুত্বে অনেকের মনেই ঈর্ষার জ্বালা ধরে। কারণ হাজিরও টান ছিল মিয়াঁর ওপর, বরকেরও। মিয়াঁকে তো সারা দুনিয়ার লোকই চাইত। তার হাসি-খুশি খোলামেলা স্বভাব, টাকা-পয়সার ব্যাপারে দরাজ হাত, অকপট ভালোবাসা, এসবের জন্যেই তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে উদগ্রীব ছিল সবাই। কিন্তু মিয়াঁ নিজের বন্ধুদের মধ্যে কেবল আমাকেই ভালোবাসত সবচেয়ে বেশী। তার অন্যান্য বন্ধুরা সবাই মেনে নিয়েছিল সেটা। আমার কিন্তু সব সময়েই মনে হয় হাজি ব্যাপারটাকে কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারেনি।

প্রায় দশটার সময় হাজি চলে যেতে চাইল। মিয়াঁ তাকে থেকে যাওয়ার জন্যে বলল। কিন্তু সে কিছুতেই থাকতে চাইল না, চলে গেলো। বরক বসে রইল। হাজির যাওয়ার আধ ঘণ্টা পৌনে এক ঘণ্টা পর সে-ও বিদায় নিলো।

হাজি ও বরক চলে গেলে আমি, মিয়াঁ, বৌদি এবং ওদের দুই ছেলে তারিক ও তসনিম খাওয়া দাওয়া সারলাম। তারিকের বয়েস আট বছর, তসনিমের ছ বছর। দুজনেই আমাকে চাচা বলে ডাকে।

খাওয়া-দাওয়ার পর অনেকক্ষণ ধরে তারিক ও তসনিমকে গল্প শোনালাম এগারোটার কাছাকাছি ওরা দুজনেই গল্প শুনতে শুনতে একসময় সোফার ওপরেই ঘুমিয়ে পড়ল। ওরা ঘুমিয়ে পড়তেই আমরা ওদের ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলাম।

তারপর মিয়াঁ তার স্ত্রীকে বলল, 'আজ আমরা ওপরে মাঝের কামরায় ঘুমবো।'

তার স্ত্রী কোনো প্রতিবাদ করল না। আমরা দোতলায় শোবার ঘরে গেলাম। মনে হচ্ছে আমি কতোদিন ঘুমোই নি। বিছানায় শুয়ে পড়তেই ঘুম এলো। তারপর কি হয়েছিল, কি হয়নি, আমার আর জানা নেই। মাঝে মাঝে আমি যেন স্বপ্নের মধ্যে শুনতে পাচ্ছি, মিয়াঁর বাড়ির দরজায় বহুলোক ধাক্কা মারছে, চেঁচামেচি করছে, কথা কাটাকাটি হচ্ছে, তারপর কান্নাকাটির আওয়াজ।

হঠাৎ আমার চোখ খুলে গেলো।

চেয়ে দেখলাম, মিয়াঁ বিছানায় নেই। ঘরের চারদিক স্তব্ধ। কোনোদিক থেকে কোনো সাড়াশব্দও আসছে না। বাথরুমে গিয়ে দেখলাম, সেখানেও মিয়াঁ নেই। খুব আস্তে আস্তে ঘরের দরজা খুললাম, যেন শব্দ না হয়। খালি পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়িতে এলাম। চারদিক স্তব্ধ। কিন্তু রাতের স্তব্ধতায় নীচু-তলা থেকে কার কথাবার্তার শব্দ আসছে যেন। আমি পা টিপে টিপে নীচে নেমে এলাম।

মিয়াঁ তার স্ত্রীর ঘরে। ঘরের দরজা সামান্য খোলা আর আমি দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তা শুনতে লাগলাম। মিয়াঁর স্ত্রী বলছিল, 'ওকে এখানে রাখার কোনো অধিকার নেই তোমার।'

'আমি ওকে ডাকতে গিয়েছিলাম ?'

'আমি জানি না। তুমি ওকে গুণ্ডাদের হাতে তুলে দাও।'

'সারা জীবনের দোস্তিকে কি জলে ভাসিয়ে দেবো ? এটা কি মনুষ্যত্ব ?'

'আর কোনো পথ নেই।' মিয়াঁর স্ত্রী চীৎকার করে বলল, 'কোনো উপায় নেই। তুমি যদি ওকে গুণ্ডাদের হাতে তুলে না দাও, তাহলে তোমার আর ওর দুজনেরই রক্ত দেখে ছাড়ব আমি।'

মিয়াঁর স্ত্রী শূন্যে তার হাতের লম্বা নখ নাড়ল। এখন তাকে আমার ডাইনী-পেতনী বলে মনে হচ্ছে।

সে মিয়াঁর জামার কলার ধরে বলল, 'যাও, ওকে গুণ্ডাদের হাতে তুলে দিয়ে এসো।'

মিয়াঁ তার বিছানা থেকে উঠল। কাচের একটা ড্রয়ার খুলে পিস্তল বার করল। পিস্তল নিয়ে সে দরজার দিকে এগিয়ে আসতেই আমি তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় চলে এলাম। শোবার ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম আমি। বুক টিপটিপ করতে লাগল। মনে হতে লাগল, মিয়াঁ যেন পিস্তল নিয়ে আমাকে মারার জন্যে শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ শোনা গেলো। পায়ের শব্দ আমার ঘরের দরজার কাছে এসে থামল। আমার গলায় যেন দম আটকে যেতে লাগল।

মিয়াঁ হাতল ঘুরিয়ে দরজা খোলার বদলে চাবি লাগিয়ে তালা বন্ধ করে দিলো। ঘরের মধ্যে অন্ধকার। আলো জ্বালাতে ইচ্ছে করছিল না আমার। আমি বিছানা থেকে আস্তে আস্তে উঠে খুব সাবধানে দরজার কাছে গেলাম। পর্দার পেছন থেকে হাতল ঘুরিয়ে দেখলাম, হাতল নড়ছে না। মিয়াঁ বাইরে থেকে দরজায় তালা দিয়ে দিয়েছে।

এমন সময় মিয়াঁ বাইরে সিগারেট ধরালো। সিগারেটের আলোয় দেখলাম, তার চেহারা হলদে বিবর্ণ। হাতে পিস্তলটা কাঁপছে।

মনে মনে ভাবলাম, বদমায়েশটা আমাকে ভেতরে বন্ধ করে রেখে নিজে

বাইরে গুণ্ডাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

সারা রাত্রি সে ঘরের বাইরে পিস্তল হাতে পায়চারি করতে থাকল। একবারও চোখ বোজেনি। সারা রাত্রি আমিও জেগে কাটালাম। চোখে ঘুম আসবে কি করে! যখন ভোরের আলো ফুটল চারদিকে, তখন সে চাবি ঘুরিয়ে আস্তে আস্তে দরজা খুললো। আমি বিছানায় নিঃসাড় হয়ে রইলাম। আমাকে ঝাঁকানি দিয়ে জাগালো সে।

'ওঠো। চলো।'

'কোথায়?'

'চলো না। বলছি পরে।'

'একটু দাঁড়াও। মুখ-হাতটা তো ধুয়ে নিই।'

'দরকার নেই। দেরী হয়ে যাবে। শীগগির চলো।'

আমি রাতের পোশাক ছেড়ে অন্য কাপড় পরে নিলাম। তারপর মিয়াঁর সঙ্গে চললাম। তার হাতে তখনো পিস্তল।

দুজনে নীচে নামলাম। বৌদিকে আদাব করলাম আমি। কিন্তু সে আমার আদাবের জবাব দিলো না। তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে চেয়ে দেখল সে।

বাড়ির বাইরে দরজার কাছে মিয়াঁর হাডসন দাঁড়িয়ে। দুপাশেরই কাঁচ ভাঙা। দুজনে গাড়িতে উঠে বসলাম। রাস্তায় কোনো কথা হলো না। মিয়াঁর মুখ কঠিন, থমথমে। তার মুখের দিকে চেয়ে আমার কথা বলারও সাহস হলো না।

মিয়াঁ সোজা স্টেশনে গাড়ি নিয়ে চলল।

'কোথায় যাচ্ছো?'

'লাহোর রেলস্টেশন।'

'কিন্তু আমি স্টেশনে গিয়ে কি করব! আমি তো এই বিপদের সময় তোমার কাছেই থাকতে এসেছিলাম।

'মুশকিল হলো, আমি তোমায় রাখতে পারছি নে।'

গাড়ি স্টেশনের চত্বরে এসে থামল। মিয়াঁ আমাকে তাড়াতাড়ি ভেতরে নিয়ে গেলো। তিনশো টাকা দিলো আমাকে। তারপর বলল, 'তুমি ফার্স্ট ক্লাশ ওয়েটিং রুমে গিয়ে বসো। আর, কোথায় যেতে চাও বলো। আমি টিকেট এনে দিচ্ছি।'

আমি চীৎকার করে বললাম, 'কোথাও যাবো না আমি। লাহোর আমার দেশ। আমি লাহোরেই থাকব।'

'তুমি থাকতে পারবে না। তোমার মা বাবা ভাই বোন স্ত্রী ছেলেমেয়ে যেখানে আছে, সেখানেই যাও।'

আমার কণ্ঠ অবরুদ্ধ হয়ে এলো। বললাম, 'আমার এই লাহোরেই সবকিছু। মিয়াঁ, তুমি তো জানো, লাহোর ছেড়ে আমি বেঁচে থাকতে পারব না। লাহোর

আমার পাগল করে রেখেছে।'

'পাগল তো সারা সংসারটাই করে রেখেছে।' মিয়াঁর মুখে একটা শুকনো হাসি খেলে গেলো।

দেখে আমি আগুনের মতো দপ করে জ্বলে উঠলাম। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললাম, 'শেষ পর্যন্ত তুমি এমন নীচ বর্বর হয়ে উঠবে, আমার জানা ছিল না। রাতে আমি বৌদিকে বলতে শুনেছি, বীজনাথকে গুণ্ডাদের হাতে তুলে দাও। তোমরা এমন গোঁড়া......।'

মিয়াঁ হতাশায় মাথা নীচু করে বলল. 'যদি রাতে আমি তোমায় গুণ্ডাদের হাতে লে দিতাম, তাহলে অন্তত একটা আহাম্মকের হাত থেকে বাঁচতাম।'

'কি বলতে চাইছ তুমি?'

'তোমার জানা নেই, রাতে হাজি এখান থেকে গিয়ে আমার বাড়িতে গুণ্ডা পাঠিয়ে দিয়েছিল। ওরা এসে অনেকক্ষণ আমার দরজায় ধাক্কাধাক্কি করেছে। ওরা গোঁ ধরে ছিল, ওদের হাতে তোমায় ছেড়ে দিতে হবে।'

'তুমি পিস্তল চালালেই পারতে?'

'ওদের কাছেও পিস্তল ছিল। তাছাড়া আমি একা, ওরা প্রায় বিশজন।'

'তারপর?'

'আমি একটা ফন্দি খাটালাম। ওদেরকে বললাম, কাল সকালে পণ্ডিতকে তোমাদের হাতে তুলে দেবো। জ্যান্ত অথবা মরা।'

'ওরা মেনে নিলো?'

'হ্যাঁ। কিন্তু যাওয়ার সময় আমার ছেলে দুটোকে সঙ্গে নিয়ে গেছে।'

আমি চীৎকার করে উঠলাম, 'তারিক আর তসনিম?'

'হ্যাঁ। জামিন হিসেবে নিয়ে গেছে ওদের। হয়তো এই ভেবে যে সকালবেলা যদি আমি ওদের হাতে তোমাকে তুলে না দিই......'

'না না।' আমি চীৎকার করে উঠলাম। মিয়াঁর পা জড়িয়ে ধরে আমি বললাম, 'আমাকে নিয়ে চলো। গুণ্ডাদের হাতেই তুলে দাও আমাকে।'

মিয়াঁর ঠোঁট কাঁপছিল। মনে হচ্ছিল, সে যেন এখনি কেঁদে ফেলবে। বেশ কিছুসময় চুপ করে রইল সে। তারপর হঠাৎ পা ছাড়িয়ে নিয়ে সে দৌড়ে স্টেশনের বাইরে গিয়ে দ্রুতবেগে হাডসন চালিয়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেলো। আমি অনেকক্ষণ তার পেছনে পেছনে ছুটলাম। কিন্তু চোখের সামনে থেকে সে অদৃশ্য হয়ে গেলে আমি স্টেশনের ভেতরে ফিরে এলাম। এক জায়গায় পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। যদি যাই আমি, তবে কোথায় যাবো? আত্মসমর্পণ করি যদি, তবে কার কাছে করব? এইসব ভেবে ভেবে শেষ পর্যন্ত এক নির্বোধের মতো নিজেকে বোঝালাম, গুণ্ডারা মিয়াঁর ছেলে-পিলের সঙ্গে নিশ্চয়ই তেমন কিছু করবে না। অন্তত এমন অত্যাচার করবে না, যাতে একজন হিন্দুর প্রাণের বদলে দুটি নিষ্পাপ মুসলমান শিশুর প্রাণ নষ্ট হয়।

অবশ্যি পাশবিকতায় সবই সম্ভব, কিন্তু……

আমি এইসব ভাবতে ভাবতে ফার্স্ট ক্লাসের ক্যান্টিনের দিকে ফিরতেই সেদিক থেকে একটা লোক এলো। আমাকে দেখেই সে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'আরে পণ্ডিতজী! তুমি কোত্থেকে?'

দেখলাম, শাহিদ। শাহিদ লাহোর স্টেশনের টি.টি.। আমার পুরনো বন্ধু। আমাকে চিনতে পেরেই শাহিদের চোখ দুটো আনন্দে চকচক করছে। কিন্তু আমি এই অবস্থায় আমার নিজের নাম শুনে চমকে উঠেছিলাম।

এখন যা অবস্থা, তাতে কোনো হিন্দুর নাম উচ্চারণ করা মানেই তার মৃত্যুকে ডেকে আনা। আমি ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে বললাম, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কেউ শোনেনি।'

শাহিদ লজ্জিত হয়ে বলল, 'সরি! আমার খেয়াল ছিল না দোস্ত।'

সে আমার কাছে বারবার ক্ষমা চাইল। আমাকে নিজের কেবিনে নিয়ে গেলো। চা খাওয়ালো। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'এখন কোথায় যাবে তুমি?'

'আমি তো নিজের বাড়িই এসেছিলাম। কিন্তু এসে দেখলাম, সবাই পালিয়ে গেছে এখান থেকে। এক বন্ধুর বাড়িতে উঠেছিলাম। আমার জন্যে সে বেচারাও খুব বিপদে পড়েছে। এখন ভাবছি, গাঁয়েই ফিরে যাবো। হয়তো আমার স্ত্রী ছেলেপিলে সেখানেই আছে।'

'তোমার গাঁয়ের নাম?'

'কোটলি সওদকা।'

'কোথায়?'

'শক্করগড় তহসিলে। জেলা গুরুদাসপুর।'

'তাহলে তুমি নারোয়াল হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আমি তোমার টিকেট এনে দিচ্ছি। একটু পরেই গাড়ি।' ঘড়ি দেখল সে। তারপর টিকেট আনতে গেলো।

গাড়ি নারোয়ালের দিকে চলতেই পাঞ্জাবী গানের দুটি কলি হঠাৎ মনে পড়ে গেলো, ঠিক যেমন অন্ধকার রাতে কারোর অশ্রু-ভারাক্রান্ত দুটি চোখ হঠাৎ চমকে ওঠে:

'গুড্ডি আঈ-ই গুড্ডি আঈ-ই/নারোয়াল্ দি—
বুড্ ঢেড়ে দি দাড়ি বচ্/আগ্ বাল্ দি॥'

অকস্মাৎ আমার চোখ থেকে জল ঝরে পড়ল। মনে হলো, পাঞ্জাব যেন এক বৃদ্ধ। সাদা দাড়িওয়ালা এক চাষী। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা তার দাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। পাঞ্জাব জ্বলছে। তার মান-মর্যাদা জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। আর সেই সাদা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ চাষী একান্ত অসহায় কাতর অবস্থায় নিজের চোখের জল মুছছে। আর মাথা নেড়ে নেড়ে ভারাক্রান্ত গলায় বলছে:

'গুড্ডি আঈ-ই গুড্ডি আঈ-ই/নারোয়াল্ দি—
বুড্ ঢেড়ে দি দাড়ি বচ্/আগ্ বাল্ দি॥'

তিন

নারোয়াল ছাড়িয়ে দরবার সাহেবক র্তারপুর স্টেশনে গাড়ি পৌঁছলে আমি গাড়ি থেকে নামলাম। দরবার সাহেব কর্তারপুর স্টেশন থেকে কোটলি সওদকা দেড় মাইল দূর। আমি পায়ে হেঁটে যাত্রা করলাম। আখ-ভরা মাঠ তখন। চারদিকে সবুজ খেত চোখে পড়ছে। ডাঙ্গায় ঝোপঝাড়ে কোথাও গরু-মোষ মাথা নীচু করে বসে আছে, কোথাও-বা ঘাস খাচ্ছে। দূর দিগন্তে ভাসমান মেঘের আড়ালে সূর্যকে নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে। দূরে কোথাও কোনো এক কৃষক গান গাইছে। অন্য সময় হলে চারদিকের এই পরিবেশ আমার কাছে খুব আনন্দদায়ক বলে মনে হতো। কিন্তু আমার কাপড়-চোপড় ময়লা নোংরা। জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া-ফাটা। দাড়ি অনেকটা বড় হয়ে গেছে। আমার চিন্তা-ভাবনা জুড়ে আগুন জ্বলছে যেন। সেজন্যে আমার কিছুই ভালো লাগছে না। শুধু মনে হচ্ছে, শস্য-শ্যামল খেতের প্রত্যেকটি মোড়ে যেন শত্রু লুকিয়ে আছে, দুশ্চিন্তায় গরু-মোষ-গুলোর ঘাড় যেন নুয়ে পড়েছে। চিন্তা ভাবনাহীন কৃষকের গানের সুর আমাকে ব্যথা-বেদনায় আন্দোলিত করছে। আর যখন এক ঝাঁক রাজহাঁস সাদা ডানা মেলে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেলো, তখন হঠাৎ আমার চোখে জল এলো। কোথায় উড়ে যাচ্ছো সাদা ডানার রাজহাঁস, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলো না? কোনো এক অজানা সরোবরের তীরে, লোকালয় থেকে বহুদূরে, যেখানে মন্দ মন্দ পূবালী হাওয়া বয়, তিরতির করে কাঁপতে থাকা ঢেউ পদ্মফুলের পাপড়িতে চুমো খেয়ে যায়, হিমশুভ্র গণ্ডদেশের মতো কমনীয় সুন্দর রাজহাঁসেরা গর্বোদ্ধত গলা তুলে নিজেদের প্রেমিকাদের সঙ্গে জলের ওপর ফুলের মধ্যে ভেসে বেড়ায়। আমাকে সেখানে নিয়ে চলো, যেখাগে শফতালু তার ঝুঁকে পড়া ডাল থেকে জলের ওপর ঝরঝর করে ফুল ঝরায়, পাঁচ রঙের মাছরাঙা সাতরঙের প্রান্তরে রামধনুর রঙ ছড়ায়। আমার প্রাণের বন্ধুরা, আমাকে সেখানে নিয়ে চলো, তোমাদের বাচ্চাদের সঙ্গে আমি খেলব, লম্বা লম্বা জলজ ঘাসে শুয়ে শান্তির পতাকার মতো পতপত করে উড়তে থাকা নলখাগড়ার উঁচু উঁচু সাদা ঝুঁটি ফুলগুলো দেখব, আর কখনো কখনো নলখাগড়ার ঘনছায়ায় শাদাকে যেমন দেখতাম, সেই মধুর স্বপ্ন দেখব। আমাকে এখানে ফেলে যেও না।

হে আমার সঙ্গীরা, আজ মানুষের জগতে গাঢ়তম অন্ধকার, নির্মম পাশবিকতা ও সংকীর্ণতা। কিন্তু অন্ধকার তো আমাকেও স্পর্শ করেছে, সংকীর্ণতায় আমার মনও কালিমালিপ্ত হয়েছে, আর কারোর কারোর ওপর হয়তো আমিই নিশ্চয়ই পাশবিক আচরণ করেছি। কিন্তু এতো অন্ধকার, এতো অত্যাচার, এতো

সংকীর্ণতা আমার সহ্য হচ্ছে না। একজন মানুষ আরেকজন মানুষের পরমায়ুকেও ছেঁটে ফেলবে ?

তোমার ডানায় আমাকে বসিয়ে নিয়ে চলো রাজহাঁস। আমি কতো দিন ঘুমোইনি। আমার সারা শরীর ঘুমে ঢুলে আসছে, অথচ একটু বসার জায়গাও পাচ্ছিনে। আমি তোমার রেশম-কোমল পালকের ওপর শুয়ে ঘুমবো। ঘুমের শীতল কুয়াশায় হারিয়ে যেতে যেতে স্বপ্নের দ্বীপপুঞ্জে পৌছে যাবো।

কিন্তু রাজহাঁসের ঝাঁক একটা বাতাসের তৈরী কাঁচির মতো আমার সমস্ত আশা-আকাঙ্খাকে কাটতে কাটতে দিগন্তে অদৃশ্য হয়ে গেলো। আমি তেমনি মাটিতেই দাঁড়িয়ে রইলাম।

কেন আমি একথা ভাবছিলাম যে রাজহাঁস তার ডানায় বসিয়ে নিয়ে আমায় কোথাও নিয়ে যাবে ? কি করে সেটা সম্ভব ? কিন্তু মানুষ কখনো কখনো এমনি সব অসম্ভব আজগুবি কথাই ভাবে। এবং তা সফল না হলে কেঁদেও ফেলে। আমি চোখের জল মুছে আমার গ্রাম কোটলি সওদকার দিকে যাত্রা করলাম।

কোটলি সওদকা আমার ঠাকুর্দার বাড়ি। সেখানে আমার মা-বাবা ভাই বোন স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। পরস্পরকে দেখতে পেয়ে আমরা সবাই আনন্দে কেঁদে ফেললাম। কারণ ওরা সবাই ভেবে নিয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথ লাহোরে নিশ্চয়ই খুন হয়েছে। আমার ঠাকুর্দা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। রাশভারি সুদর্শন চেহারা। পুরনো আমলের জমিদার। লম্বায় ঝাড়া ছ'ফুট। এক মাথা ধবধবে সাদা চুল। সারা মুখ জুড়ে তেমনি সাদা দাড়ি। ঝাঁকড়া সাদা গোঁফ। দেখলে মনে সম্ভ্রমে জাগে। সারা গাঁয়ে তাঁর দাপট। গাঁয়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় জমিদার। সেজন্যে সবাই তাঁর কথা খুব মেনে চলে। তহসিলদার, থানার দারোগা এবং অন্যান্য অফিসাররা আসেন, চলে যান। কিন্তু গাঁয়ে ঠাকুর্দার শাসন সব সময়েই বজায় থাকে।

আমি ঠাকুর্দাকে এবং অন্যান্য লোকদের লাহোরের সমস্ত হালচাল বললাম। তাদের বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে এখানেও টিঁকে থাকা সম্ভব নয়। এখান থেকেও কাটতে হবে আমাদের। এখনো যে বহাল তবিয়তে রয়েছি এখানে, সেটাই আশ্চর্য। যদি এই মুহূর্তেই কেটে পড়ি, ভালো, নইলে পরে···

কিন্তু ঠাকুর্দার সেই একগুঁয়ে স্বভাব। উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'কি সব কথা বলছিস বীন্দ্রনাথ ? যদি এখানে পাকিস্তান হয়, হোক না। তাতে কি হয়েছে ! আমরা এখানেই থাকব। সাত পুরুষ ধরে যেভাবে কাটিয়ে আসছি, সে ভাবেই কাটাব। এখানকারই যশ গান গাইব।'

আমি বললাম, 'মুশকিলটা হলো এই যে, আপনারা সাত পুরুষ ধরে বেশ আরামেই কাটিয়ে আসছেন আর নিজেদের যশ গান গাইছেন। কিন্তু মুসলমান চাষীরা এতোদিন শুধু অভিযোগই জানিয়ে আসছে, এখন তাদের প্রতিশোধ নেবার পালা।'

ঠাকুর্দা বেশ গর্বের সঙ্গে বললেন, 'আরে মুসলমান চাষীরা তো আমার ছেলের মতো।'

'হ্যাঁ, সেটা শুধু ফসল কাটা পর্যন্ত।' এ-কথা শুনেই ঠাকুর্দা লাঠি তুলে আমাকে মারার জন্যে তেড়ে এলেন। বাবা এবং বড়দা মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে-যাত্রা বাঁচালেন আমাকে। নইলে পুরনো দস্তুর মতো আজকেও ধোলাই দিতেন আমাকে।

পরদিন বিকেলবেলা ঠাকুর্দা দরদালানে একটা আসনে বসে আলবোলায় তামাক খাচ্ছেন। করিম খান তাঁর পা টিপছে। আল্লাহ্‌দাদ তাঁর কোমরে এবং ফজলু তাঁর মাথায় মালিশ করছে। আমি ওদিক দিয়ে যাচ্ছি দেখে তিনি আমায় কাছে ডাকলেন। তারপর ফজলুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রে ফজলু, এখানেও হাঙ্গামা হবে না-কি?'

ফজলু ঠাকুর্দার মাথায় ম্যাসেজ করতে করতে বলল, 'হুজুর, সাত পুরুষ থেকে এ-গাঁয়ে আজ তক তো হাঙ্গামা হয়নি, আর হবেও না…'

'আল্লাহ্‌দাদ, তুই কি বলিস?'

আল্লাহ্‌দাদ ঠাকুর্দার কোমরে মৃদু চপেটাঘাত করতে করতে বলল, 'আমরা তো আপনার ছেলেপিলে হুজুর।'

'করিম খান!'

করিম খান পা টিপতে টিপতে হেসে বলল, 'নির্ভাবনায় থাকুন। যে হাঙ্গামা করবে, তার মুণ্ডু উড়িয়ে দেবো।'

ঠাকুর্দা গর্বের সঙ্গে আমার দিকে তাকালেন। আমি আর কি বলব! কাঁধ ঝাঁকিয়ে ওখান থেকে চলে গেলাম।

আট-দশ দিন বেশ আরামে কাটল। আমার মনের দ্বিধা-সংশয়ও কেটে গেলো প্রায়। আমরা সকালবেলা টাটকা ঘোল খাই, দুপুরে আখ কেটে চুষি বিকেলবেলা কাজকর্ম থেকে যখন একটু ফুরসৎ মেলে, তখন পুকুরের ধারে শহ্‌তুত গাছের ঘন ছায়ায় বসে ঠাকুর্দার চাষীদের সঙ্গে তাস খেলি। আমার সবচেয়ে ছোট ছেলে মুন্না আমার কোলে থাকে। দাপাদাপি করে। কখনো-বা তাস তুলে নিয়ে মুখে পুরে দেয়। তার মুখের লালা ঝরে ঝরে আমার সারা জামা ভিজে একশা হয়। বেশ গোলগাল নধর নধর চেহারা। আমি খুব আদর করি ওকে। যখন ওকে কোলে নিয়ে বসে থাকি, কোলে নিয়ে শহ্‌তুতের ঘন ছায়ায় ঠাকুর্দার চাষীদের সঙ্গে তাস খেলি, তখন আমার জীবনটাকে নীল আকাশে ভেসে যাওয়া হালকা সাদা মেঘের মতো নরম ও স্বচ্ছন্দ বলে মনে হয়।

একুশে আগস্ট। সন্ধ্যেবেলা। উনুনে রুটি সেঁকা হচ্ছে। উঠোনে চারদিকে রুটীর* গন্ধ ভুরভুর করছে। খুঁটিতে বাঁধা বাছুর তার মাকে ডাকছে। যুবতী বউরা ঘাগরা উড়িয়ে নিজের নিজের স্বামীর জন্যে থালায় খাবার নিয়ে যাচ্ছে।

* দই ও বেসনের তৈরী এক রকমের খাবার / সিদ্ধ করার সময় মাত্র একবার উথলে ওঠে।

এমন সময় ঠাকুর্দার চাষীদের কয়েকজন তক্তপোশের কাছে এসে দাঁড়াল। ওর বিচারপ্রার্থীর মতো গলবস্ত্র। লজ্জায় ভয়ে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়েছে।

ঠাকুর্দা খেতে বসেছিলেন। ওদের আসতে দেখে খাবারের থালা সরিয়ে দিয়ে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার ?'

চাষীদের দলে করিম খান, আল্লাহ্ দাদ, ফজলু ও রহমান ছিল। আরো অনেক লোক ছিল, আমি তাদের ভালো করে চিনিনে।

করিম খান গলার গামছা হাতে নিয়ে বলল, 'হুজুর, ওপর থেকে হুকুম এসেছে, লুট করে নাও।'

ঠাকুর্দা বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন, 'ওপরওয়ালা তো ভগবান। ভগবান কি আমাদের সবকিছু লুট করে নিতে বলেছে তোদের ?'

দুএক মুহূর্তের জন্যে ওরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ফজলু মৃদুকণ্ঠে বলল, 'হুজুর, আপনারা এখান থেকে চলে যান।'

ঠাকুর্দা রাগে চীৎকার করে উঠলেন, 'কেন চলে যাব ?'

করিম খান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'হুজুর, ওপর থেকে হুকুম এসেছে, লুটপাট করে নাও। আমরা ওপরওয়ালাদের হুকুম ফেলতে পারব না।'

এ-কথা বলেই করিম খান মাথা নীচু করল। ময়লা গামছার ওপর টপটপ করে তার চোখের জল পড়তে লাগল।

ঠাকুর্দা রেগে বললেন, 'তোমরা যেমন ভীতু, তেমনি বোকা পাঁঠা। গুণ্ডাদের ভয় পাও। আমার কাছে ছ বোরের রিভলবার আছে। একটা থ্রি-নট-থ্রি আছে। দেখছি কোন মায়ের ব্যাটা কোট্‌লি সওদকার জমিদারের ওপর লুট-তরাজ করার সাহস পায়। চলে যা তোরা।'

ওরা চলে গেলে বাবা ও আমি ঠাকুর্দাকে খুব বোঝালাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই মানতে চাইলেন না। কেউ-ই তাঁকে বোঝাতে পারল না যে এখান থেকে এখন আমাদের সবাইকে চলে যেতে হবে।

বাড়িতেই দুটো দল হয়ে গেলো। একদল বলল, চলে যাওয়াই উচিত। অন্যরা ঠাকুর্দার পক্ষে। তারা বলল, এইসব খুন-খারাবি ঝগড়া-বিবাদ কয়েক-দিনের ব্যাপার। চলে গিয়ে এর চেয়ে বেশী সুখ-শান্তি আর কোথায় পাওয়া যাবে! দুজন খুড়ো আয়ারাম ও তায়ারাম ঠাকুর্দার পক্ষে। কিন্তু আমি, আমার দাদা ও বাবা চলে যাওয়ার পক্ষপাতী। আর পুরুষরা যে-পক্ষে, তাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরাও সেই পক্ষে।

কিন্তু সকাল হতে না-হতেই আক্রমণ হলো। তখনো আমাদের ভালো করে ঘুম ভাঙেনি। ছেলেপিলেরা তো ঘুমিয়েই ছিল। আমি নিজেও বেশ রাত করে ঘুমিয়েছিলাম, সেজন্যে যখন গলিতে ঢোল বাজতে শুরু হলো, হামলাকারীদের গোলমাল সোচ্চার হয়ে উঠল এবং ছেলেপিলেরা চীৎকার করে কাঁদতে লাগল, তখন আমি ধড়মড়িয়ে উঠলাম। একটা লুঙ্গি আর ফতুয়া পরে শুয়েছিলাম, ভয়

পেয়ে সেই পোশাকেই আমি দরজা দিয়ে ঘর থেকে বাইরে লাফ দিলাম। আমার ঘরের দরজার বাইরেই আখের খেত। ঘর থেকে বাইরে লাফ দিয়ে প্রথমে আখের খেতে ঢুকে পড়লাম, তারপর দৌড়তে শুরু করলাম। আখের তীক্ষ্ণ ধারালো পাতায় আমার কাপড়-চোপড় এখানে ওখানে ফেঁসে গেলো। হাত-পায়েরও কোথাও রক্ত বেরোলো, কোথাও কোথাও আঁচড় লেগে রক্ত জমা হলো। তারপর ঢোলের শব্দ, হট্টগোল ও চেঁচামেচি যখন অনেক পেছনে ছাড়িয়ে এলাম, তখন একসময় থামলাম। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছিল আমার। ভীত চোখে এদিক-ওদিক তাকালাম। এখানে কেউ-ই নেই। চারদিকে শুধু আখ আর আখ! বহুদূরে গোলমালের শব্দও ক্রমশ ঢিমে হয়ে আসছে। আধ ঘণ্টা পৌণে এক ঘণ্টার পর চারদিক স্তব্ধ হয়ে গেলো। ঢোলের শব্দ, ছুটোছুটি পায়ের আওয়াজ, 'আল্লাহো আকবর' ধ্বনিতে মিশে যাওয়া আর্ত-চীৎকার, সব নীরব হয়ে এলো। এখন আমার চারদিকে এক গভীর স্তব্ধতা। আমি খেতের মধ্যেই বসে পড়লাম।

দুদিন দুরাত এভাবে কেটে গেলো। তৃতীয় দিনে বিকেলবেলা পর্যন্ত আমি সেখানেই লুকিয়ে ছিলাম। ভয়ে চুপ করে বসেছিলাম যাতে এতোটুকু নড়া-চড়ার শব্দ পর্যন্ত না হয়, কারণ জানতে পারলেই ওরা আমাকে এখান থেকে টেনে বার করে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলবে। দ্বিতীয় রাতে জোর বৃষ্টি হয়েছিল। খেতের আবর্জনায় আমার সারা শরীর নোংরা হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তাতে একটা ভালো কাজ হলো। আমার খুব তেষ্টা লেগে ছিল। বৃষ্টি-ভেজা পাতাগুলো চেটে চেটে এবং আখ গাছে জমে থাকা জল খেয়ে তেষ্টা মিটল। তেষ্টা তো মিটল, কিন্তু খিদেটা চাগিয়ে উঠল। তৃতীয় দিন বিকেল হতেই এতো জোর খিদে পেলো যে, খিদের চোটে ভয়-ডর ভুলে গেলাম আমি। খিদেয় অস্থির হয়ে খেত থেকে বেরিয়ে পড়লাম। হাঁটতে হাঁটতে ঠাকুর্দার ঘরের দরজায় গিয়ে পৌঁছলাম।

ঠাকুর্দা চাতালে মরে পড়ে ছিলেন। তাঁর শরীরটা ফুলে উঠেছে। একটা হাত চাতালের বাইরে, অন্যটা ভেতরে। চাতালের বাইরে আমাদের বাড়ির কুকুর রূমী কান লটকে ঠাকুর্দার লাশের কাছে বসে ছিল। ঠাকুর্দার লাশ টপকে আমি বাড়ির ভেতরে গেলাম।

উঠোনে গিয়ে সবার আগে কল থেকে জল খেলাম। জল খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে রান্নাঘরে গেলাম। খাবার-দাবার খুঁজতে লাগলাম। খুঁজতে খুঁজতে একটা চাঙারিতে ময়লা কাপড়ে জড়ানো কিছু রুটি পেয়ে গেলাম। বেশ কিছু মাখনও জুটে গেলো। একটা ছোট ভাঁড়ে কিছু গুড় ছিল, তা-ও নিলাম। রুটি খেতে খেতে রান্নাঘরের বাইরে এলাম। উঠোনে দাঁড়িয়ে চারদিক চেয়ে চেয়ে দেখলাম। পশ্চিমদিকের দেওয়াল-সংলগ্ন চৌকির চাদরটা সরে গেছে। চৌকির ওপর কিছুটা রয়েছে, কিছুটা নীচে ঝুলছে। চৌকিতে ঠাকুর্দার রক্তের ছিটে। হুঁকো

থেকে সটকা খুলে মাটিতে পড়ে গেছে। কাছেই দুটো খাটিয়া শূন্য। শূন্য পিঁড়িগুলোও। চোখ সরিয়ে নিলাম ওখান থেকে। দক্ষিণ দিকের দেওয়ালের দিকে তাকালাম। লাউয়ের গাছে কচি কচি লাউ ঝুলছে। কোণের দিকে সেই রকমই উনুন। উনুনের কাছে চিমটে।

আমার নজর গেলো পূর্বদিকের দেয়ালে। দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা একটি খাট। খাট থেকে ঝুলছে ইজেরের ফিতে তৈরী করার জন্যে রেশমী ডোরের গোছা। হঠাৎ চোখের সামনে আমার ছোট ভাইয়ের বউ আশার চেহারা ভেসে উঠল। গায়ের রঙ ময়লা। লাজুক স্বভাব। কপালে টিপ। নাকে সোনার ঝকঝকে নাকফুল। পাতলা পাতলা ঠোঁট। মেহেদি রঙে ছোপানো আঙুলে রঙীন রেশমী ডোরের ফিতে বুনতে বুনতে প্রাত্যহিক জীবনের স্বপ্ন রচনা করত। এখন সেই মেহেদি রঙে ছোপানো আঙুলগুলো কোথায়? এই বাড়ির দেয়ালে ঝুলতে থাকা রেশমী ছবি হয়তো আর কোনো দিনই সম্পূর্ণ হবে না। হঠাৎ বাড়িটা যেন গমগম করে উঠল। আমার চারপাশে কতো পুরনো শব্দ, পুরনো গন্ধ, আর চিরপরিচিত কতো মুখ। এক মুহূর্তের জন্যে ঠিক যেন মনে হলো, এই আমার মা আটা মাখছে, আমার বউ আটার লেচি কাটছে, আমার ছেলে মুন্না আটা দিয়ে গরু-ছাগল তৈরী করছে। ঠাকুর্দা চৌকিতে বসে বসে হুঁকো টানছেন। পূর্বদিকের দেয়াল ঘেঁষে আমার ভাইয়ের বউ রেশমী ডোর দিয়ে ইজেরের ফিতে তৈরী করছে আর গুনগুন করে গাইছে—

'গুড্‌ডি আঙ্গ-ই গুড্‌ডি আঙ্গ-ই সিপাহীওয়ালী—
উন্‌হি টিকট্‌ না দেঁ বাবু
সাহড্ডি রাত জুদাঈ ওয়ালী ॥'

তখনি মনে হলো সেখানে কিছুই নেই। চৌকি রক্তের কালো কালো ছোপে ভর্তি। সটকা নীচে পড়ে রয়েছে। খাটিয়া শূন্য। দেয়ালে হেলান দেওয়া খাট। তাতে রেশমী ডোরের অসম্পূর্ণ ফিতে।

রুটি খেতে খেতেই আমি এসব ভাবছিলাম আর দেখছিলাম। এমন সময় দেখি, রুমী আমার পায়ের কাছে এসে আমাকে আশ্চর্য ও অস্থির চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছে। রুমীর বাচ্চা হবে। তার পেট মোটা হয়ে ঝুলে পড়েছে। কয়েক-দিনের মধ্যেই—পনেরো-বিশ দিন কিংবা বড় জোর মাস খানেক পরেই বাচ্চা দেবে সে। ঠাকুর্দা তাকে কতো আদর করতেন। এ-বেচারাও তো তিন দিন থেকে না খেয়ে রয়েছে। ঠিক আমারই মতো। এক টুকরো রুটি ছিঁড়ে রুমীর সামনে ফেলে দিলাম। কিন্তু খেলো না। আরেক টুকরো দিলাম। সেটাও সে শুঁকেই রেখে দিলো। না খাবি, না খা। খিদেয় মর। দুটো টুকরোই কুড়িয়ে নিলাম আমি। জামার আস্তিনে ঝেড়ে অন্য রুটির সঙ্গে ময়লা কাপড়টায় জড়িয়ে রেখে দিলাম। কে জানে কদ্দিন না-খেয়ে কাটাতে হবে।

রুটি খেয়ে আবার জল খেলাম। তারপর উঠোন থেকে বাড়ির চাতালে

এলাম। ঠাকুর্দার লাশ টপকে আস্তে আস্তে খেতের ধারে ধারে হাঁটতে লাগলাম। হঠাৎ যেন কার পায়ের শব্দ কানে এলো। ভয় পেয়ে পেছন ফিরে দেখলাম, রুমীও আমার পেছনে পেছনে আসছে।

তুই কোথায় যাবি রুমী? তোর পেটে তো বাচ্চা রয়েছে। কুকুর তুই। তোর তো কোনো ভয় নেই। তুই কি আর মানুষ যে তোর প্রাণের ভয় থাকবে! এসব তো সভ্যতার ব্যাপার-স্যাপার। উন্নত সভ্যতা ও রীতিনীতির ঝগড়া। প্রচণ্ড রক্ষণশীলতা থেকে এই তরবারি নিষ্কাসিত হয়েছে। এই তরবারি দিয়ে তোর গলা কাটা যাবে না, সেজন্যে তুই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যে তুই অসভ্য, অভদ্র, মূর্খ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যে তুই জানিসনে ধর্ম কি, কখনো পূজো-পার্বণ করিসনি, কখনো পাঁচ অক্ত নামাজ পড়িসনি। কখনো তুই গীর্জা, মন্দির, মসজিদেও যাসনি। তুই কখনো স্বাধীনতার মূল্য বুঝিসনি, কখনো রাজনৈতিক নেতার বক্তৃতা শুনিসনি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যে তুই একটা কুকুর, মানুষ নোস্।

পালিয়ে যা। আমার পেছনে পেছনে আসিস নে। কারণ আমি একজন মানুষ, নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে অন্য মানুষের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। যা, চলে যা। নিজের গ্রামে ফিরে যা, যেখানে আমি থাকতাম, তুই থাকতিস, যেখানে আমার জন্ম হয়েছিল, তোরও জন্ম হয়েছিল। সেখান থেকে আমাকে বার করে দিয়েছে, কিন্তু তোর গায়ে কেউ হাত দেবে না। কারণ তুই একটা কুকুর, মানুষ নোস্।

সেই বাড়িতেই ফিরে যা। ও বাড়ি কি চিরদিন ওইরকমই জনপ্রাণীহীন ও ধ্বংসস্তূপ হয়ে থাকবে? কেউ না কেউ আবার সেই আলবোলার সটকা তুলে নেবে, জামার ঝুলে ঝেড়ে-মুছে নিয়ে মুখে লাগাবে। আলবোলায় টাটকা জল ভরবে, ছিলিমে নতুন তামাক পুরে তার ওপর আঙার চাপাবে। তারপর চৌকিতে বসে বসে ধূমপান করবে কেউ। সেই রেশমী ডোরগুলোতে আবার কোনো লাজুক সরল বউয়ের মেহেদি-রাঙা আঙুলগুলো খেলা করবে। এটাও আশা করা যায়। বাড়িটা আবার গমগম করে উঠবে। উনুনে আগুন গনগন করবে, চাঙারি-ভর্তি গরম রুটির মিঠে মিঠে গন্ধ ছড়াবে, লাউগাছের সবুজ লতায় ঢাকা উঠোন কুমারী মেয়েদের গানে মুখর হবে। আর কোনো রূপবতী পুণ্যবতী কলকল করে গাইতে গাইতে খিলখিল হাসিতে ভেঙে পড়বে—

কেক্ এক্ লীরদি
পেগ্ মেরে বীরদি
দোপাট্টা মেরে ভাঙ্গদা
কাটে মুঁহ্ জো আঙ্গদা॥'

হ্যাঁ, আবার নতুন জীবনের স্রোত বইবে, সমস্ত অত্যাচার-নিপীড়ন ধুয়ে-মুছে দেবে। সেজন্যে তুই ফিরে যা রুমী।

কিন্তু ন্নমী ফিরে গেলো না। ও আমার পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগল। নীচু করে, কান লটকে। নির্বোধ আহাম্মুক কোথাকার !

চার

এখানে আমার বিপদের কথাটা আপনাদের বুঝিয়ে বলা দরকার। আমাদের গ্রাম কোটলি সওদকা রেলওয়ে স্টেশন দরবার সাহেব কর্তারপুরের দেড় মাইল এদিকে। ওদিকের বসতি কঞ্জ্‌রোডের দূরত্ব আড়াই মাইল। মাঝখানে রেল-লাইন। সেটা নারোয়ালের দিকে চলে গেছে। আমি তো নারোয়াল হয়ে এসেছি। সেদিকে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই আর। বাঁচার পথ একটাই, কোনোরকমে যদি গুরুদ্বার কর্তার সাহেব পৌঁছে যেতে পারি, সেখান থেকে বরেত। বরেত হয়ে রাবী নদীর তীরে পৌঁছে যাব। ওপারে ডেরা বাবা নানক গ্রাম। মাঝখানে সাঁকো। সাঁকোটা পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের সীমান্তকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

আমি যে-কথা ভাবছিলাম, ঠিক সে সময় কঞ্জ্‌রোড ও কঞ্জ্‌রোডের গ্রামাঞ্চল থেকে আগত হিন্দু যাত্রী-দলও সেকথাই ভাবছিল। ওরাও দরবার সাহেব কর্তারপুর স্টেশন অতিক্রম করে সড়ক ধরে আসছিল। ডেরা বাবা নানকের সাঁকোর দিকে।

দলটিতে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ হাজার লোক রয়েছে।

আমি একা। তাতে আবার আমি একটা ভীতু হাবাগোবা লোক। জীবনে কখনো মারপিট করিনি, কারোর সঙ্গে সেরকম কোনো ঝগড়া-বিবাদ করিনি। দুঃখকষ্টও পোয়াতে হয়নি সেরকম। বেশ আরাম-আয়েশেই জীবনটা কেটে যাচ্ছিল। তাই কারোর প্রতি খুব ঘেন্না-পিত্তি করার সুযোগ হয়নি। আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা আমার মন থেকে উচ্চ-নীচ, জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের পার্থক্য সব একাকার করে দিয়েছে। ওসব ব্যাপার আমার একটুও ভালো লাগে না। ওসব থেকে যেন বাসি দইয়ের একটা টক গন্ধ নাকে আসে। ইচ্ছে করে, যেখান থেকেই হোক, ওসব বস্তু পাওয়া গেলেই সঙ্গে সঙ্গে তুলে পূতিগন্ধময় নর্দমায় ভাসিয়ে দিই। আমার বন্ধুদের মধ্যে হিন্দু, শিখ, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদী, ইংরেজ—সব ধরনেরই লোক ছিল। একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া হতো। বিজনেস্‌-ম্যানদের সাধারণত যা হয়ে থাকে। আমি তাদের সঙ্গে যেমন ভালো ব্যবহার করতাম, তারাও আমার সঙ্গে কখনো খারাপ ব্যবহার করেনি। আমার জন্যে তাদের কখনো দুঃখ পোয়াতে হয়নি, আমার মনেও কখনো আঘাত দেয়নি তারা। নিশ্চিন্ত নির্ভাবনা খোলামেলা মেজাজ আমার, মোটামুটি সচ্ছল অবস্থা, ওসব জাতপাতের কথা আমার ভাববার ফুরসত কোথায় ! আর এখন তো ওসব কথা ভাববার প্রশ্নই ওঠে না। কেননা, এখন আমি একা, জঙ্গলের এক

নখদন্তহীন জন্তুর মতো নিজের প্রাণটুকু বাঁচাবার কথাই ভাবছি শুধু। নিজেকে নিজেরই বেজায় অপটু মনে হচ্ছে। আরণ্যক জীবনযাপনের অভ্যাস তো কয়েক হাজার বছর আগেই কেটে গেছে। নিজেদের সভ্যতার পেতল-গিল্টি কখনো যাচাই করিনি। আজ ঘটনাচক্রে দুর্বিপাকে, ইতিহাসের নির্মম রথচক্রে সেটা বেরিয়ে পড়েছে। ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে অরণ্য। তাই দেখে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি আমি। লোকালয়ে মানুষ হয়েছি, মানবসভ্যতাকে অনড় অবিনশ্বর বলে ভেবে এসেছি। মানবসভ্যতার বড়াই করা মানুষ আমি, আজ ভাবছি, এই জঙ্গলে কি করে থাকব! কে জানে কতোদিন কতো মাস কাটাতে হবে এখানে। আখের খেতকে শত্রুর ঘাঁটি বলে মনে হচ্ছে। প্রত্যেকটি ঢিবির আড়ালে, প্রত্যেকটি খানাখন্দে মৃত্যু যেন ওত পেতে আছে। রেলস্টেশনটাও যেন এক নেকড়ের মতো অপেক্ষা করছে। এই রেললাইনকে আমার সর্বদা বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা ও নিরাপত্তার নিদর্শন বলে মনে হতো। হাঁটতে হাঁটতে পথ হারিয়ে ফেললাম আমি। আখ-খেতের ভেতরে ভেতরে গুরুদ্বার কর্তার সাহেবের দিকে না গিয়ে দরবার সাহেব কর্তারপুর স্টেশনের দিকে এসে পৌঁছলাম। আখের ঝোপের আড়াল থেকে দেখলাম, ঢিবিটার পেছনে কুলের ঝোপঝাড়ে আর আখের খেতে, ঠিক আমার সামনে অনেক মুসলমান দাঁড়িয়ে আছে। থমথমে মুখ। ঢাটা-বাঁধা দাড়ি। হাতে বল্লম, ছুরি, কুড়ুল আর বন্দুক। আখের খেতের ওপারে রেললাইনের অন্যপাশে কঞ্জ্ রোডের দিক থেকে সড়ক ধরে আসছে হিন্দুদের একটা দল, সেদিকে চেয়ে আছে ওরা। আমাকে দেখতে পাচ্ছে না। কারণ ওরা আমার দিকে পেছন ফিরে। ওদের পেছনে আমি আখের খেতের আড়ালে। কিন্তু আমি ওদের পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। ওরা বল্লম বাগিয়ে শিকারীদের মতো দক্ষতা ও সতর্কতার সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে, ওদের দেখে হঠাৎ আমার মনে হলো, আমি মানুষ নই, যেন একটা খরগোশ, একটা শেয়াল অথবা খেঁকশেয়াল। চারদিকে এক অন্ধকার ঘন জঙ্গল, সবুজ সবুজ পাতার আড়ালে নিষ্করুণ রক্তচক্ষু, লম্বা লম্বা ছুরির মতো ধারালো নখ যেন আমার গায়ের মাংসে বসে যাওয়ার জন্যে নিশপিশ করছে।

জীবনে এই প্রথম আমার এক আশ্চর্য অনুভূতি হলো। আমি ভাবতে লাগলাম। যদিও মৃত্যু সামনে অপেক্ষা করছে, তবু ভাবতে লাগলাম। কখনো কখনো মন দুই দুই তিন তিন প্রভৃতি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ কাজ করতে থাকে। আমি খেতের মধ্যে আত্মগোপন করে রয়েছি। আমার সামনে আখের খেতে, কুল গাছের আড়ালে, লাইনের ওপারে ঝোপঝাড়ে হামলাকারীরা তৈরি হয়ে ওত পেতে দাঁড়িয়ে আছে। দূরে সড়ক দিয়ে দলটা চলে আসছে। আবালবৃদ্ধবনিতা, হিন্দু, শিখ, খত্‌রী, ব্রাহ্মণ, চামার, মেথর, রাজপুত, তেলী, জমিদার, মহাজন, সবাই আসছে। অন্য সময় এরা নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া-ঝাঁটি করে, একজন অন্যজনের সঙ্গে বেইমানি করে, একজন অন্যজনের সর্বনাশ করে, একজন

অন্যজনের গলা কাটে। কিন্তু আজ সবাই একসঙ্গে মাথা হেঁট করে পালাচ্ছে। আমার মনে পড়ল, জঙ্গলে যখন দারুণ কোনো বিপদ আসে, বন্যা, ঝড়বৃষ্টি কিংবা আগুন, তখন জঙ্গলের সমস্ত জন্তু-জানোয়ার—হরিণ, সিংহ, ভালুক, হাতি চিতাবাঘ, নীলগাই, সাপ, শেয়াল—সব একসঙ্গে পালাতে থাকে। জঙ্গলের সেই জন্তু-জানোয়ারের মতোই······সড়কটাকেও এখন আমার জঙ্গলের একটা রাস্তা বলে মনে হচ্ছে। সেই রাস্তায় হাজার হাজার জন্তু-জানোয়ারের পাল ভীত-বিহ্বল হয়ে দ্রুতবেগে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে দৌড়চ্ছে।

যখন আর মাত্র তিন-চতুর্থাংশ রাস্তা বাকী, তখন মুসলমান হামলাকারীদের দলপতি একটা সংকেত করল। সংকেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা উচ্চস্বরে 'আল্লা হো আকবর' বলে চীৎকার করতে করতে ছুরি বল্লম কুড়ুল তরোয়াল লাঠি নিয়ে দলটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দলের মধ্যে একটা ছুটোপাটি শুরু হলো। যে যেদিকে পারল, প্রাণ নিয়ে দৌড়ল। বাধা-বিপত্তির মুখে কারই বা হুঁশ থাকে! এরকম সম্ভাবনা তাদের মন থেকে ঘুচেই গিয়েছিল। জোট বেঁধে একটাই আশা নিয়ে তারা হাঁটছিল, কোনোরকমে যদি রাবী নদীর সাঁকো পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে! নইলে এমনিতে দেখতে গেলে অনেক আগেই মরে গিয়েছিল সবাই। সেজন্যে হাজার হাজার লোক আধ ঘণ্টার মধ্যেই মুলো-গাজরের মতো কেটে টুকরো টুকরো হলো। আর নিজেদের কাজ সেরে হামলাকারীরা অন্যদিকে যাত্রা করল।

ভাবলাম, দলের সঙ্গে যাওয়াটা আরো বোকামি। একা থাকলে প্রাণ বাঁচলেও বাঁচতে পারে কোনোরকমে। নইলে মৃত্যু সুনিশ্চিত।

এই ভেবে আমি কোনো দলে ভিড়ে যাওয়ার চিন্তা ছেড়ে দিলাম এবং সন্ধ্যে পর্যন্ত ওখানেই আখ-খেতের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে রইলাম।

সারাক্ষণ দারুণ তেষ্টায় কাটলো। গলায় যেন কাঁটা ফুটছে। এখন তো আর ঢোঁক গিলতেও পারছিনে। তালু শুকিয়ে খসখসে হয়ে উঠেছে। এক সময় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে এলো। ভয় পেয়ে আমি দরবার সাহেব কর্তারপুর স্টেশনে যাওয়াই ঠিক করলাম। ওখানে অবশ্যিই জল মিলবে। একবার জল তো খেয়ে নিই, তারপর কপালে থাকলে মরতে তো হবেই।

এই ভেবে আখের খেত থেকে বেরোলাম। রেললাইনের ধারে ধারে নয়ান জুলিতে লুকিয়ে লুকিয়ে দরবার সাহেব কর্তারপুর স্টেশনে গিয়ে পৌঁছলাম।

আজ স্টেশন অন্ধকার। দরজায় টিকেটবাবু নেই। প্লাটফর্মে বাতি জ্বলছে না। স্টেশন-মাস্টারের ঘরে স্টেশন-মাস্টার মরে পড়ে রয়েছে। বাইরে প্লাটফর্মের চারদিকে শিখ ও হিন্দুর লাশ বীভৎস অবস্থায় ছড়িয়ে আছে। বিমর্ষ চোখে এইসব দৃশ্য দেখতে দেখতে আমি সোজা হিন্দু-জলের দিকে গেলাম। আকণ্ঠ জল খেলাম। কিন্তু ঠিক চোরের মতো হাঁটছিলাম আমি। যেন এতোটুকু পায়ের শব্দ না হয়। জল খেয়ে চাঙ্গা হয়ে চারদিকে ভালো করে তাকালাম।

কোথাও জনপ্রাণী নেই। চারপাশে শুধু লাশ আর লাশ।

হঠাৎ প্লাটফর্মের পশ্চিম মুড়োয় একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তিকে নড়াচড়া করতে দেখলাম। ছায়ামূর্তিটা দেখেই হিন্দু-জলের বড় জালাটার পেছনে লুকিয়ে পড়লাম আমি।

হিন্দু-জলের সামনেই মুসলিম-জলের কালো জালা। সেটার সামনে কয়েক গজ দূরে স্টেশনের ছাদ থেকে ঝুলছে পেতলের ঘণ্টা। তার কাছেই সেই অস্পষ্ট ছায়াটা কি যেন খুঁজছে। লাশগুলোর ওপর তাকে ঝুঁকে পড়তে দেখা যাচ্ছে, কিছুক্ষণ পর আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে। এখন আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি। একটা বুড়ো থুত্থুড়ে লোক। সাদা দাড়ি। হাড়-জিরজিরে দুর্বল চেহারা। তার এক হাতে স্টেশনের লাল-সবুজ আলোর লণ্ঠন। লাশগুলোর মধ্যে ঘুরে ঘুরে সে যেন কিছু খুঁজছে ভাবলাম, বেচারা বুড়ো, হয়তো তার জোয়ান ছেলে খুন হয়েছে, কিংবা অন্য কোনো আপনজন; আর সে লণ্ঠন-হাতে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাকে। লাশগুলো উলটে-পালটে তাকে চিনে বার করার চেষ্টা করছে।

যখন সে আমার খুব কাছে এসে পড়ল, তখন দেখলাম, সে লোক চেনার চেষ্টা করছে না, লাশগুলোর জিনিসপত্তর হাতড়াচ্ছে। এবং টাকা পয়সা প্রভৃতি দামী দামী জিনিস বার করে নিয়ে একটা থলেতে পুরছে।

হঠাৎ আমার মনে কি এলো কি-জানি, আমি আমার জায়গা থেকে উঠলাম। ও যখন একটা লাশের ওপর ঝুঁকে পড়েছে, অমনি আমি পেছন দিকে গিয়ে তার হাত ধরে ফেললাম। ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কে তুই?'

বুড়ো হকচকিয়ে গেলো। তার চোখের সাদা সাদা মণি-দুটো বেরিয়ে এলো। ঠোঁট কাঁপতে লাগল তার। ভয়ে তার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল, 'আমি মুসলমান।'

আমি তার ঘাড় চেপে ধরে বললাম, 'মুসলমান হলে এখুনি মেরে ফেলবো তোকে।'

বুড়োর মুখ থেকে কফ বেরিয়ে দাড়িতে মাখামাখি হতে লাগল। থলে ফেলে দিয়ে দুহাত জোড় করে বলল, 'না না, আমি মুসলমান নই। আমি—আমি—বুলাকী শাহ্। কঞ্জ্ রোডের বুলাকী শাহ্। নিশ্চয়ই নাম শুনেছ আমার।'

আমাদের সারা অঞ্চল জুড়ে কঞ্জ্ রোডের বুলাকী শাহের নাম কে আর শোনেনি! ও আমাদের এলাকার সবচেয়ে বড় মহাজন। এমন কেউ চাষী নেই যে ওর খাতক নয়। এমন একটা বাড়ি নেই, যে-বাড়ির জিনিসপত্তর তার বাড়িতে বন্ধক নেই।

'বুলাকী শাহ্! তুমি এখানে কি করছ?'

'আমার সবাইকে মেরে ফেলেছে। যা-কিছু ছিল আমার, সব লুটপাট করে নিয়েছে।'

'সে সব তোমার ছিল কোথায় বুলাকী শাহ্?'

আমার কথার জবাব না দিয়ে ও বলল, 'শুধু এক মেয়ে বেঁচে আছে। ও আগের দলটায় গেছে। এখন গিয়ে তাকে খুঁজলে হয়তো পাবো।'

'কিন্তু এখন তুমি এখানে কি খুঁজছ?'

'হে-হে।' বুড়ো হাসল। আমাকে একজন হিন্দু দেখে সে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। বলল, 'বাবা, আমার একটাই মেয়ে আছে। আর কিছুই নেই। যদি ও বেঁচেবর্তেই থাকে, সোমত্ত মেয়ে, বিয়ে-টিয়ে কি করে দেবো? এই ভেবে···।' সে আর কিছু না বলে মাটিতে পড়ে থাকা থলেটার দিকে ইশারা করল।

আমি থলেটা কুড়িয়ে নিয়ে দেখলাম, তাতে এক টাকা, দু টাকা, পাঁচ টাকা, দশ টাকা আর একশো টাকার নোট রয়েছে। ঘড়ি রয়েছে। ছ-সাতটি সোনার আংটি রয়েছে।

বুড়ো বলল, 'ভাবলাম, এরা তো মরেই গেছে, এই টাকা পয়সা এদের আর কি কাজে লাগবে? মুসলমানরা এসে আমাদের জিনিস নিয়ে যাবে!'

'তোমাদের জিনিস?'

'হ্যাঁ, তাই ভাবলাম, আমিই নিয়ে যাই। হে-হে···এই টাকা···আমার মেয়ের বিয়েতে কাজে লাগবে···'

'আচ্ছা? তাহলে তুমি এই লাশগুলোর মধ্যে তোমার মেয়ের যৌতুক খুঁজছিলে?' আমি খুব অবজ্ঞা ও ঘৃণার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম ওকে। কারণ বুড়োর কথায় আমার আদৌ বিশ্বাস ছিল না।

ও গড়গড় করে বলে গেলো, 'হ্যাঁ বাবু। তাছাড়া এখানে আর কি খুঁজব?' উলটে আমাকেই জিজ্ঞেস করল ও।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম ওকে। তারপর বড় উদাস গলায় বললাম, 'আর তোদের এই লোভ-লালসায় যে-জন্মভূমি হারাতে হয়েছে, সেই জন্মভূমি খুঁজছি আমি।' বুলাকী শাহের ঘাড় থেকে হাত সরিয়ে নিলাম। কারণ আমার মনে হচ্ছিল, আমি কোনো মানুষের গায়ে নয়, সাপের খোলসে হাত রেখেছি। জোরে এক ধাক্কা মেরে ওকে লাশ-গুলোর ওপর ফেলে দিলাম। তারপর স্টেশনের বাইরে চলে গেলাম আমি।

স্টেশন থেকে অনেক দূর এসে একবার পেছন ফিরে দেখলাম, সেই অন্ধকার ছায়াটা চোখে পড়ছে। লাল বাতি নিয়ে লাশগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে।

বুলাকী শাহ্!

পাঁচ

স্টেশন থেকে বেরিয়ে আমি একটা কাঁচা রাস্তা ধরলাম। রাস্তার দুপাশে আখের খেত। রাতের অন্ধকারে এক বিশাল শক্ত দুর্গের মতো দেখাচ্ছে। লজ্জায় ভয়ে ভীত হয়ে রাত্রি নেমে এসেছে আখের খেতগুলোয়। চারদিকে এক ভয়ংকর

স্তব্ধতা। কেবল আমার কুকুরটা পেছনে আসতে আসতে আকাশের দিকে মুখ তুলে মাঝে মাঝে কেঁদে উঠছে। এই রুমী এক আশ্চর্য কুকুর। দিনের বেলা একবারও কাঁদে না। আখের খেতে পা টিপে টিপে আমার সঙ্গে চলে। আমি হাঁটলে সে হাঁটে, আমি থামলে সে-ও থামে। কিন্তু আমার কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে দূরে। কারণ একবার রেগে গিয়ে আমি ওকে একটা লাথি মেরেছিলাম। লাথি খেয়ে একটু দূরে সরে গিয়েছিল সে। আমার আঘাতটা সহ্য করেছিল চুপচাপ।

তারপর থেকে রুমী বড় সতর্ক। কারণ রুমীর পেটে বাচ্ছা রয়েছে। সে তাদের সাবধানে আগলায়। আর তার ধারণা, আমাকেও আগলাচ্ছে সে। তাই রুমী আমার পেছনে বেশ খানিকটা দূরে দূরে হেঁটে আসছে। দিনে একদম চুপ করে থাকে, কারণ দিনে আক্রান্ত হওয়ার ভয় রয়েছে। কে জানে, একটা কুকুরের এতো বুদ্ধিসুদ্ধি হলো কি করে!

ও শুধু রাত্রিতে কাঁদে। আকাশের দিকে মুখ তুলে শোক প্রকাশ করে। ওই আকাশে এমন কে আছে, যার দিকে চেয়ে রুমী অভিযোগ জানায়? আজ আকাশের রঙ কালো। একটা তারাও ঝিকমিক করছে না কোথাও। পৃথিবী একেবারে স্তব্ধ, চারদিকে যেন ভয় জড়ানো। দিগন্ত নিবিড় স্তব্ধতায় আচ্ছন্ন। হাওয়ার শব্দটুকু পর্যন্ত নেই। আর দুপাশে দুর্গের মতো শক্ত মজবুত প্রাচীর। রুমী, তোর অভিযোগ-বার্তা এই জমাট অন্ধকার ভেদ করে কোথায় পৌঁছতে পারে! কারণ অন্ধকারের হৃদয় নেই, শুধু উদর-গহ্বর। অভিযোগ শোনার ক্ষমতা তো শুধু হৃদয়েরই থাকে। উদর-গহ্বর শুধু রক্ত পান করতেই জানে।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে এভাবে কেবল হাঁটছি আর হাঁটছি। মনের মধ্যে ইচ্ছে, এভাবেই হাঁটতে হাঁটতে নদী পর্যন্ত নির্বিঘ্নে পৌঁছনোর রাস্তাটা খুঁজে বার করতে পারব ঠিক। কিন্তু কয়েক মাইল হাঁটার পর মনে হলো, এ-পথটা ভুল। যে পথ ভেবেছিলাম, একটা সে-পথ নয়। অন্য পথ। শেষ আর হয় না। কে জানে শেষ পর্যন্ত পথটা কোথায় গেছে! ধীরে ধীরে রাস্তাটার ওপর দল বেঁধে লোক যাওয়ার চিহ্ন চোখে পড়ল। হাজার হাজার পায়ের ছাপ, রাস্তার এতোটুকু জায়গা খালি নেই কোথাও।

রাস্তায় এক বুড়ো জাঠকে আর্তনাদ করতে দেখলাম। আমাকে দেখেই সে ভয়ে একদম চুপ করে গেলো। তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সে এমনভাবে আমার দিকে চাইল, যেন মৃত্যু দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে।

বললাম, 'ভয় নেই। আমিও এক রিফিউজি।'

ধড়ে যেন প্রাণ এলো তার। ঠেলে আসা কণ্ঠনালী দু-তিনবার ওপরে নীচে ওঠা-নামা করল। তারপর তার গলা থেকে বড় কষ্টে একটা ফ্যাসফেঁসে শব্দ বেরিয়ে এলো, 'ওয়াহ্‌ গুরু···ওয়াহ্‌ গুরু···আমি তো ভেবেছিলাম···'

'তুমি ভুল বুঝেছিলে বাবা। এখানে পড়ে রয়েছ কেন?'

'আমার ছেলেরা আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যায়নি।'

'কেন নিয়ে যায়নি ?'

'আমি যে হাঁটতে পারিনে বাবা। খুব বুড়ো হয়ে পড়েছি যে।'

'তোমার ক-টি ছেলে ?'

'তিনটি। তিনটেই তাগড়া জোয়ান। আমাকে এখানে ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে।'

সমবেদনায় আমার মুখ থেকে 'চুকচুক' শব্দ বেরলো।

বুড়ো আমার সমবেদনাকে ভুল বুঝলো। গড়গড় করে বলল, 'আমাকে এখান থেকে সাঁকো পর্যন্ত নিয়ে চলো বাছা। শুনেছি রাবীর সাঁকোটা খুব কাছেই। সাঁকো পর্যন্ত পৌছে যেতে পারলে তোমাকে জীবনভর আশীর্বাদ করব। আমাকে শুধু সাঁকো পর্যন্ত পৌছে দাও।'

'আমারই সাঁকো পর্যন্ত যাওয়ার ইচ্ছে। নিজের পৌছনোটাই এখন বড় কথা। তোমাকে কাঁধে নিয়ে আমি কোথায় ঘুরে বেড়াবো !'

'আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলো বাবা। সঙ্গে নিয়ে চলো।'

আমি সামনে পা বাড়ালাম।

বুড়ো কয়েক পা হাঁচড়-পাঁচড় করে হামাগুড়ি দিয়ে এলো, 'পৌছে দাও বাবা···বাবা !'

বুড়ো আমার পা ধরে ফেলল। আমি জোরে পা ঝাড়তেই সে একটা পাক খেয়ে গড়াতে গড়াতে রাস্তার ধারে খানায় পড়ে গেলো।

কুকুরটা আচমকা জোরে চেঁচিয়ে উঠল। তারপর চোখ বড় বড় করে আমাকে দেখতে লাগল সে।

অনেকদিন আগে জ্যাক লণ্ডনের একটা গল্প পড়েছিলাম। তাতে তিনি বলেছেন, আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যে একটা প্রথা আছে। বাবা খুব বৃদ্ধ হয়ে পড়লে তাকে একটা থলেতে সাতদিনের খাবার, সাতদিনের তামাক আর সাতদিনের জল দিয়ে শীতকালে এক নির্জন বরফাচ্ছন্ন প্রান্তরে রেখে আসে।

যখন মানুষ আরণ্যক জীবনযাপন করত, এক-একটা পরিবার গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে বসবাস করত, এটা ছিল তখনকার নিয়ম। হিংস্রতা ও বর্বরতাই ছিল তখন জীবিকার একমাত্র উপায়। যখন খাদ্যদ্রব্যের অভাব ঘটত, গ্রীষ্মের দাবদাহে তৃণভূমি শুকিয়ে যেতো একেবারে, তখন মানুষ প্রকৃতির নিষ্ঠুর হাতের চড় খেতে খেতে রুটি-রোজগারের ধান্দায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াতো।

কিন্তু এখন তো সভ্যতার জয়জয়কার। দুপাশে আখের খেত। দূরে কোথায় এক রাবীর সাঁকো। আর কাছে কোথাও রেললাইনে গাড়ি সিটি মারতে মারতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে চলেছে। কিন্তু খানায় পড়ে যাওয়া ওই বৃদ্ধ নির্বাক দৃষ্টিতে কি জিজ্ঞেস করছে আমাকে ?

মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এই অন্ধকার খানা-খন্দ থেকে বেরিয়ে আসবে কবে ?

হুম্! মাথা হেঁট করলাম আমি। আমি কি একা মানুষের সভ্যতার ঠিকেদারি নিয়েছি ? বুড়োর ছেলেরাই যখন তাকে ফেলে পালিয়েছে, তখন তাকে বাঁচানোর দায়-দায়িত্ব আমার ওপর এসে বর্তায় কি করে ? জাহান্নমে যাক বুড়ো। হতচ্ছাড়া কুকুর, তুই ফের যদি কখনো আমায় ওরকম ভর্ৎসনা করিস, শাপ-শাপান্ত করিস, লাথি মেরে তোর হাড্ডি চুরচুর করে দেবো।

আমি কুকুরটাকে মারার জন্যে লাথি তুললাম। রুমী তৎক্ষণাৎ পেছনে দৌড় দিলো। আমি সামনে পা বাড়ালাম।

কিছুদূর যেতেই পথ আরো প্রশস্ত হলো। একটা বড় পাকা সড়কে গিয়ে মিশেছে সেটা। এখান দিয়েও সম্ভবত কোন দল গেছে। কারণ এক জায়গায় একটা কাটা হাত পড়ে আছে। শুধু একটা হাত। বাকী দেহটা উধাও। না ধড় না মুণ্ডু। না পা না পায়ের পাতা। না মুখ। না কোমর। শুধু একটা হাত পড়ে রয়েছে রাস্তায়, আমার যাওয়ার পথ আগলে। আমার পথের ওপরেই পড়ে রয়েছে সেটা। আর সেই হাতের চেটো আকাশের দিকে উন্মুক্ত।

শুধু একটা হাত। একটা বাহু···হাতটা খোলা। আকাশের দিকে চেয়ে আছে যেন। এই হাত কখনো লাঙল চালিয়েছে, কখনো ডাংগুলি খেলেছে। এই হাত কখনো কারোর কোমর আলিঙ্গন করেছে, কখনো আদর করে নিজের ছেলেমেয়েকে কোলে তুলে নিয়েছে, কখনো ফুলের ঘ্রাণ নিয়েছে, কখনো কোন মেয়ের মাথার চুল পরিপাটি করে দিয়েছে। এই হাত সাঁকো বানিয়েছে, শহর গড়েছে, ফুল ফুটিয়েছে। এই হাত নিজের প্রেমিকার মুখ-চোখে হাত বোলাতে বোলাতে নিজের ভবিষ্যৎ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার ছবি খুঁজেছে। আজ সেই হাত আকাশের দিকে চেয়ে মাটিতে পড়ে আছে। হাতটা কি কোনো হিন্দুর, না মুসলমানের ? না কোনো শিখের, না খ্রীষ্টানের ? কিছুই বলে না হাতটা। শুধু নিজের পাঁচটি আঙুল তুলে আকাশের দিকে নীরবে চেয়ে আছে। এটা কার হাত ? যদি এটা কোনো মানুষের হাত হয়, সেই মানুষটা আজ কোথায় ?

হা-হা-হা···নির্বোধের মতো প্রশ্ন! কতো না অভিযোগ! ওদিকে দলটা ক্রমশ চলে যাচ্ছে···

আমি লাফ মেরে হাতটা পেরিয়ে সামনে দ্রুত হাঁটতে লাগলাম।

কিছুদূর গিয়ে একটা শব্দ কানে এলো। মানুষের গলার আওয়াজ—আর্তনাদ। আমি ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়ালাম।

রাস্তার একদিকে তিনটি ছেলে মরে পড়ে আছে। তাদের কাছেই একটি মেয়ে আহত অবস্থায় পড়ে পড়ে কাতরাচ্ছে। আমাকে দেখতে পেয়েই বলল, 'আমাকে মেরে দে ভাই। আমার প্রাণটুকু বার করে দে।'

মেয়েটির কোমরের কাছে অনেক রক্ত পড়ে জমে গেছে। তারই কিছুটা ধীরে ধীরে গড়িয়ে যাচ্ছে তখনো।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাকে কি মুসলমানরা মেরেছে ?'

ও বলল, 'না। আমার স্বামীই ছেলে তিনটিকে খুন করেছে। আমাকেও মারতে চেয়েছিল। কিন্তু কি জানি কেন, আমি এখনো বেঁচে আছি। প্রাণ বেরোচ্ছে না।'

'তোমার স্বামী তোমায় মারল কেন ?'

ও যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে বলল, 'আমাদের দলের ওপর হামলা হতেই ও আমাকে ফেলে লড়তে যাচ্ছিল ওদের সঙ্গে। আমি ওর হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলাম, তুমি যাচ্ছো, কিন্তু কোথায় যাচ্ছো ? আমাকে, আমার ছেলেপিলেকে কার আশ্রয়ে ছেড়ে যাচ্ছো ? তাতে ও রাগে কটমট করে তাকালো আমার দিকে। তারপর ছুরি বার করে তিনটি ছেলেকেই কেটে ফেলল। আমি ভয়ে ছুটে পালাচ্ছিলাম, ও আমার দিকে ছুরি ছুঁড়ে মারল। ছুরি এসে আমার কোমরে লেগেছে। দলটা চলে গেছে। আমি এখানে পড়ে পড়ে কাতরাচ্ছি। কিন্তু প্রাণটা বেরোচ্ছে না। কিছুতেই প্রাণ যাচ্ছে না আমার। প্রাণটা বার করে দাও ভাই, তোমার মঙ্গল হবে। আমাকে শেষ করে দাও।'

'সকাল হতে না হতে আপনা থেকেই তোমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। আমায় কেন আর পাপ কাজটা করতে বলছ !' এই বলেই আমি হাঁটতে শুরু করলাম। অনেকক্ষণ মেয়েটির গালাগালি আমার কানে এলো, 'ঈশ্বর করুক তোর কিছু না থাকে ! তোর ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হোক (সেটা তো আগেই হয়েছে)। তোর মা মরুক (সে-ও হয়তো আগেই মরেছে)। তোর ছেলেপিলে না খেয়ে মরুক (হয়তো মরেই গেছে)। হ্যাঁ রে অলপ্পেয়ে, তোকে দিয়ে আমার কি এটুকুও হলো না ?'

চলতে চলতে হঠাৎ আমার মনে হলো, হাজার মাইল পথ হেঁটে আমি ক্লান্ত। আমার পা টলমল করছে। লোটাতে লোটাতে আমি আখের খেতের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। আখের শুকনো পাতায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

যখন ঘুম ভাঙলো, তখন সকাল হয়েছে। সূর্য উঠেছে। রুমী আমার পায়ের কাছে ঘুমিয়ে। কাছেই সড়কে একটা নতুন দল চলেছে। আখ-খেত থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। এক লাফ দিয়ে দলটার মধ্যে মিশে গেলাম। দেহমন এমন এক জড়তায় আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিল যে, চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতাটুকুও লোপ পেয়েছিল। দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে লোকগুলো যে ভাবে প্রাণপণে ছুটছিল, আমিও সেইভাবে তাদের সঙ্গে ছুটতে শুরু করলাম। কোথাও না কোথাও তো যাচ্ছি ! কোনো এক জায়গায় গিয়ে পৌছবই।···লাগাম-ছাড়া দলটা কোথাও গিয়ে পৌছবে তো !

যা হবার হোক !

ছয়

ভিড়ের মধ্যে যেখানটায় আমি ছিলাম, বলতে গেলে গোটা দলটার বৈশিষ্ট্য সেখানে কেন্দ্রীভূত। আমার সামনে চারজন হিন্দু যুবক তাদের বাবাকে খাটে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে লাশের মতো। খাটের ওপর নানা আকারের গাঁটরি রয়েছে বুড়োর চারপাশে। আমার ঠিক সামনে এক শিখ জাঠ, মুখে ঢাটা-বাঁধা, হাতে ছুরি, নিজের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে চলেছে। দুজনের মাথাতেই বড় বড় বোঁচকা। আমার পেছনে পেছনে আসছে একটা গরুর গাড়ি। দুটো বলদ টেনে আনছে গাড়িটা। গাড়ির ওপর একটা গোটা পরিবারের লোকজন তাদের সমস্ত আসবাবপত্তর নিয়ে বসে আছে। কোনো জমিদারবাড়ির লোকজন বলে মনে হচ্ছে তাদের। আমার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চলেছে এক বুড়ো বেনে। গায়ের রঙ কালো। সাদা গোঁফ। নিজের ধুতিতে কি যেন আঁটসাঁট করে বেঁধে রেখেছে।

বুড়োর এক হাত বোঁচকার ওপর, অন্য হাতে সে নিজের মেয়ের একটা হাত শক্ত করে ধরে আছে। মেয়েটি খুব সুন্দরী। যখন সে তার বড় বড় চোখের ভারী পাতা বড় কষ্টে তুলে কারোর দিকে তাকাচ্ছে, তখন তার বুক ঢিপঢিপ করে উঠছে। মেয়েটির লাজনম্র সকরুণ সৌন্দর্যের মধ্যে এক আশ্চর্য আকর্ষণ। ভরা যৌবনের ছন্দোময় গতিভঙ্গিতে এমন এক মাধুর্য, যেন সে কোথাও ছুটে যাচ্ছে না, তার পেছনেই ছুটে আসছে লোকজন। আমাদের মধ্যে সে এক প্রদীপের শিখার মতো জ্বলছে, যার ফলে এই ভিড়ের মধ্যেও জীবন প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকেই আড়চোখে দেখে নিচ্ছে তাকে, তারপর আবার সামনে হাঁটছে। মৃত্যু মাথার ওপর। কিন্তু এই সৌন্দর্যের আকর্ষণ অস্বীকার করার ক্ষমতা কারোর নেই। সবাই এক মুহূর্ত থেমে তাকে দেখতে বাধ্য হচ্ছে।

বেনের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগলাম আমি।

কিছুদূর গিয়ে বেনেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোত্থেকে আসছ?'

'যেখান থেকেই আসি আমি, তোমার কি তাতে?' তিরিক্ষে মেজাজে জবাব দিলো বেনে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ একসঙ্গে হাঁটতে থাকলাম দুজনে। অবশেষে আবার সাহস করে জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা তোমার মেয়ে?'

'নইলে কি তোমার?' বেনে আমার দিকে কটমট করে চেয়ে বলল। আরো জোরে মেয়ের হাত চেপে ধরল সে।

মেয়েটিও তাকাল আমার দিকে। সরোবরে যেন দুটি পদ্ম ফুটল। সরসীর জলের মৃদুমন্দ আন্দোলনে আন্দোলিত হচ্ছে পদ্ম দুটি। আর সরোবরে আমি

যেন ডুবে যাচ্ছি। নির্মল বিকশিত ফুল, মদিরাচ্ছন্ন আঁখি, শ্যাম্পেনের পাত্র থেকে ছলকে পড়ছে যেন।

আঃ…আঃ…আমি ভয় পেয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। আসলে এসব ব্যাপারে আমি বেজায় আনাড়ি। হাজি, বরক, মিয়াঁ—ওরা এসব বোঝে-সোঝে। নিজের মনটাকেও চেনে। এসব ব্যাপারে আমার মতোই ঠিক দুর্বল ওরা। কিন্তু ওরা ভীষণ জটিল, রহস্যময়। প্রায়ই নিজেদের দুর্বলতা লুকিয়ে রাখে। আমি তো একটা বোকা, গাধা। আমার দ্বারা কিছু লুকোনোই যায় না…আর তাই পড়ে পড়ে মার খাচ্ছি।

বেনেকে খাপ্পা দেখে বেশি কথাবার্তা না বলাই উচিত বলে মনে হলো আমার। মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গে এক শিখ যুবককে হাঁটতে দেখে আমার গা-পিত্তি জ্বলে যাচ্ছিল। যুবকটি ছ-ফুটের ওপর লম্বা। মুখে চমৎকার ফুরফুরে পাতলা, দাড়ি, তাতে তার চেহারাটা আরো খুলছে। বেনের মেয়ে ও যুবকটি পরস্পরের পরিচিত নয়। তবু একসঙ্গেই হাঁটছে তারা। অথচ একজন আরেকজনের সঙ্গে কথা বলারও সাহস পাচ্ছে না। একজন আরেকজনকে মিটমিটে আড় চোখে দেখছে শুধু। অনেকক্ষণ আমি তো ভেতরে ভেতরে জ্বলতেই থাকলাম। ভীষণ রাগ হচ্ছিল। কিন্তু মনে মনে যখন আমি সেই শিখ চাষীটার সঙ্গে নিজেকে ওজন করলাম, তখন নিজের দিকটার ওজন বড় কম বলে মনে হলো। ফলে আমি অস্ত্র-শস্ত্র ফেলে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে শেষবারের মতো চেয়ে দেখলাম মেয়েটিকে, তারপর সামনে এগিয়ে গেলাম। দলের সামনে এসে চেষ্টা করতে লাগলাম, যাতে কোনো জানাশোনা লোক, অন্তত গাঁয়ের কোনো লোকজনের সঙ্গে দেখা হয়। সেরকম দেখা হলে নিজের আত্মীয়-স্বজনের কিংবা স্ত্রী-ছেলে-মেয়ের খবরটা নিতে পারব। খিদেও পেয়েছিল জোর। কারোর কাছে খাবার-টাবার থাকলে এক আধটু চেয়েও নেবো না হয়। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সেরকম লোকজনের দেখা পেলাম না। শেষ পর্যন্ত হতাশ হতে হলো আমাকে।

দুপুরবেলা এক উন্মুক্ত প্রান্তরে দলটা বিশ্রাম করে নিলো। এখানে আখের খেত শেষ হয়েছে, নদীর ধারের জলজ ঘাস শুরু হয়েছে। কয়েকটি ঢিবির ওপর কিছু ঝোপ-ঝাড় মেটে রঙের পাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দূরে রাবী নদীর কিনারা চোখে পড়ছে—অস্পষ্ট, দিগন্তে বিলীন। আকাশে ধূসর মেঘ। শুকনো খটখটে মাটি। ধুলো-ময়লায় লোকগুলোর চেহারা কিম্ভূতকিমাকার। কপালে হাত রেখে তারা ডেরা বাবা নানকের সাঁকো খুঁজছে। কিন্তু সাঁকোটা পাতালেই তলিয়ে গেছে, না আকাশেই উঠে গেছে, চোখেই পড়ে না। সাঁকোটার কথা ভেবেই তো তারা এসেছে। দলের মাতব্বররা দেখল দারুণ বিপত্তি। রাস্তা গোলমাল হয়ে গেছে। সাঁকোয় পৌঁছতে হলে এখনো তিন মাইল পশ্চিম দিকে যেতে হবে, তারপর বাঁয়ে ঘুরে আরো পাঁচ মাইল হাঁটতে হবে। তবেই সেই

সাঁকোর দেখা পাওয়া যেতে পারে। এখন খাওয়া-দাওয়াটা সেরে নেওয়া দরকার।

দুজন চারজন দশজন বিশজন করে এক-একটা দল পাকিয়ে লোকজন বসে গেলো খাওয়া-দাওয়া সারতে দলের হিন্দু ও শিখ যুবকরা এদিকে ওদিকে পাহারা দিতে শুরু করল। তাদের হাতে লাঠি ছুরি, কৃপাণ, কুড়ুল, দেশী বন্দুক। কেউ কেউ সাঁজোয়া পরা। তাদের কাছে পিস্তল। অনেকে রাগে কটমট করে চারদিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু ওপরে বাহাদুরি ও রাগ দেখালেও প্রত্যেকের বুক ভয়ে দুরদুর করে কাঁপছে। নিজের অজান্তেই কারোর কারোর চোখে ভয়-ভাবনার ছায়া পড়ছে, অমনি তার সারা মনের ছবি ভেসে উঠছে সেখানে।

আমি নিজেকে শেষ পর্যন্ত সামলাতে পারলাম না। বেনে আর তার মেয়ে আছে যেখানে, সেখানে আবার গেলাম। মেয়েটি চুপচাপ তার বাবার সঙ্গে বসে বসে খাচ্ছিল। মেয়েটির দিকে পেছন ফিরে বসে সেই সুদর্শন চেহারার শিখ যুবকটি নিশ্চিন্ত মনে খাবার খেতে ব্যস্ত। খুব ভিড় সেখানে। জায়গা খুব কম। সেজন্যে সুন্দরী মেয়েটির পিঠ যুবকটির পিঠে লেগে রয়েছে। না-জানি এখন কতো বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে ওদের সারা শরীরে। রাগে জ্বলতে জ্বলতে ভাবছিলাম আমি।

আমার দারুণ খিদে পেয়েছিল। এতোক্ষণ যা ভাববার ভেবেছি, এখন খিদে ছাড়া অন্যকিছু ভাবতেই পারছি নে। খিদে আমাকে অস্থির করে তুলল। দু-তিন জনের কাছে খাবার চাইলাম, কিন্তু কেউ দিলো না। অবশেষে সর্দার লহনা সিং এবং তার স্ত্রী নীতু আমাকে খাওয়ার জন্যে ডেকে নিলো। গোরুগাড়িতে চেপে এসেছে যে জমিদার পরিবারটি, তারা সবচেয়ে বেশি নিজেদের জাঁকজমক দেখাচ্ছিল। তাদের ছেলেপিলেদের এমন ভাবভঙ্গি, যেন তারা গোরুগাড়িতে নয়, বিউকে চড়ে বেড়াচ্ছে।

আমাদের খাওয়া-দাওয়াই চলছে তখন, এমন সময় ঢিবিগুলোর পেছন থেকে ধুলো-বালির ঝড় উঠল যেন। পাহারাদাররা চীৎকার করে উঠল। সবাই নিজের নিজের খাবার ফেলে দৌড় দিলো। জমিদার পরিবারের ছেলেগুলো গোরু গাড়িতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কাঁদছে। ওদের মায়েরা দুহাতে বুক চাপড়াচ্ছে।

লহনা সিং নীতুর হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'হাতের চুড়ি ভেঙে দে।'

নীতু জোরে জোরে কব্জির ওপর কব্জি ঠুকে কাঁচের চুড়িগুলো ভেঙে ফেলল। লহনা সিং ঠোঁট কামড়ে বলল, 'ধরে নে, আজ থেকে তোর স্বামী মরে গেছে।'

নীতুর চোখ থেকে ঝরঝর করে জল ঝরতে লাগল। কিন্তু মুখে একটা কথাও বলল না।

লহনা সিং ছুরি বাগিয়ে পাহারাদারদের সঙ্গে মুসলমানদের মোকাবিলা করতে চলে গেলো। নীতু মাথায় বোঁচকা তুলে নিয়ে চেয়ে রইল তার দিকে।

বেনে ভয় পেয়ে নিজের মালপত্তর সামলাতে সামলাতে চীৎকার করে উঠল, 'হায় হায়, লক্ষ্মী সোনা মেয়ে আমার! যমুনা···যমুনা···'

কিন্তু যমুনাকে সেই শিখ যুবকটি দুহাতে আলগোছে তুলে নিয়ে আখ-খেতের দিকে পালিয়ে গেছে। বেনে চীৎকার করে করে নিজের তীব্র খেদ জানাতে লাগল। কিন্তু তখন অদ্ভুত বাসনা চরিতার্থের সময়। মুসলমান হামলা-কারীরা দলের মধ্যে হামলা শুরু করেছে। লোকজন নিজের নিজের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে এদিকে-সেদিকে ছোটাছুটি করছে। নিজের প্রাণ বাঁচানোর বদলে বেনের মেয়ের ইজ্জত বাঁচানোর জন্যে কে আর পড়ে আছে তখন!

আমিও একদিকে দৌড়লাম। প্রথমে তো অনর্থক নদীর দিকে। কারণ ঢিবিগুলোর ঝোপঝাড়ের পেছনে মুসলমান হামলাকারীরা রয়েছে। সেজন্যে তাদের উল্টোদিকেই দৌড় দিলাম। কিন্তু যখন হামলাকারীরা নদীর দিকের পথ বন্ধ করার জন্যে ঘোড়া ছোটালো, তখন সে-পথ ছেড়ে দিয়ে হাঁসফাঁস করতে করতে আখ-খেতের রাস্তা ধরলাম। আখ-খেতে তখনো পৌছোই নি, এমন সময় খেতের মধ্যে থেকে একদল হামলাকারী বেরিয়ে এলো। একজন মুসলমান এসে আমার বুকের ওপর বল্লম ধরল।

সেই মুহূর্তটি আমার এখনো মনে আছে। কখনো ভুলিনি, ভুলবও না কোনোদিন। বল্লম আমার বুকের ওপর। আমার চারদিকে মুসলমান হামলা-কারীদের লোক। তাদের পেছনে একজন ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। দুপাশের রেকাবে তার পা। কারুখচিত পাগড়িতে আধখানা মুখ ঢাকা।

হঠাৎ তাদের থামানোর জন্যে হাত তুললাম আমি। অশ্বারোহীর চোখে চোখ রেখে হেসে বললাম, 'কি আমার ভাগ্য! সারা জীবন কম্যুনিস্ট হয়ে পাকিস্তানের জন্যে প্রপাগাণ্ডা করে বেড়ালাম, মুসলমানদের ন্যায্য স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করে এলাম, আর আজ যখন পাকিস্তান তৈরি হলো, তখন বর্শা চালানো হচ্ছে আমার বুকেই!'

জানিনে কি করে এ-ধরনের কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল সেদিন। সে কোন্ শক্তি, যে আমাকে এ ধরনের কথা বলতে সাহায্য করেছিল! নইলে আমি কখনো কম্যুনিস্ট ছিলাম না, আজ পর্যন্ত কখনো কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিইনি। আমোদ-প্রমোদে কাটানো ফুলবাবু গোছের লোক আমি। আমার হিন্দু-মুসলমান-শিখ বন্ধুরাও সবাই আমারই মতো। লাহোরে নিজের নিজের বিজনেস করি। সন্ধ্যেয় একসঙ্গে টেবিলে জমা হয়ে ফূর্তি ওড়াই। রাজনীতির সঙ্গে কি সম্পর্ক আমাদের? আমাদের তর্ক-বির্তক তো খবরের কাগজের বাদ-বিসম্বাদ আর পুঁথিগত বিদ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ওসব তো হা-ভাতে লোকদের ব্যাপার, অথচ যেমন করেই হোক, প্রাণ বাঁচানোর চরম মুহূর্তে অজুহাতই বলো আর অস্ত্রশস্ত্রই বলো, আমার মাথা থেকে বুদ্ধিটা বেরিয়ে এলো। এটা নিয়ে আজও ভাবি, কিছু ভেবে বলার মতো এখনো

কিছুই পাইনি।

মনে আছে, আমার সেই কথা অশ্বারোহী সর্দারের ওপর বিদ্যুতের মতো কাজ করল। সে তীব্র দৃষ্টিতে আমার নীরব, প্রশান্ত, হাসি-হাসি মুখের দিকে চাইল, তারপর হাত তুলে ইশারা করল, 'ছেড়ে দাও ওকে।'

মুসলমানটা আমার বুক থেকে বর্শা সরিয়ে নিলো। তারপর 'আল্লাহো আকবর' আওয়াজ তুলে ওরা দলের মধ্যে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

যেই ওরা চলে গেলো, অমনি আমি চোঁচাঁ দৌড় লাগালাম। কোনদিকে গেলাম, কিভাবে গেলাম সেটা আজও জানিনে। শুধু মনে আছে, আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছি, আখ-খেতের ভেতর দিয়ে, খেতের আলের ওপর দিয়ে, খানা-খন্দে, খেতে জল দেওয়া নালায় নালায়, শুধু ছুটছি। কখনো ঢিবিতে চড়ছি, কখনো দৌড়চ্ছি শুধু বালির মাঠে মাঠে কিংবা রেলের লাইনে লাইনে। একটা শিকারের জন্তুর মতো প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে মন-প্রাণের সমস্ত শক্তি দিয়ে শুধু দৌড়চ্ছি। কোন দিকে দৌড়েছি, কেন দৌড়েছি, কতোক্ষণ দৌড়েছি, সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলতে পারব না আজ।

শুধু মনে আছে, যখন সন্ধ্যে হলো, তখন নিজেকে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম দরবার সাহেব কর্তারপুরের গুরুদ্বারের সামনে। গুরুদ্বারের মজবুত দরজায় একটা লোহার তালা। দরজার একপাশে একটা বড় পুরনো কাঠের আসনে এক বুড়ো শিখ আর তার বুড়ো স্ত্রী বসে। বেশ জোরে জোরে তাঁরা গুরু গ্রন্থসাহেব পড়ছেন।

আমাকে দেখে এক মুহূর্তের জন্যে থামলেন তাঁরা। ওঁদের দেখে আমার কিছুটা ভয় হলো। আমি বুড়ো শিখকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বাবাজী, আপনারা এখানে বসে আছেন কেন? আপনারা কি কিছুই জানেন না?'

বুড়ো শিখ প্রশান্ত মুখে জবাব দিলো, 'সবই জানি বাছা। সব জেনেও আমরা বসে রয়েছি এখানে। গেলে কোথায়ই বা যাবো? আপনার বলতে তো কেউ নেই। না আছে কাচ্চাবাচ্চা, না আছে দূর-সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন। কোনো সম্পত্তিও নেই, ঘরবাড়িও নেই। আমরা দুজন সারাটা জীবন গুরুর এই চরণে বসেই কাটিয়েছি। এখানেই থাকব, এখানেই মরব।' এই বলে ওঁরা আবার গুরু নানকের বাণী পড়তে শুরু করলেন।

আমি প্রণাম সেরে ওখান থেকে চলে এলাম। গুরুদ্বারের চারদিকে ঘুরলাম, কোনো জনপ্রাণী চোখে পড়ল না। আর তখন তো রাতের অন্ধকার ক্রমেই গাঢ় হচ্ছে। কোন দিকে কোন রাস্তা, কিছুই নজরে আসছে না।

গুরুদ্বারের কাছেই একটা বড় কুয়ো ছিল। কুয়োর পাড়ে উঠলাম। তারপর কপিকলের দড়ি ধরে নীচে নেমে গেলাম। জোরে দড়িটা ধরে ঠাণ্ডার মধ্যে শরীরটাকে এলিয়ে দিলাম। ঠাণ্ডায় আমার ক্লান্ত শরীরটা জুড়িয়ে গেলো। আমি সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লাম। কি করে ঘুমোলাম, কতোক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম,

কিছুই জানিনে। যখন ঘুম ভাঙলো, দেখি, সকাল হয়েছে। সূর্যের আলো কুয়োর মধ্যে উঁকি মারছে। কুয়োর পাড়ে একটা কুকুর আকাশের দিকে মুখ তুলে কাঁদছে। আমি কুয়ো থেকে উঠে এলাম এবং গুরুদ্বারের দরজার দিকে এগোলাম।

বাইরে কাঠের আসনে সেই বুড়ো-বুড়ি দুজনেরই মৃতদেহ। জানতেই পারিনি, রাতের বেলা কখন হামলাকারীরা এসে খুন করে গেছে ওঁদের।

সাত

গুরুদ্বার থেকে কয়েক ফার্লং গিয়ে একদম পরিষ্কার রাস্তা। এখন রাবী নদীর তীর স্পষ্ট নজরে পড়ছে। নদীর সাঁকোটাও। দু-একজন রিফিউজীকে দেখা যাচ্ছে নদীর দিকে ছুটে পালাতে। তাদের মধ্যে যমুনাকেও দেখতে পেলাম। কিন্তু তার সঙ্গে এখন সেই শিখ যুবকটি নেই; রয়েছে বদমেজাজী লালচে গাল এক পেশোয়ারী যুবক। যমুনার হাত বেশ শক্ত করে ধরে আছে সে। যমুনা হঠাৎ আমার দিকে তাকালো, তারপর চোখ নামিয়ে নিলো। তার চোখ ছলছল করছে।

যমুনাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার বাবার কি হলো?'

'মারা গেছে।'

'আর—আর—সেই—?'

'সেও মারা গেছে।'

যমুনার মাথাটা আরো ঝুঁকে পড়ল নীচে। পেশোয়ারী যুবকটি কটিবন্ধের পিস্তলে হাত রেখে আমার দিকে চেয়ে বলল, 'যাও যাও, কেটে পড়ো। আজে-বাজে কথা বলতে এসো না।'

আমি তৎক্ষণাৎ ওদের সঙ্গ ছেড়ে এগিয়ে গেলাম। পেছনে পেছনে রুমী। দু-তিনবার তাড়িয়েছি ওকে। কিন্তু তবু সে আশ্চর্য চোখ তুলে, আদরে লেজ নাড়াতে নাড়াতে আমার পিছে পিছে আসছে।

নদী ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে। রাবীর সাঁকোটাও এখন খুব পরিষ্কার চোখে পড়ছে। কিন্তু সাঁকো দিয়ে নদী পার হওয়াটা নিরাপদ মনে হলো না আমার। সাঁকোটার পাকিস্তানের দিকের তীরে মুসলমান হামলাকারীদের আস্তানা। নদীর দুই তীরেই হিন্দু-মুসলমান উভয় দলেরই লুটপাট হচ্ছে, লোক খুন হচ্ছে। কেবল সাঁকোর ওপরেই মিলিটারী পাহারা। তাদের ভার একজন ইংরেজ অফিসারের হাতে। কিন্তু তার কেবল দায়িত্ব, সাঁকো পারাপারের সময় হিন্দু ও মুসলমান দলের প্রাণ ও মালপত্তর যাতে খোয়া না যায়। পাকিস্তানে কি হচ্ছে, হিন্দুস্তানে কি ঘটছে, সেসব দেখার দায়িত্ব তার নয়।

এখন আমি নদীর পারে দাঁড়িয়ে। নদীর ওপারে নির্বিঘ্ন জীবন। ওপারের

পাড়ে হাজার হাজার তাঁবু চোখে পড়ছে। হাজার হাজার লোক নদীর ধারে হয় রোদ্দুরে বসে আছে, নয় শুয়ে আছে। মেয়েরা মাথার চুল খুলে একজন আরেকজনের উকুন বাছছে। কেউ কেউ রান্নাবান্নায় ব্যস্ত। কেউ কেউ নাইছে। ছেলেমেয়েরা বালুচরে বালি দিয়ে ঘর তৈরি করছে, আনন্দে চীৎকার করে ছোটাছুটি করছে।

নদীর ও-কূলে নিরাপত্তা। এক নতুন জীবনের আমন্ত্রণ। আর এপারে আমি জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি, কিভাবে ওপারে যাবো! সাঁকো দিয়ে গেলে মুসলমানদের ঘাঁটির ভেতর দিয়ে যেতে হয়। যে-প্রাণটা নানাভাবে রক্ষা করতে করতে নদীর এই তীর পর্যন্ত এসে পৌঁচেছি, সেটাকে এখন এক মারাত্মক বিপদের মধ্যে ছেড়ে দিতে রাজী নই আমি।

রূমী আমার পায়ের কাছে কুঁই-কুঁই করছে। এক লাথি মেরে বললাম, 'যা, ভাগ এখান থেকে। ফিরে যা।' কিন্তু কুকুরটা সেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুঁই-কুঁই করতেই থাকল।

ভাবতে ভাবতে নিজের সাহস ফিরে পেলাম। কাপড়-চোপড় খুলে ফেলে চোখ বন্ধ করে নদীতে ঝাঁপ দিলাম। ওপারের কিছু লোক আমাকে নদীতে ঝাঁপ দিতে দেখে চীৎকার করে উঠল, 'দৌড়ো, দৌড়ো······বেচারা এক হিন্দু ছোকরা ডুবছে। বাঁচাও।'

আমি নদীতে সাঁতরাতে লাগলাম।

রূমী পাড়ে দাঁড়িয়ে। কয়েক মুহূর্ত সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। সম্ভবত তার মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব, আমার সঙ্গে থেকে আমাকে আগলাবে, না পেটের বাচ্চাদের কথা ভাববে? থরথর করে তার পা কাঁপছে। তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডাকতে লাগল ঘেউ ঘেউ করে।

চলে যা রূমী। ফিরে যা তুই।

কিন্তু রূমীও নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

জলের স্রোত বেশ তীব্র। তা সত্ত্বেও রূমী নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে আমার পিছে পিছে আসার জন্যে সাঁতরাচ্ছে। তার ছোট্ট চিবুকটার সামান্যই জলের ওপরে। তার বিস্ফারিত চোখে ভয়-ভীতির সঙ্গে রয়েছে দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা, সাহস ও শক্তি।

আমি চীৎকার করে বললাম, 'ফিরে যা রূমী, ফিরে যা। আমার সঙ্গে আসিস নে।'

কিন্তু রূমী প্রাণপণে সাঁতার কেটে আমার পেছনে পেছনে আসতে লাগল।

হঠাৎ জলে একটা দারুণ তোড় এলো। রূমী ডুবে যাচ্ছে। প্রথমে দেখলাম, রূমী আস্তে আস্তে আমার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে, জলের প্রবল স্রোতে পা নড়ে আঁকুপাঁকু করছে। এক সময় তার চিবুক ডুবে গেলো। তারপর চোখ। অবশেষে কান। তারপর স্রোতে পাক খেতে খেতে তার দেহটা একেবারে

তলিয়ে গেলো।

তোকে মরতে হলো রুমী? তুই আমায় সাহচর্য দিতে চেয়েছিলি? যখন সবাই আমার সঙ্গ ত্যাগ করেছে, আমার দেশ, আমার মাটি, আমার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী বন্ধু-বান্ধব, যাদের সঙ্গে আমার হাজার হাজার বছর ধরে নাড়ীর বন্ধন, ভালোবাসার সম্পর্ক, তারা সবাই প্রত্যাখ্যান করেছে, তখন এক তুচ্ছ কুকুর হয়ে তুই আমায় সাহচর্য দিতে চেয়েছিলি? তুই কি দেখাতে চেয়েছিলি, শেখাতে চেয়েছিলি মানুষকে যে প্রকৃতির অন্তরের অন্তস্তলে এখনো ভালোবাসা রয়েছে, এখনো সে দয়া-মায়া-স্নেহ-প্রেম-সরলতার পাঠ শেখায়? নির্বোধ মূর্খ কুকুর, কেন তুই নিজের প্রাণটা দিলি? এই তুচ্ছ মানুষের জন্যে কেন নিজের বাচ্চাদের বলি দিলি, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে জলাঞ্জলি দিলি, অত্যাচার-নিপীড়নের রক্ত-ধারায় তাদের ভবিষ্যৎ ছারখার করে দিলি?

রুমী মরে গেলো। সেই সঙ্গে বুঝি একটা অঙ্গীকারেরও মৃত্যু হলো। একটি সভ্যতার অবলুপ্তি ঘটলো, একটি উপাখ্যান মুছে গেলো, ইতিহাসের একটি পাতা ওল্টালো। আমার চোখ দিয়ে দরদর করে অশ্রু ঝরতে লাগল। বুঝতে পারছিনে আমি অশ্রুর স্রোতে সাঁতার কাটছি, না জলের স্রোতে। কি করে আমি অন্য পারে গিয়ে পৌছলাম, মনে নেই। মনে নেই, সেই অশ্রুধারাই কি আমাকে অন্য পারে পৌছে দিয়েছিল! হয়তো মৃত্যুর সময়েও রুমী তার সমস্ত ক্ষমতা আমাকে উৎসর্গ করে দিয়েছিল! আজ শুধু আমার এটুকুই স্মরণ আছে, আমি ওপারে গিয়ে পৌছতেই কয়েকটি যুবক আমার হাত ধরে টেনে নদীর পাড়ে তুলেছিল।

একজন মহিলা বলে উঠেছিল, 'ইস্, এ তো একেবারে উলঙ্গ!' এই বলে সে তার ওড়না দিয়ে আমার নগ্ন শরীরটা ঢেকে দিয়েছিল।

তারপর আমি বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলাম।

আট

পরদিন শরণার্থীদের ক্যাম্পে খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে আত্মীয়-স্বজনের দেখা পেলাম। যে-সব হিন্দু ও শিখ ওদিক থেকে আসে, তাদের শরণার্থী বলা হয়। আর এদিক থেকে যে-সব মুসলমানরা ওদিকে পালাচ্ছে, তাদের বলা হয় মুহাজির। হিন্দু কখনো মুহাজির হতে পারে না, মুসলমানরাও কখনো শরণার্থী হতে পারে না। প্রচণ্ড দুর্বিপাকেও এই পার্থক্যটুকু থেকেই যায়।

আমার বাড়ির লোকজন আমায় দেখে খুব খুশী। খুশীর চোটে কেঁদে ফেলল অনেকে। আমার স্ত্রী একপাশে আলাদা হয়ে ময়লা সায়া ব্লাউজ পরে বসে ছিল। তার শরীরে শাড়ি বা অন্য কোনো কাপড় নেই। কারণ ওই অবস্থাতেই তাকে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসতে হয়েছে।

ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মুন্না কোথায়?'

কিছুই বলল না ও। কয়েক মুহূর্ত পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খুঁটতে থাকল। তারপর হঠাৎ আমার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল সে। ব্যাপারটা কি, আমি বুঝতে পারলাম না।

শেষে আমার ভাই আমাকে জানালো, মুসলমানরা মুন্নাকে মেরে ফেলেছে। আমার বউকেও নিয়ে যেতো ওরা, কিন্তু কোনোরকমে বেঁচে গেছে ও। শেষ পর্যন্ত বোনটাকে নিয়ে চলে গেছে। সাহায্য এসে পৌছতে না-কি বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছিল।

'বোন সরূজকেও—?' প্রশ্নটা আমার মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো। ধপ করে মাটিতে বসে পড়লাম আমি। আমার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছিল। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। সারা দেহে রক্ত টগবগ করে ফুটছে। রাগে কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। মনে হলো, আমার রক্তে যেন প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা। মাথাটা যেন এখুনি ফেটে পড়বে, হাত দিয়ে কান দুটো চেপে ধরলাম।

চীৎকার করে উঠলাম, 'না না, এটা হতে পারে না।'

আমার ভাই সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'হাজার হাজার লোকেরই তো হয়েছে এমন। তোমারই বা হতে পারে না কেন?'

আজ পর্যন্ত আমি নিজেকে খুব উদার, পরোপকারী, প্রগতিশীল হিন্দু বলে মনে করতাম। তাই ভেদাভেদের আন্দোলনই বলো, সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক আন্দোলনই বলো, যেসব জিনিস গত পঞ্চাশ বছর ধরে পাঞ্জাবের আবহাওয়াকে ক্লেদাক্ত করে রেখেছে, সেসব কোনো কিছুতেই অংশ নিইনি। আজ পর্যন্ত আমি নিজেকে মুক্তমন ও স্বাধীনতাপ্রিয় বলে ভাবতাম। কিন্তু ছেলেকে হত্যা করা এবং বোনকে অপহরণ করার কথা শুনেই আমার রক্ত গরম হয়ে উঠল। লাভার মতো টগবগ করে ফুটতে লাগল। সেখানে বসে বসেই মুসলমানদের উদ্দেশে গালাগালি দিতে লাগলাম। কেমন করে এক তীব্র ঘৃণা বোধের সৃষ্টি হলো! মনের সেই প্রচণ্ড জোর ও উত্তেজনা দেখে নিজেই কিছুক্ষণের জন্যে হতভম্ব হয়ে গেলাম। কিন্তু পরক্ষণেই রাগে ক্ষোভে প্রতিশোধস্পৃহায় আমার সারা শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। প্রতিশোধের জন্যে পাগল হয়ে উঠলাম আমি।

রাগে চীৎকার করে বললাম, 'চাকু দাও—একটা চাকু দাও আমাকে। একটা ছুরি···যে কোনো একটা ছুরি···'

আমার ভাই আমার হাত ধরে ফেলল, 'কি করছ? কি করছ তুমি?'

'শেষ করে দেবো। প্রাণসুদ্ধ সাবাড় করে দেবো। এক-একটা করে সব মুসলমানের গলা কাটব।' আমি জোরে জোরে চীৎকার করতে থাকলাম।

আমার ভাই আমাকে জাপটে ধরে বলল, 'কি হয়েছে দাদা? কি হয়েছে তোমার?'

কিন্তু প্রচণ্ড জোরে ঝটকা মেরে তার কাছ থেকে আমি নিজেকে ছাড়িয়ে

নিলাম। তারপর চীৎকার করতে করতে, প্রতিশোধের জন্যে আস্ফালন করতে করতে বেরিয়ে গেলাম···

কয়েক গজ গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়লাম। ভাবতে লাগলাম, আমার মতো তো আরো অনেকে রয়েছে। ওদেরও খুঁজে নেওয়া দরকার···

খুব শীগগীরই পেয়ে গেলাম তাদের। একটা বিশাল পিপুল গাছের নীচে দীর্ঘ লাইন। তাদের কাছে গিয়ে, ছেঁড়া জামা ময়লা পাতলুন পরা একজন লোককে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে কি রেশন দেওয়া হচ্ছে?'

যুবকটি হেসে বলল, 'হ্যাঁ, এখানে সেক্সের রেশন পাওয়া যাচ্ছে।'

'তার মানে?'

'একটা মুসলমান মেয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। আমরা তার বেইজ্জতি করছি।'

আমি আমার সামনে লাইনের লোকগুলো গুনলাম। পঁচিশ জন। দেখতে দেখতে আমার পেছনে আরো পনেরোজন এসে দাঁড়িয়ে গেলো।

আমি সেই যুবকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'লাইনটা কতোক্ষণ পর্যন্ত থাকবে?'

যুবকটি উত্তর দিলো, 'যতোক্ষণ না মেয়েটি মরে যায়!'

আমিও কিছুক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু একটু করে লোকগুলো এগোচ্ছে। তা সত্ত্বেও লাইনটা দীর্ঘই রয়েছে। মেয়েটার তীব্র চীৎকার হৃদয়-বিদারী। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার মনটা যেন কিরকম করে উঠতে লাগল, কেউ যেন আমার হৃৎপিণ্ডটাকে মুঠোয় নিয়ে মোচড় দিচ্ছে। মেয়েটির চীৎকার বড় করুণ।

'ও দাদা, আমি তোমার বোন! ও ভাই, আমি তোমার বোন!'

কানে আঙুল দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি সেখান থেকে, সেই ছেঁড়া-জামা-পরা যুবকটি নিজের ময়লা নীল পাতলুনটা নাড়াতে নাড়াতে হো-হো করে হেসে উঠল, 'গাধা!'

কিন্তু আমি সেখান থেকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালালাম। ছুটতে ছুটতে নিজের গালেই চড় মেরে কাঁদতে লাগলাম আমি। ফিরে যাওয়ার জন্যে মনকে বোঝাতে লাগলাম। মুন্নার সুন্দর চেহারাটাকে স্মৃতির পিঞ্জরে এনে দাঁড় করালাম। প্রতিশোধ-স্পৃহাকে তীব্র করে তোলার জন্যে নিজের বোন সরূজের নিষ্পাপ চেহারার আশ্রয় নিতে চাইলাম। কিন্তু প্রত্যেকবারই সরূজের চেহারা ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, ঝাপসা হয়ে গিয়ে সে জায়গায় ভেসে উঠছে সেই মুসলমান মেয়েটির চেহারা।···আমার প্রাণের উষর প্রান্তরে শাশ্বত নারীর চীৎকার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সাহায্যের জন্যে আর্ত চীৎকার, 'ও দাদা···ও ভাই···আমি তোমার বোন!'

ছুটতে ছুটতে সাঁকো-যাওয়া সড়কটার কাছে চলে গেলাম।

মুসলমানদের একটা দল এইমাত্র রাস্তা দিয়ে গেছে। সামান্য কিছু লোক বাকী রয়েছে তখনো। তারা সড়ক থেকে কয়েক গজ দূরে একটা কবর খুঁড়ছে।

কাছেই একটা গেঁয়ো মুসলমানের লাশ পড়ে রয়েছে। শুধু ধড়টা। কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে সেটা। মাথাটা চোখে পড়ছে না কোথাও।

এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলাম।

সড়ক থেকে এক বুড়ো মুসলমান দু-হাতে করে একটা মাথা তুলে নিয়ে আসছে। বারবার চোখের জল মুছছে সে। দাড়ি নেড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলছে, 'বাছা আমার! বাছা আমার···!'

আশপাশের লোকগুলো সব চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

বুড়ো মুণ্ডুহীন লাশটার কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসে। তারপর সে পাগলের মতো ধড়ের সঙ্গে মাথাটা জুড়ে দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে। ঠকঠক করে হাত কাঁপে তার। মৃদু কণ্ঠে বলে, 'বাছা আমার! বাছা আমার!'

সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

'আমার একটাই ছেলে ফজ্জা···'

বুড়ো মাটি থেকে আকাশের দিকে তাকায়, 'একটিই ছেলে···আমার ফজ্জা।'

কবর খোঁড়া চলছে। গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে।

বুড়ো শেষবারের মতো নিজের ছেলের কপালে চুমো খায়···ফজ্জার কপালটা বড় সুন্দর। কপালের ওপর একগোছা কোঁকড়ানো চুল। ঠোঁট দুটো পাতলা পাতলা, ভারী চমৎকার। ওর ঘুমন্ত শুদ্ধ মুখখানা জ্যোতির্বলয়ে ঘেরা বুদ্ধের মূর্তির মতো দেখাচ্ছে।

এক সময় কবর খোঁড়া শেষ হয়। দূর থেকে 'সৎ শ্রীআকাল' ও 'হর হর মহাদেও' শব্দ ভেসে আসে।

কবর খুঁড়ছিল যারা, তারা তাড়াতাড়ি লাশটাকে ঠেলে কবরে ফেলে দেয়। তারপর মাটি চাপা দিতে শুরু করে। প্রথমে বুড়ো মুসলমানটা তাদের বাধা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু দু-চারজন তাকে জোরে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয়। তখন সে নিরুপায় হয়ে দোয়া করার জন্যে দুটো হাত ওপরে তোলে।

সৎ শ্রীআকাল! হর হর মহাদেও!

লোকগুলো তাড়াতাড়ি মাটি দিয়ে কবরটা ভরাট করে ফেলে। তারপর কেটে পড়ে সেখান থেকে। শুধু সেই বুড়োটা কবরে বসে বসে সুরা ফাতেহা পড়তে থাকে: সৎ শ্রীআকাল! হর হর মহাদেও!

শূন্যে বর্শা ঝকঝক করে ওঠে। বুড়ো মুসলমানের দেহটা চার টুকরো হয়ে যায়। মৃত্যুর সময় তার মুখের শেষ নাম ছিল ঈশ্বরের, হত্যাকারীদের মুখেও শেষ নাম ছিল ঈশ্বরের···নিহত ও নিধনকারীদের ওপরে—অনেক অনেক ওপরে যদি কোনো ঈশ্বর থাকে, নিঃসন্দেহে সে বড় কৌতুকপ্রিয় অত্যাচারী।

আমি সেখান থেকেও পালিয়ে গেলাম। কিন্তু এখন মোটেই বুঝতে পারছিনে, এখান থেকে পালিয়ে যাবো কোথায়?

পরদিন সকালবেলা আমাদের ক্যাম্পে খবরটা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল। মুসলমানদের একটা বড় দল সাঁকো দিয়ে ওপারে যাবে। দুপুর নাগাদ প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার লোক এই দলে সামিল হবে। খবরটা শুনেই হিন্দু ও শিখ যুবকদের মধ্যে আনন্দের বান ডেকে গেলো। হামলা করার জন্যে তৈরী হতে লাগল ওরা। সাহায্য করার জন্যে আশপাশের গ্রামের চাষীদেরও ডাক দেওয়া হলো। সব রকম বন্দোবস্তের কাজ শেষ হলো খুব শীগগীরই।

এটা তো জানা কথাই, সাঁকোর পাহারাদার ইংরেজ অফিসার পুরো দল-টাকে একসঙ্গে যেতে দেবে না। কারণ প্রথম থেকেই সময়ের ঘাটতি থাকে। প্রথমে দু-ঘণ্টার জন্যে সাঁকোটা খুলে রাখা হয় রাবীর ওপার থেকে আসা হিন্দু দলের জন্যে। আর তারপর পালা করে দুদিকের দলের পারাপার চলে।

কিন্তু দলগুলো সাধারণত এতো বড় বড় হয়ে থাকে যে সব লোক দু-ঘণ্টার মধ্যে চলে যেতে পারে না। তাছাড়া দলের প্রথম দিকে প্রতিরোধ-ব্যবস্থাটা ভালোই থাকে। দলের লেজের দিকটা যতো এগিয়ে যায়, প্রতিরোধ-ব্যবস্থাও ততো ঢিলে হয়ে পড়ে। সেজন্যে দুদিকেই, দলগুলোর ওপর আক্রমণ করে যারা, তারা দলের প্রথম অংশটাকে ভালোয় ভালোয় চলে যেতে দেয়। ইংরেজ অফিসার সাঁকোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে যখন হাত তুলে দলটাকে থামিয়ে দেয়, তখন সামনের লোকগুলো তো প্রাণের কৃতজ্ঞতা জানাতে জানাতে চলে যায়, কিন্তু পেছনের বাকী লোকগুলোর ওপরে হাউই উড়তে লাগে। কারণ সবাই জানে, আবার দু-ঘণ্টা পরে তাদের জন্যে সাঁকো খুলবে। আক্রমণকারীরা তখন দু-ঘণ্টার অঢেল সময় পেয়ে দলের অবশিষ্ট দুর্বল অংশের ওপর আক্রমণ শুরু করে দেয়। লুটপাট, খুন-জখম চলতে থাকে। চারদিকে হুটোপাটি শুরু হয়। রাবীর উভয় তীরেই—সাঁকোর এদিকেও এবং ওদিকেও—হিন্দু, শিখ আর মুসলমানের লাশ স্তূপীকৃত হয়ে ওঠে।

দুপুরবেলা। সাঁকো থেকে প্রায় দু-শো গজ দূরে আমিও দাঁড়িয়ে। সড়কের কাছেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুসলমানদের দলটাকে সাঁকো পেরিয়ে চলে যেতে দেখছি। কেউ কেউ চুপচাপ রয়েছে। কেউ কেউ হাসি-ঠাট্টা করছে। যে যতো বুড়ো, সে ততো মুসলমানদের গালাগালি দিচ্ছে। ওরা মাথা হেঁট করে চলে যাচ্ছে। মাথায় বোঁচকা। কোলে ছেলেমেয়ে। কারোর কারোর কাঁধে খাট। খাটের ওপর আসবাবপত্তর। দুর্বলকে সাহায্য করছে কেউ। কেউ ছেলেপিলে-দের ধমকাচ্ছে। কেউ কেউ নিজের স্ত্রী-কন্যার হাত ধরে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে।

কাছ দিয়ে একটা মুসলমান ছেলে যাচ্ছিল, একটা রোগা টিঙটিঙে হিন্দু ছেলে তাকে থুথু দিলো।

মুসলমান ছেলেটার মুখ থমথমে হয়ে উঠল। বিদ্যুতের বেগে ঘুঁষি বাগিয়ে সড়ক থেকে নেমে পড়তে যাচ্ছিল সে, অমনি তার বাবা তাকে ধরে নিলো। একটা ধাক্কা দিয়ে সড়কের অন্যপাশে সরিয়ে দিলো তাকে। তারপর ক্ষমা

প্রার্থনার স্বরে সেই হিন্দু ছেলেটিকে এবং তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা হিন্দু যুবক-দের বলল, 'মাফ করবেন। বাচ্চা ছেলে তো!'

হিন্দু ছেলেটা প্রথমে ভয় পেয়ে পিছিয়ে গিয়েছিল। এখন বাঘের মতো এগিয়ে এলো সে। চিঁ-চিঁ করে ক্ষীণ কণ্ঠে মুসলমান লোকটাকে গাল দিতে লাগল। ছেলেটির বাহাদুরি দেখে তার আশপাশের লোকগুলো ভারী খুশী।

এক মাঝবয়েসী হিন্দু বলল, 'ছ্যাখো, শালাদের এখন প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে, তবু টুঁ শব্দটি করছে না। আর আগে আমাদের হিন্দুস্তানে জামাই সেজে ঘুরে বেড়াতো। মসজিদের সামনে একটু ব্যাণ্ড বাজালেই কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিতো। এখন আমরা গালাগালি পর্যন্ত দিচ্ছি, তবু কেমন শুনে চুপচাপ চলে যাচ্ছে··· ওদের···(গালাগালি)।

হঠাৎ সড়কের ওপর চলতে থাকা লোকগুলোর মধ্যে এক মাঝবয়েসী মুসলমান তার নজরে পড়ল। গালাগালির অর্ধেকটা তার মুখে থেকেই গেলো। বিস্মিত হয়ে সে মুসলমানটার দিকে চেয়ে দেখল। তারপর বিস্ময়ে আনন্দে উত্তেজিত হয়ে চীৎকার করে উঠল, 'অ বে আহম্মদ ইয়ার!'

আহম্মদ ইয়ার তার মাথার বোঁচকাটা সামান্য তুলে আওয়াজটা লক্ষ্য করে তাকাল। তারপর চিনতে পেরেই আনন্দে চীৎকার করে উঠল, 'অ বে নাথু. শুয়ারের বাচ্ছা! কুথা তুই?'

আহম্মদ ইয়ার ও নাথু পরস্পরকে আলিঙ্গন করল। কাঁদছে দুজনেই। জানা গেলো, দুজনে একই গ্রামের মুচি। ছেলেবেলা আর যৌবনের কিছু সময় একসঙ্গেই কেটেছে ওদের। তারপর রুজি-রোজগারের ধান্দায় একজন চলে গিয়েছে লাহোর, অন্যজন জলন্ধর। আজ কতো বছর পরে আবার তারা কোলাকুলি করছে, কাঁদছে।

নাথু বলল, 'তুই আমার বাড়িতে চল্। থাকবি সেখানে। কার এমন বুকের পাটা, তোর দিকে চোখ তুলে তাকায়!'

'না ভাই নাথু, চলে যাবো। থাকবই না এখানে। আর থাকতে পারব না। তোর ভাইরা বড় ঘোঁট পাকাচ্ছে।'

আহম্মদ ইয়ার লুঙ্গি তুলে নিজের পায়ের গোছায় একটা জখম দেখালো। নোংরা-ময়লা পটি বাঁধা সেখানে। বলল, 'ভাগ্যি ভালো বেঁচে গেছি। কিন্তু শয়তানদেরও ছেড়ে কথা বলিনি।'

'আমারও এই হাল হয়েছে ওদিকে। রাস্তায় জোয়ান ছেলেটাই মরে গেলো।'

'কে? ঘসেটা?' আহম্মদ ইয়ার আফশোস করতে করতে বলল, 'হায় হায় ···দিনকালের কি হলো নাথু? দেখতে দেখতেই কি হলো? আরে, আমি তো জলন্ধরেও জুতো বানাচ্ছিলাম, লাহোরে গিয়েও সেই জুতো বানাবো। তাহলে এই ঝগড়াটা কি নিয়ে?'

নাথুও কিছু ভেবে পেলো না। নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে, কানের পাশের

চুল টানতে টানতে বলল, 'দিনকালের হাওয়া-বাতাসই খারাপ আহম্মদ ইয়ার !'

আহম্মদ ইয়ার ব্যস্ত হয়ে বলল, 'আচ্ছা, আমি চলি, নইলে দলটা চলে যাবে আবার।'

শেষবারের মতো দুজনে কোলাকুলি করল। আহম্মদ ইয়ার যখন সামনে এগিয়ে গেছে, পেছন থেকে নাথু চীৎকার করে বলল, 'বখতিয়ার খাঁন চকের আব্দুল গণিকে আমার সালাম বলে দিও।'

'আচ্ছা। আচ্ছা!' দূর থেকে জবাব দিতে দিতে আহম্মদ ইয়ার দলের মধ্যে হারিয়ে গেলো।

নাথু যখন তার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে ফিরে দাঁড়াল, তখন দেখল, আশ-পাশের হিন্দু লোকগুলো তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করছে তাকে। তাদের চোখে ঘৃণা উপচে পড়ছে যেন। অপ্রতিভের হাসি হাসল সে। নিজের গা বাঁচানোর জন্যে কিছু বলতে চাইল, কিন্তু বিড়বিড় করে আজেবাজে বকে গেলো শুধু। মাথা নীচু করে সে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে কেটে পড়ল।

হঠাৎ আমার কি ইচ্ছে হলো কি জানি, পা চালিয়ে দলটার মধ্যে ঢুকে পড়লাম। মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগলাম। শুধু একজন আমাকে বেশ ভালো করে চেয়ে দেখে বলল, 'তুমি এখানে কিরকম?'

আমি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলাম, 'এ-পর্যন্ত হিন্দু সেজে এসেছি। এবার নিজের দেশে যাচ্ছি। পাকিস্তান।'

মুসলমান লোকটা মৃদু হেসে বলল, 'আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ্‌!' তার সন্দেহ কেটে গেলো। আর না কাটলেই বা কি আসে যায় আমার! আমি বুক ফুলিয়ে এই দু-শো গজ অর্থাৎ সাঁকোটা পর্যন্ত যেতে পারবই। সাঁকো পর্যন্ত কোনো ভয়ডরই নেই। দলটার দুপাশে হিন্দু ও শিখরা দাঁড়িয়ে। সাঁকোর ওপর রয়েছে সেই ইংরেজ অফিসার। সুতরাং সাঁকো পর্যন্ত প্রত্যেক হিন্দুই বাঘের বাচ্চা। এক লক্ষ মুসলমানের চেয়েও তার জোর বেশী। সেজন্যে আমি নির্ভয়ে দলের লোকদের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগলাম।

আমার বাঁ-দিকে এক বুড়ো। সাদা চুল-দাড়ি। জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কোত্থেকে আসছ বাপ?'

সে জবাব দিলো, 'মোরপণ্ড থেকে আসছি বাছা।'

'তোমার আর লোকজন কোথায়?'

'কবরে।'

চুপ করে গেলাম আমি। বুড়োর মুখে নানা রঙের খেলা শুরু হলো। একটা রঙ যাচ্ছে, অন্য রঙ আসছে। অবশেষে বড় শোকাতুর কণ্ঠে জানালো, 'মোরপণ্ডের শিখরা আমার তিনটে মেয়েকে আটকে রেখেছে। আর তিনটে ছেলেকে খুন করেছে। ওরা আমাকে আর আমার বুড়ী স্ত্রীকেও যদি মেরে ফেলত, ভালোই হতো আমাদের।'

বুড়োর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিল তার স্ত্রী। দুর্বল হাড়-জিরজিরে চেহারা তার। মাথায় উসকো-খুসকো সাদা চুল। সে এক অদ্ভুত হাসি-হাসি মুখে বুড়োর দিকে তাকালো। ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে বলল,' চুপো। গোলমাল কোরো না। আমার ছেলের ঘুম ভেঙে যাবে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'ছেলে ?'

আমার দিকে চেয়ে বেশ গর্বের সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ, আমি পোয়াতী। বুঝেছ, আমি পোয়াতী। আমার পেটে বাচ্চা রয়েছে।'

হঠাৎ সে আমার পেছনে সরে এসে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়ালো। তার পর নিজের পেট বাজাতে বাজাতে বলতে লাগল, 'আমি পোয়াতী, আমি পোয়াতী। বুঝলে, আমি পোয়াতী…!'

তার তীক্ষ্ণ ধারালো হাসি আমার সহ্য হচ্ছিল না। সেখানেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। বুড়ো মুসলমানটা তার পাগল স্ত্রীকে সামনে টেনে নিলো।

আমি আবার দলের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগলাম। জানি না, আমার মনের মধ্যে কি বাসনা ছিল, কি চাইছিলাম আমি ! কেন আমি তাদের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছি আমার নিজেরই জানা ছিল না। কিন্তু আমি দল ছেড়ে চলে যেতেও পারছিলাম না। এখন আমার সঙ্গে হাঁটছে এক সম্ভ্রান্ত ধর্মভীরু মুসলমান পরিবার। তাদের চেহারা, বেশবাস, চালচলন, আদব-কায়দা, কথাবার্তা দেখে তাদের শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান বলে মনে হচ্ছিল। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ অবশ্যি ময়লা, কিন্তু দামী কাপড়ের তৈরী। আট-দশ বছরের ফ্রক-পরা দুটি মেয়ে। চোদ্দ বছরের একটি ছেলে। মুখে হালকা গোঁফের রেখা। পরনে নীল ডুরে শার্ট আর ব্লু-ব্ল্যাক রঙের প্যাণ্ট। সে তার বোন দুটিকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটছে। তার বাবা নিজের বোরখা-পরা স্ত্রীর হাত ধরে আছে।

মুসলমান ভদ্রলোকটি আমার দিকে চেয়ে তৃপ্তির হাসি হাসলেন, 'খোদাকে ধন্যবাদ ! আমরা পাকিস্তান এসে পৌঁছলাম এবার।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'রাস্তায় কোনো বিপদ-আপদ হয়নি তো ?'

'সেই পাক পরওয়ার দেগারকে লাখ লাখ ধন্যবাদ ! আমাদের কোনো ক্ষতি হয়নি। আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই আমরা পাকিস্তানে পৌঁছে যাবো…ওই সামনে আমাদের নতুন দেশ !'

আনন্দে গর্বে তাদের চোখ-মুখ এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠল, যেন তাদের চোখে-মুখে ইন্দ্রধনুর সব রঙ ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের পা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দ্রুত এগিয়ে চলল সাঁকোর দিকে। আমি আমার গতি কিছুটা কমিয়ে দিলাম। ওরা সামনে এগিয়ে গেলো।

এখন আমার সঙ্গে হাঁটছে একটি মেয়ে। হঠাৎ আমার মনে হলো, গোটা দলটার মধ্যে সেও আমার মতো একা। আমি তাকে ভালো করে লক্ষ্য কর-

লাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি হিন্দু, না?'

আমার কথা শুনে থমকে দাঁড়ালো সে। তারপর আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল। আমার কথার কোনো জবাব দিলো না। কিন্তু তার চেহারা দেখে বুঝতে পারলাম, আমার লক্ষ্যভেদ ভুল হয়নি।

তন্বী সুতনু দেহ তার। সোনালী চুল। সোনালী গাল। সোনালী চিবুক। পাতলা পাতলা গোলাপী ঠোঁট। ক্ষীণ কটি। ভারী বুক। গতিভঙ্গিতে যেন অপূর্ব লাবণ্য ঝরে পড়ছে। কানের দুল দুলছে। সকরুণ স্বপ্নমদির চোখের পাপড়ি।

'তোমার নাম কি?'

'পার্বতী।'

'কোত্থেকে আসছ?'

'চিমাহ্ কিলান্ থেকে।'

'কোথায় যাচ্ছো?'

'পাকিস্তান।'

'তুমি পাকিস্তান কেন যাচ্ছো পার্বতী?'

'পাকিস্তান আমার প্রেমিকের দেশ।'

'তোমার প্রেমিক?'

'হ্যাঁ; আমাদের গাঁয়েই সে থাকত। নাম ইমতিয়াজ। ওর বাপ ছিল আমাদের গাঁয়ের একজন খুব বড় জমিদার। কট্টর মুসলিম লীগী। আমার বাবা ছিল গাঁয়ের সবচেয়ে বড় শেঠ। কট্টর আর্যসমাজী। কিন্তু ইমতিয়াজ ভালোবাসত আমাকে। আমিও ভালোবাসতাম। আমরা দুজন একসঙ্গেই কলেজে পড়তাম; এম. এ-তে···পাকিস্তান হয়ে গেলে ইমতিয়াজের মা-বাপ নিজেদের সব লোক-জন নিয়ে প্লেনে লাহোর চলে গেছে। কিন্তু ইমতিয়াজ সঙ্গে যায়নি। ওর মা-বাপ খুব বোঝাবার চেষ্টা করেছিল ওকে, কিন্তু কিছুতেই যেতে রাজী হয়নি। এই পার্বতীকে সে ভালোবাসত বলে নিজের দেশের মায়াও ত্যাগ করেছিল। কারণ আমি ওকে বিয়ে করব বলে কথা দিয়েছিলাম।'

'তারপর?'

মাথা হেঁট করে অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটল সে। চুপচাপ। অবশেষে বলল, 'বিয়ের আগেই আমার বাবা ওকে খুন করল। হিন্দু গুণ্ডাদের দিয়ে আমার ইমতিয়াজকে মেরে ফেলল। আমার ওপর কতো বিশ্বাস ছিল ইমতিয়াজের··· দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি স্বাস্থ্য। কিন্তু ও তো একা। আর গুণ্ডারা ছিল অনেক। আমি যখন সেখানে গিয়ে পৌছলাম, তখন তার লাশ চিল-শকুনে ছিঁড়ে খাচ্ছে।'

চোখে এককোঁটাও জল নেই। ঠোঁটে এতোটুকু আড়ষ্টতা নেই। গ্রীবায় এতোটুকু ভাঁজ নেই। সোজা মাথা তুলে হাঁটছে সে। এ এক আশ্চর্য মেয়ে।

আমি ভাবতে ভাবতে বললাম, 'হুঁ! ইমতিয়াজ তো মারা গেছে। এখন তুমি পাকিস্তানে গিয়ে কি করবে?'

পার্বতী বেশ গর্বভরে দৃপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলো, 'ওর মার কাছে আমি ওর বিধবা স্ত্রীর মতোই থাকব।'

আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকালাম। সাঁকোটা যেন হঠাৎ কাছে এগিয়ে এলো—সাঁকোর ওপর পার্বতীর একটি পা।

'পার্বতী, কোথায় যাচ্ছো তুমি? ফিরে এসো, সরল বোকা মেয়ে। কে আর শুধু কল্পনার বশবর্তী হয়ে নিজের দেশত্যাগ করে? কোনো মেয়ে কি তার স্বামীর জন্যে মৃত্যুবরণ করে? মা তার ছেলের জন্যে প্রাণ দেয়? বোন কি তার ভাইয়ের জন্যে ফাঁসিকাঠে ঝোলে? এ-সব সম্বন্ধ শুধু পরিচিতির জন্যে। জন্ম ও রক্তের সম্পর্ক। কিন্তু তুমি তো কারোর সঙ্গে এরকম সম্পর্কে আবদ্ধ নও। ইমতিয়াজের সঙ্গে তোমার তো বিয়ে হয়নি যে তুমি তার বিধবা হবে! তোমার কোলে তার সন্তানও নেই। তার বংশ, দেশ কিংবা ধর্মের সঙ্গেও তোমার কোনো সম্পর্ক নেই। তাহলে আমাদের সবাইকে ছেড়ে তুমি কোথায় যাচ্ছো? নিজের কল্পনার ধ্যানে বিভোর হয়ে কোন্ ঠিকানায় রওনা হয়েছ তুমি? পাগলী, এই সংসারে কেউ কি কারোর ভালোবাসার জন্যে মৃত্যু বরণ করে? পুরুষ মরে টাকা-পয়সার জন্যে। নারী মরে তার দেহের জন্যে। খ্যাতি, ধনসম্পদ, ক্ষমতা, দেশ, ধর্ম, পরকাল প্রভৃতির জন্যে মরে মানুষ। কিন্তু শুধু কল্পনার বশবর্তী হয়ে সারা জীবনটাকে ভাসিয়ে দেওয়া, এ যে কতো বড়ো বোকামি, একটু ভেবে ছাখো তো পার্বতী! ফিরে এসো। চাঁদের মতো দীপ্যমান, সকরুণ, কিন্তু ফুলের মতো বিকশিত নিজের সতেজ সুষমার কথা একবার ভেবে ছাখো পার্বতী। অনেক হিন্দুই তোমাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে, তাদের চোখের চাউনির প্রতি দয়া করো। ফিরে এসো। ধীরে ধীরে আমরা তোমার মনের ইমতিয়াজের স্মৃতিকে মুছে দেবো। আমরা তোমার ধর্মের লোক, তোমার দেশ, সমাজ, সম্প্রদায়ের লোক। আমরাই ভালো-মন্দর পরীক্ষক। ধীরে ধীরে আমাদের পরিচিত জগতের মধ্যে তোমাকে অন্তরঙ্গ করে তুলব। ধীরে ধীরে বুঝিয়ে-সুজিয়ে তোমায় ঠিক পথে নিয়ে আসব। তোমায় আমরা এমন করে গড়ে তুলব, যাতে তুমি আবার এদিকে ওদিকে চোখ মেলে তাকাও, তোমার মুখ প্রসন্ন হয়ে ওঠে, তোমার মুখে হাসি ফোটে। তারপর ধীরে ধীরে, খুব ধীরে ধীরে, ভুলিয়ে-ভালিয়ে আমরা তোমাকে সেই আগুনের কাছে এনে হাজির করব, যে-আগুনের চারদিকে সাত পাক ঘুরে এক অচেনা-অজানা পুরুষের আলিঙ্গনে বাঁধা পড়বে তুমি। তার সঙ্গে ডুলিতে বসে খুশিতে ডগমগ করতে করতে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে। আমরা এইরকমই করে থাকি। হাজার হাজার বছর ধরে এই রকমই করে এসেছি আমরা।···প্রেমের সমাধি রচনা করতে আমাদের জুড়ি নেই কোথাও। ফিরে এসো পার্বতী···ফিরে এসো।'

কিন্তু পার্বতী একবার ফিরেও চাইল না আমার দিকে। সোজা সাঁকোর ওপর দিয়ে হেঁটে চলল। অর্ধেক সাঁকো সে পেরিয়েছে, অমনি সেই ইংরেজ অফিসার হঠাৎ এগিয়ে এসে সাঁকোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে রাস্তা বন্ধ করে দিলো।

নয়

যারা সাঁকোর ওপারে চলে গিয়েছিল, তারা বেশ খুশী। যারা এপারে থেকে গেলো, তারা ভয়ে আধমরা। বারবার তারা সামনে-পেছনে এদিকে-ওদিকে দেখতে লাগল। সেই সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের ছেলেটি তার দুই বোনকে নিয়ে ওপারে চলে গিয়েছিল, কিন্তু নিয়মমাফিক ইংরেজ অফিসার মাঝখানে এসে রাস্তা বন্ধ করে দিলো। আর ছেলেমেয়েদের বাবা ও মা এপারেই থেকে গেলো। মুসলমান ভদ্রলোক অনেক অনুনয় করল, 'দেখুন, আমার ছেলেমেয়েরা ওপারে। প্লীজ কম্যাণ্ডার সাহেব, শুধু আমাকে আর আমার বিবিকে যেতে দিন।'

কিন্তু ইংরেজ অফিসার কোনো কথাই কানে নিলো না। নিরুপায় হয়ে স্বামী-স্ত্রী একপাশে সরে দাঁড়ালো। ছেলেমেয়েদের দিকে বেদনার্ত চোখে চেয়ে রইল। ইংরেজ অফিসার তাদের সাঁকোর ওপরেও থাকতে দিলো না। এখন ওদিক থেকে হিন্দু লোকজন আসবে। তাই সাঁকো খালি করার জন্যে সে মুহাজিরদের পেছনে ধাক্কা দিতে লাগল। অন্যান্য মুহাজিরদের সঙ্গে সেই দুজন স্বামী-স্ত্রীও সাঁকো থেকে দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুসলমান ভদ্রলোকটি মাটিতে পা ঠুকতে ঠুকতে বারবার বলতে লাগল, 'এটা কি ধরনের বেকুবি কাণ্ড! কি ধরনের আহাম্মুকি ...একটা হাতকে দু-টুকরো করে দেবে তাই বলে! মিলিটারী অফিসারটা যদি আমাদের দুজনকে যেতে দিতো, এমন কি ক্ষতি হতো!'

তার স্ত্রী তাকে বোঝাতে লাগল, 'সবুর করো। এই তো ঘণ্টা দুয়েক পরেই আবার আমাদের যাওয়ার পালা আসবে।'

নিজের স্বামীকে তো সান্ত্বনা দিচ্ছে, কিন্তু ছেলেমেয়েদের জন্যে দুজনের মনই অস্থির। স্বামীকে বোঝাচ্ছে, আর বারবার গোঁড়ালি তুলে ওপারে চেয়ে চেয়ে দেখছে, যেখানে তার ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এখন এপারে হিন্দু লোকজন আসছে। সাঁকো পেরিয়ে তারা সড়কে নেমে এলো। সড়কের ধারে মুহাজিররা দাঁড়িয়ে ছিল, আর সর্বস্ব-লুণ্ঠিত শরণার্থীদের দেখছিল। শরণার্থীরা একের পর এক চলে যাচ্ছে এবং বিধ্বস্ত মুহাজিরদের অবস্থা দেখছে। উভয়েরই দৃষ্টিতে একই প্রশ্ন, একই উত্তর। তাদের চোখের ক্রুদ্ধ ঘৃণা দেখতে দেখতে গভীর অপরাধবোধে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল, উভয়েই একজন আরেক জনের চোখ এড়ানোর জন্যে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল, যাতে একজন অন্যজনের চোখের ভাষা পড়তে না পারে।

আমি মুহাজিরদের দল থেকে শরণার্থীদের দলে চলে এলাম। তাদের সঙ্গে আমি আবার উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করলাম। কিন্তু আমার কিছুতেই মনে হলো না যে আমি আমার যাত্রাপথ পরিবর্তন করেছি। শুধু মনে হচ্ছিল আমি সেই একই যাত্রীদলের সঙ্গেই হেঁটে চলেছি।

কিছুক্ষণ পরে দলটার মধ্যে আমার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হলো। এক কাকা, এক পিসে। কয়েকজন বৃদ্ধা মহিলা। ওরা সবাই আমার বাবার লাশ খাটে করে বয়ে নিয়ে আসছিল। এইমাত্র সাঁকোর ওপারে তিনি দাঙ্গাবাজদের সঙ্গে লড়াই করতে করতে মারা গেছেন।

দশ

বাবার লাশ একপাশে পড়ে আছে। কাপড়ে ঢাকা। সবাই চুপচাপ। মেয়েরা রাত্রির রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত। এরকম অবস্থায় পাড়াগাঁয়ে প্রায়ই অন্যদের বাড়ি থেকে খাবারদাবার আসে। কিন্তু এটা ক্যাম্প। এখানে সবাই নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। কে কাকে দেখে! সবারই অবস্থা তথৈবচ—না খাবার আছে, না পরার। দাদা গেছে কিছু ছোলা-টোলার ব্যবস্থা করতে। আমি একটা ঝরঝরে খাটের পায়ায় ঠেস দিয়ে বসে আছি। এমন সময় কয়েকজন হিন্দু ও শিখ রাজাকার এলো। দলের পাণ্ডা লাহোরের বিখ্যাত পালোয়ান বিল্লু। একটা চোখ কানা, অন্যটা বিড়ালের চোখের মতো। সেজন্যেই তাকে সবাই বিল্লু বলে। বিল্লু লাহোরী গেটের মধ্যে মুসদ্দি শাহের আখড়ায় হিন্দু পালোয়ানদের একটা গ্যাং তৈরী করে রেখেছিল। তারা হিন্দু গণ্যমান্য লোকদের উস্কানিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় হিন্দুদের হয়ে লড়াই করত। লাহোরে থাকতে বিল্লু দু-তিনবার আমার কাছে চাঁদা চাইতে এসেছিল। কিন্তু আমি কখনো চাঁদা দিইনি ওকে। সেজন্য এখন আমাকে দেখে খুব দাপটের সঙ্গে এসে দাঁড়ালো। বলল, 'একটু পরেই আমরা মুহাজিরদের ওপর হামলা করতে যাচ্ছি। সন্ধ্যে হয়েছে। দলটার তিন ভাগের দুভাগ চলে গেছে। বাকীটা পড়ে আছে শুধু। এখন হামলা করার উপযুক্ত সময়।'

বললাম, 'হামলা করো না! আমার কি তাতে?'

বিল্লু বেশ তিক্তস্বরে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার কি তাতে? এমনি নির্বোধ হিন্দুদের জন্যেই তো পাকিস্তান হলো। নিজেদের বাপ মরলেও বলবে, আমাদের কি?'

আমি খাটের পায়ায় তেমনি ঠেস দিয়ে বসে রইলাম। তারপর হঠাৎ রাগে মাথা সোজা করে বিল্লুর সামনে উঠে দাঁড়ালাম। বিল্লু বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল, 'হামলা করার জন্যে আমরা প্রত্যেক বাড়ি থেকে একজন করে নিচ্ছি। আধ ঘণ্টার মধ্যেই রেশন ডিপোর কাছে হাজির হতে হবে। বর্শা

বল্লম বন্দুক ঘোড়া, সব কিছুর ব্যবস্থা আছে সেখানে।'

চারদিক থেকে সকলের দৃষ্টি আমার ওপর, তীক্ষ্ণধার তুরপুনের মতো ছেঁদা করছে যেন।

আমি দাঁতে দাঁত ঘষে বললাম, 'যাচ্ছি আমি।'

বিল্লু হাসতে হাসতে চলে গেলো।

ওর হাসি আমার সহ্য হলো না। আমি তক্ষুনি ওর পেছনে পেছনে চললাম।

প্রত্যেক বাড়ি প্রত্যেক পরিবার থেকেই দু-একজন করে লোক নিতে লাগলাম আমরা। দল ভারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গলার জোর বাড়ছিল যেমন, চোখে হিংস্রতাও ফুটে উঠছিল তেমনি। হাতের আঙ্গুলগুলো নিশপিশ করছিল। চোখমুখের চেহারা বীভৎস হয়ে উঠছিল। যখন আমরা রেশন ডিপোর কাছে এসে পৌছলাম, সেখানে আগে থেকেই প্রায় পাঁচশো লোক হৈ-হট্টগোল করছিল, মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়ে তড়পাচ্ছিল।

তাদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও চললাম। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল, আমি স্বপ্নের মধ্যে হাঁটছি। আমার আশেপাশে যতো লোক ছিল, সবাইকে স্বপ্নে-দেখা ছায়ামূর্তি বলে মনে হলো। রেশন-ডিপোর কাছে হিন্দু যুবকরা বর্শা-বল্লম বেঁটে দিচ্ছে। বন্দুক দেওয়া হচ্ছে শুধু দলের পাণ্ডাদের। কে যেন আমার হাতে একটা বর্শা গুঁজে দিলো। কে যেন বলল, 'ওইটে তোমার ঘোড়া।' বর্শা-হাতে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হলাম আমি।

যেখানে একটা বিশাল বরগিদের গাছি রয়েছে, সেখানে গিয়ে আমরা মুসলমানদের ওপর আক্রমণ শুরু করে দিলাম। 'সৎশ্রীআকাল' আর 'হর হর মহাদেও' চীৎকারের সঙ্গে মুহাজিরদের আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

মুহাজিরদের দল ছত্রভঙ্গ হয়ে রাস্তা ছেড়ে বালির চরের ওপর দৌড়তে লাগল কিছু মুসলমান যুবক খুব সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে 'আল্লাহো আকবর' ধ্বনি দিয়ে মোকাবিলা শুরু করল। আক্রমণকারীরা তাদের রাস্তা থেকে তাড়িয়ে নিয়ে বালির চরে ঘিরে ফেলল। এর আগে সেখানে হাজার হাজার মুসলমানের প্রাণ গেছে।

এখন আমার চারদিকে শুধু মশাল জ্বলছে। চারদিকে যুদ্ধক্ষেত্র। আমি বর্শা তুলে ঘোড়া ছুটিয়ে এদিক-ওদিক শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমার সামনেই এক মুসলমান বুড়ো একটা ছোট্ট শিশুকে বুকে জড়িয়ে ছুটছিল। পরনের তেলচিটে ময়লা ফতুয়াটা জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। বারবার পেছনে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। শিশুটি ভয়ে চীৎকার করছে। ছোট্ট পাতলা পাতলা হাত দুখানা দিয়ে বুড়োর গলা খুব জোরে জড়িয়ে ধরছে। ছুটতে ছুটতে গিয়ে মুসলমানটাকে এক ধাক্কা দিলাম। পুঁটলিটা হাত থেকে ছিটকে মাটিতে সেটা পড়ে গেলো। পুঁটলিটা তুলে নেওয়ার জন্যে যেই সে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, অমনি আমি ঘোড়া ছুটিয়ে নিয়ে গিয়ে বর্শা ধরলাম তার বুকে।

বুড়ো পুঁটলিটা মাটিতে ফেলে দিলো। তার হাতখানা বুকের কাছে উঠে এলো। আমার দিকে ভীত চোখে চেয়ে আস্তে আস্তে হাত নেড়ে বলল, 'না না—না বাবা, আমাকে মেরো না।'

শুধু সেই এক মুহূর্তের ছবি চিরদিনের মতো আমার মনে গেঁথে আছে। ভয়ে বুড়োর মুখ হাঁ হয়ে গেছে। বুকের কাছে তার হাতখানা ভয়ে আশঙ্কায় কাঁপছে। ছেঁড়া ফতুয়া থেকে তার বুক দেখা যাচ্ছে। আমার বর্শা তার বুকের যেখানটা ছুঁয়ে আছে, সেখানে সাদা সাদা চুল। ভারী চমৎকার সাদা চুল, আমার বাবার বুকে যেমন ছিল। নরম ও মসৃণ। আর যেরকম কোমল করুণ কণ্ঠে আমাকে বলল, 'না না—না বাবা, আমাকে মেরো না,' সে কণ্ঠস্বর শুনে বাবাকে মনে পড়ল আমার। জলে ভরে উঠল আমার দুটি চোখ। তার বুক থেকে তখনো বর্শাটা সরিয়ে নিইনি, হঠাৎ আমার পেছন থেকে একটা কর্কশ আওয়াজ, 'চলে আয়। কুত্তা বামুন, কি লড়বি তুই! দূর হয়ে যা, বিশ্বাসঘাতক!' বলতে বলতে বিল্লু তার কালো ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে এলো। বর্শা দিয়ে বুড়ো মুসলমানের বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে চলে গেলো।

হঠাৎ বুড়ো মুসলমানটাকে কালো ঘোড়ার পায়ের কাছে হুড়মুড় করে পড়ে যেতে দেখলাম। তার ছোট্ট শিশুটি পটকা খেয়ে একটা ছোট্ট গর্তে ছিটকে পড়ল। হাজার হাজার আক্রমণকারী জায়গাটাকে পদদলিত করে চলে গেলো। হঠাৎ আমার চোখ দুটি জলে এমন ভরে গেলো যে, আমি আর কিছুই দেখতে পেলাম না। ঘোড়ার পিঠে বসে আমার সারা শরীর ঠকঠক করে কাঁপতে থাকল। আমার সারা অন্তর দেহপ্রাণ ক্ষোভে ঘৃণায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল।

তৎক্ষণাৎ আমি হাতের বর্শাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম দূরে। ঘোড়া ছুটিয়ে সেই বধ্যভূমি থেকে মাথা নীচু করে পালিয়ে গেলাম।

শুনেছি, চার-পাঁচ ঘণ্টা পরে সেখানে মিলিটারী সাহায্য এসে পৌঁছেছিল। কিন্তু ততোক্ষণে আক্রমণকারীরা নিজেদের কাজ সেরে সরে পড়েছিল।

হাজার মুসলমান খুন হয়েছিল সেই বালুচরে।

এগারো

সে-রাত্রি আমি একেবারে ঘুমোতে পারিনি। চোখে ঘুম এলেও তা কয়েক মুহূর্তের জন্যে। ঘুমের মধ্যে কখনো বাবার মুখ দেখতে পেয়েছি, কখনো সেই মুসলমান বুড়োটার বুক—বর্শায় এফোঁড়-ওফোঁড়। আর অমনি ঘুম ভেঙে গেছে ধড়াস করে। তারপর অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করতে করতে চোখে তন্দ্রা ঘনিয়ে এসেছে একটু, অমনি দেখতে পেলাম, নলখাগড়ার বনে শাদাঁ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে, মাথার চুল আলুথালু। নলখাগড়ার বন জ্বলছে দাউদাউ করে। আবার ঘুম ভেঙে গেছে। অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করতে করতে তৃতীয় প্রহর কেটে

গেছে, চোখে না ঘুম, না অশ্রু। আমি মাটি থেকে উঠে বাইরে বেরিয়ে গেলাম।

তখনো ভোরের আলো ভালো করে ফোটেনি। চারদিকে বেশ গাঢ় অন্ধকার। কেবল আকাশ ও পৃথিবীর সীমানা পৃথক করে দিচ্ছে এক শুভ্র আলোকরশ্মি—প্রভাতের আগমনবার্তা ঘোষণা করছে যেন। আমি সেই অস্পষ্ট আলোয় ক্যাম্প থেকে বাইরে এলাম। আস্তে আস্তে আমার পা এগিয়ে চলল বালুচরের দিকে। যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু এক অজানা শক্তি টেনে নিয়ে চলল আমাকে।

হাঁটতে হাঁটতে অন্ধকার কমে আসতে লাগল। আলো ছিল না। কিন্তু ঘন অন্ধকার ক্রমশ স্বচ্ছ হয়ে আসছিল। বোঝা যাচ্ছিল, এখানে খানাখন্দ, এখানে ঢিবি, ওখানে গাছপালা। আবছা অন্ধকারে সবকিছু যেন দম বন্ধ করে আলোর প্রতীক্ষা করছে। একটা খরগোশ ভয় পেয়ে আমার পায়ের কাছ দিয়ে ছুটে গেলো। ছুটতে ছুটতে গিয়ে দূরে একটা ঢিবির গর্তে ঢুকে পড়ল······মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালাম। তারপর সম্বিত ফিরে পেয়ে আবার এগিয়ে চললাম।

সামনেই মোড়ে বরগিদের গাছ, ঘুটঘুটে অন্ধকার······ঘন কালো সে অন্ধকারের কূলকিনারা নেই যেন।

বরগিদের গাছ ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতেই সামনে সেই বালুচর চোখে পড়ল। এখানে-ওখানে সান্ত্রী পাহারা দিচ্ছে।

এখন এসেছো তোমরা, নিরাপত্তা-রক্ষাকারীর দল? সে-সময় কোথায় ছিলে, যখন প্রাণ বাঁচানোর জন্যে কেঁদে কেঁদে তোমাদের ডাকাডাকি করছিল সবাই?

সান্ত্রী চীৎকার করে উঠল, 'হল্ট্!'

আমি দাঁড়ালাম।

সান্ত্রী কাছে এসে আমাকে ভাল করে দেখল। কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি?'

'হিন্দু।'

'এখানে কেন এসেছো?'

আমার মুখ থেকে আপনা-আপনিই বেরিয়ে এলো, 'বন্দুক ফেলে গেছি। সেটা নিতে এসেছি।'

সান্ত্রী খুশী হয়ে বলল, 'যাও, খুঁজে নাও।'

আমি বালুচরের দিকে এগিয়ে গেলাম।

আমার চারপাশে শুধু মৃতদেহ আর মৃতদেহ। বৃদ্ধের মৃতদেহ, যুবকের মৃতদেহ, স্ত্রীলোকের মৃতদেহ। কোনটা উপুড় হয়ে আছে, কোনটা চিত হয়ে, কোনটা কুঁকড়ে। কেউ উলঙ্গ, কারো হাত মোচড়ানো। কারোর চোখ খোলা, কারোর চোখ বন্ধ। কারোর হাতে দুধের বোতল, কেউ বা জীবনের সমস্ত হলাহল পান করে চিরনিদ্রায় শায়িত।

দূরে কোথায় একটা শিশু কাঁদছে।

আমার পা আপনা থেকেই সেই শিশুটির আওয়াজ লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল। উঠে পড়ে, মৃতদেহগুলো লাফ মেরে ডিঙিয়ে, কোনো কোনোটাকে পায়ে মাড়িয়ে সেখানে পৌঁছে দেখলাম, চারদিকে মৃতদেহের স্তূপ। সেই স্তূপের মধ্যে একটি শিশু দু'হাতে চোখ ঢেকে কাঁদছে। বলছে, 'আব্বা···আব্বা···আব্বা, আমার খিদে পেয়েছে···আব্বা গো···'

তার আব্বা শিশুটির কাছেই মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। বুকের সাদা লোম-গুলোর মধ্যে বর্শার এক গভীর ক্ষত—একটা গভীর কালো ক্ষত···ক্ষতের চারপাশে বুকের ওপর জমাট-বাঁধা রক্ত—মানুষের ঘৃণার মতো।

আমি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কাঁদতে থাকা শিশুটিকে চুপচাপ দেখতে থাকলাম। কাঁদতে কাঁদতে সেও দেখছিল আমায়। তারপর এক সময় চুপ করল। একজন আরেকজনের দিকে দেখতে লাগলাম আমরা। আমাদের মধ্যে অজানা-অচেনা অপরিচিত মৃতদেহের স্তূপ। দুজনের মধ্যে কত দুস্তর ব্যবধান, কত গভীর সমুদ্র, কত উঁচু অবরোধ। আমরা দুজনে যেন পরস্পরকে বুঝতে না পেরে বিস্মিত হয়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে দেখছিলাম।

শিশুটি আমার দিকে তাকাল। তারপর তার চারপাশের মৃতদেহগুলিকে দেখল। কিন্তু যখন তার ছোট্ট বুদ্ধিতে কিছুতেই কুলিয়ে উঠল না, ব্যাপারটা কি, তখন সে তার ছোট্ট বুড়ো আঙুলটা মুখে পুরে আস্তে আস্তে চুষতে শুরু করল।

আঙুল চুষতে চুষতে আবার সে চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল। তার সরল নিষ্পাপ চোখের দৃষ্টি যেন আমার হৃদয়তন্ত্রী স্পর্শ করল। রাতের স্তব্ধতার অনু-পরমাণু যেন কথা কয়ে উঠল। চীৎকার করে করে নালিশ জানাতে লাগল। সপ্ত সমুদ্র, সপ্ত সভ্যতা, সপ্ত অবরোধ, সপ্ত ঘৃণা—সমস্ত পদ-দলিত করে ডিঙিয়ে সেই শিশুটির ক্ষুধিত পীড়িত আত্মা এসে যেন আমার হৃদয়ে মিশে একাকার হয়ে গেলো, সে যেন আমার হৃদয়েরই অংশ ছিল চিরকাল। আপনা থেকেই আমার হাত শিশুটির দিকে এগিয়ে গেলো। মৃতদেহের স্তূপ থেকে তাকে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। কাঁদতে কাঁদতে তার মুখে চুমো খেতে লাগলাম। মুসলমান শিশুটি যখন ফোঁপাতে ফোঁপাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরল, তার আদুরে ছোট্ট ছোট্ট হাত দুখানার স্পর্শ লাগল আমার বুকে, তখন মনে হলো, আমার সমস্ত প্রতিশোধস্পৃহার আগুন নিভে গেছে। আমার হৃদয়ের সমস্ত দুঃখ দূর হয়ে যাচ্ছে, সমস্ত ঘৃণা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাচ্ছে, আমার প্রাণের সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা মিটে যাচ্ছে, তৎক্ষণাৎ মনে হলো, আমার মৃত সন্তান যেন আবার ফিরে এসেছে আমার কাছে।

আমি শিশুটিকে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারদিকে চেয়ে দেখছিলাম। আমার চারদিকে শুধু মৃতদেহ আর মৃতদেহ।

আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম, কিসের জন্যে আমরা এমন মাথা তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছি? কিসের জন্যে আমরা আমাদের উন্নত সভ্যতার ঢাক পিটোচ্ছি? আমাদের ঘাড়ে অপরাধের বোঝা কি কম? এই অপরিণত অসম্পূর্ণ সভ্যতা নিজের অভ্যন্তরে কতো গভীর অন্ধকার লুকিয়ে রেখেছে! হিন্দু সভ্যতা, মুসলিম সভ্যতা, খ্রীষ্টীয় সভ্যতা, শিখ সভ্যতা, ইউরোপীয় সভ্যতা, এশীয় সভ্যতা— এইসব চাকচিক্যময় সভ্যতার ভেতরে কতো গভীর খানাখন্দ, কতো ভয়ঙ্কর অন্ধকার প্রচ্ছন্ন রয়েছে। কিন্তু যারা এই সভ্যতার ঢাকঢোল পিটোচ্ছে দিনরাত্তির, তারা সে কথা বলে না। ওরা যে কথা বলে, সে বড় গৌরবের কথা, জাঁকজমকের কথা। কিন্তু কেউ যদি সাহস করে এইসব সভ্যতার বর্ণাঢ্য পোশাক খুলে দেখতে চায়, তবে তাকে বিশ্বাসঘাতক বলে হত্যা করা হয়, কিংবা তার পিঠে আমূল বর্শা বিদ্ধ করা হয়।

কিন্তু এখন আমার আর কোনো ভয় নেই। মৃতদেহের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ মনে হলো, এখন কিছুরই ভয় নেই আমার। যেন অনেক আগেই আমি আমার মাথা কেটে ফেলেছি। প্রকাশ্য দিবালোকে অত্যাচার-নিপীড়ন দেখে আজ আর অবাক হইনে আমি। নিজেদের দুরুদুরু ভয়ের আড়ালে বিষ-মাখা ছুরি লুকিয়ে রাখে যারা, তাদের সাড়া-শব্দ আমার কানকে ঠকাতে পারে না। এখন আমি আর কারোর পাপের ভাগীদার হতে চাইনে। মৃতদেহের ওপর হাঁটতে হাঁটতে যখন আমি আমার সমাজের আদর্শকে তন্নতন্ন করে বিচার-বিশ্লেষণ করছিলাম, তখন আমার হাতের মুঠো থেকে সমস্ত বালি ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ল, সমস্ত হলুদ পাতা হাওয়ায় ফরফর করে উড়ে গেলো। মুসলমান ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আমি আমার সনাতন প্রথা আর পুরনো সংস্কারের আবর্জনার স্তূপে আগুন লাগিয়ে দিলাম। হাঁটতে হাঁটতে মনে হলো, এখন আমি যথেষ্ট স্বস্তি বোধ করছি, কেউ আর আমাকে বিপথগামী করতে পারবে না। কারণ আমি মাথা-কাটা এক মানুষ, যে কিনা শুধু একটি সবুজ পাতার সন্ধান পেয়েছে।

ফিরে আসতেই আবার সেই সান্ত্রীর পাল্লায় পড়লাম। বললাম, 'বন্দুকটা পেলাম না।'

'ছেলেটিকে তুমি নিয়ে যাচ্ছো কেন?' সান্ত্রীটা জিজ্ঞেস করল। তার স্বর বেশ তিক্ত ও রুক্ষ, যেন আমার এরকম আচরণ তার পছন্দ নয়।

বললাম, 'ও বেঁচে আছে।'

'বেঁচে থাকুক আর মরে যাক, ওকে নিয়ে যাওয়ার অধিকার নেই তোমার। ওখানেই রেখে দাও ওকে।'

আমি চোখ টিপে বললাম, 'কিন্তু আমি ওকে মেরে ফেলতে চাই। এটা তো কেউটের বাচ্চা। বেঁচেই-বা থাকে কেন!'

সান্ত্রীর মুখে সন্দেহ ও সংশয় দেখা গেলো। থেমে থেমে বলল, 'তুমি সত্যি

সত্যি ওকে মেরে ফেলবে তো ?'

'মেরে ফেলব মানে ? ওকে টুকরো টুকরো করে, ওর দুই পা ধরে একেবারে ফেড়ে নদীতে ভাসিয়ে দেবো !'

সান্ত্রীটার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। একটু থেমে বলল, 'আচ্ছা' নিয়ে যেতে পারো ওকে।'

ছেলেটি চীৎকার করে কাঁদতে লাগল। দ্রুত পায়ে আমি হাঁটতে লাগলাম। হঠাৎ সান্ত্রীটা পেছন থেকে চীৎকার করে উঠল, 'থামো !' কিন্তু আমি যেন শুনতে পেলাম না কিছুই। জোরে ছুটতে শুরু করলাম। হঠাৎ একটা গুলি এসে আমার পায়ে লেগে ধুলো উড়িয়ে চলে গেলো। কিন্তু ছুটতেই থাকলাম আমি। ছুটতে ছুটতে নিজেকে একটা ঢিবির আড়ালে লুকিয়ে ফেললাম, পা দেখলাম। রক্তে ভেসে যাচ্ছে পা।

রাবী নদীর ওপর সকাল হলো।

ছেলেটিকে কোলে নিয়ে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম।

এখন তুই কোথায় যাবি বীজনাথ ? অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা, ঘৃণা আর গোঁড়ামীর যে-ঝঞ্ঝা থেকে বাঁচবার জন্যে এক জায়গা থেকে পালিয়ে এসেছিস, সে সব তো এখানেও রয়েছে ! ওই দু'টি সভ্যতার কাছেই তুই এখন বিশ্বাসঘাতক ! ওদের হাত থেকে পালিয়ে কোথায় যাবি তুই ? এখন তোর ঠাঁই না হিন্দুস্তানে, না পাকিস্তানে, বিশেষ করে দুটো দেশেই তুই এখন ঘৃণার পাত্র। মনুষ্যত্বহীন নির্জন ও বিধ্বস্ত এই পৃথিবীতে, এই শিশুকে নিয়ে তুই কোথায় আস্তানা গাড়বি ? এসব আদর্শ ও কাল্পনিক চিন্তা-ভাবনার কথা ভুলে যা, শিশুটিকে ছুঁড়ে ফেলে দে নদীর স্রোতে, তারপর ফিরে যা নিজের বাড়িতে, নিজের পরিবারের মধ্যে। ফিরে যা নিজের জাতি, দেশ, সমাজ এবং সেই সমাজের সভ্যতার মধ্যে। সে-দেশ এখন আর তোর দেশ নয়, এই দেশই এখন তোর দেশ।

কিন্তু হায়, কি করে বলি সে কথা ! সে-দেশের মাটির প্রতিটি ধূলিকণা হীরকের মতো মনের গহনে জ্বলছে। কি করে বলি, শুধু এই দেশটাই আমার যেখানে সবকিছু অপরিচিত ! রাবীর এ-কূলের সঙ্গে ও-কূলের কোনো পার্থক্যই তো আমার চোখে পড়ছে না। নদীর দুই তীরেই বালির স্তূপ ; দুই তীরেই ছড়ানো মৃতদেহ, মাঝখানে বয়ে চলেছে সেই রাবীর জল—এই পৃথিবীর বুকে হিন্দু ও মুসলমানের আসার আগেও যেমন বয়ে যেতো, ঠিক তেমনি।

সেই যুগের কথা আমার মনে পড়ল, যে-যুগ এখনো আসেনি। কিন্তু আসবে। যখন *হিন্দুস্তান থাকা সত্বেও হিন্দুস্তান নয়, পাকিস্তান থাকা সত্বেও* পাকিস্তান নয়, কোনো ইরান নয়, আফগানিস্তান নয়—আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, জাপান, কিছুই নয় ; যখন সারা জগৎটাই পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্যে একটা ছোট্ট গাঁয়ে পরিণত হবে ; সেখানে সমস্ত মানুষ নিজের নিজের পাড়ায়

পরস্পর প্রতিবেশীর মতো প্রেম-ভালোবাসা ও স্বাধীনতার মধ্যে দিয়ে নিবিড় স্বাচ্ছন্দ্যে ও চিরশান্তিতে বসবাস করবে।

ধুত্তেরি, কেন আমি এরকম ভাবছি? কেন এসব চিন্তা করছি? সভ্য-ভব্য, সংস্কৃতিবান, পণ্ডিত ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা যেরকম চিন্তা-ভাবনা করেন, নিজের নিজের দেশ, সম্প্রদায়, সামাজিক রীতিনীতির পরাকাষ্ঠা দেখাবার জন্যে নানা দলে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে, বর্ণ-গোত্র দেশ ও জাতির মতভেদ বুকের গভীরে পোষণ করে যেরকম অনুধ্যান করে থাকেন দিনরাত, আমি সেরকম ভাবছি না কেন?

এ কি ধরনের হৃদয়বিদারী চিন্তা-ভাবনা, প্রাণের বাসনা! বেহালার ছড়ের মতো হৃদয়তন্ত্রীতে প্রাণের জ্বালা অনুরণিত করে তুলছে। আমার মন বারবার বলছে, যে যা বলতে চায় বলুক, কেউ মানতে না চায় না মানুক, সে-দিন আসবেই। আজ আসতে পারে, কাল আসতে পারে, একশো বছর, এক হাজার বছর পরেও আসতে পারে। কিন্তু মানুষ যদি বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি হয়, যদি তার জীবনের কোনো মূল্য থাকে, তার সভ্যতার কোনো উদ্দেশ্য থাকে, তার ভবিষ্যতের সোপান থাকে, তাহলে সে-দিন অবশ্যই আসবে। সেদিন মানুষ প্রাণ দিয়ে নিজেদের সমস্ত অপরিণামদর্শিতার বিরুদ্ধে লড়াই করবে, নিজেদের হিংস্র স্বভাবকে পরাভূত করবে, ষড়যন্ত্রের সমস্ত আবরণ উন্মোচন করে উন্নত ও মহান মানবতার উজ্জ্বল মন্দিরে পদার্পণ করবে।

সে-দিন অবশ্যই আসবে। অবশ্যই আসবে।

আর সেদিনের প্রতীক্ষায় বেঁচে থাকতেই হবে আমাকে। এই শিশুকেও বুক দিয়ে রক্ষা করে বাঁচাতে হবে। বিস্তৃত অন্ধকারে অপস্রিয়মান আলোকরশ্মিকে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে রাখতে হবে, টিকিয়ে রাখতে হবে তাকে। অন্ধকারের আবর্জনায় ঢাকা পড়ে-যাওয়া আলোকরশ্মি নখ দিয়ে খুঁটে খুঁটে বার করতে হবে, তারপর তাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে প্রাণের রক্ষাকবচ তৈরি করতে হবে। ওরা আমাকে দেখে হাসবে, থুথু দেবে, ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে আমার দিক থেকে।

আধা রাস্তা

বছর পনেরো বয়স হবে ওর। বড় জোর পনেরো বছর। ছেলেমানুষ। লাজুক-লাজুক চেহারা। গায়ের রঙ হলদেটে। বড় বড় ক্ষুধাতুর চোখ। এখনো গোঁফের রেখা দেখা দেয়নি। লম্বা ঘাড়ে জায়গায় জায়গায় পুরু হয়ে ময়লা জমে আছে। ময়লার স্তরগুলোর আশেপাশে তার গায়ের আসল ফরসা রঙ উঁকি মারছে। ডুলিটার সামনের দিকে কাঁধ দিয়েছে সে। এত কম বয়সের ছেলেকে ডুলি বইতে দেওয়া উচিত নয়। হাপরের মতো ওর শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে। বুক ওঠা-নামা করছে। ডুলির চৌপল ডাণ্ডার ঘষা খেয়ে-খেয়ে কাঁধের কাছে খয়েরী রঙের পশমী কোট ছিঁড়ে গেছে। ছিঁড়ে গেছে কোটের নীচে জামাটাও। সেখানে তার গায়ের চামড়া ঘষটানিতে ক্রমশ লাল হয়ে উঠছে। কমল ডুলিতে বসে-বসে সব কিছু দেখছিল। তার ডাইনে পাথরের এক দীর্ঘ প্রাচীর রয়েল ওক লজ পর্যন্ত চলে গেছে। বাঁয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে একেবারে নীচে পর্যন্ত ছড়িয়ে-থাকা দেবদারুর গাছ। চারজনে ডুলি বইছে। ডাইনের দেয়ালটা ক্রমশ উঁচু হচ্ছে। হাপরের মতো বুকগুলোর ওঠা-নামা বাড়ছে ক্রমশ। তার ভয় হচ্ছে, শক্ত চৌপল ডাণ্ডায় ছেলেটির কাঁধের হাড়গোড় ভেঙে চুরমার না হয়ে যায়! সে ডুলি থামাতে বলে। রাগে ফেটে পড়ে বেহারাদের ওপর: লজ্জা করে না তোমাদের, এই পনেরো বছরের ছেলেটিকে বলদের মতো ডুলিতে জুড়েছ! তোমরা মানুষ, না জানোয়ার?

ওরা কোনো জবাব দিল না, লজ্জিতও হল না। কমলের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন ওরা কোনো পাগলকে দেখছে। ওদের সর্দার মাঝারি বয়সের শক্ত-সমর্থ লোক, সে কপালের ঘাম মুছে বলল, 'ও গঙ্গারাম, তুই পেছনে চলে যা।'

কমল জিজ্ঞেস করল, 'বলি, পেছনে গেলে কি ওর কাঁধে ডাণ্ডার ঘষা লাগবে না?'

মধ্যবয়স্ক লোকটা বেশ শক্ত গলায় বলল, 'তা তো লাগবেই, হুজুর। কিন্তু আপনার চোখে পড়বে না। আর চোখে না পড়লেই বাবুদের মন ঠিক থাকে। পেছনে চলে যা গঙ্গারাম।'

কমল একটু হকচকিয়ে গেল। কথাটা তো ঠিকই। দারিদ্র চোখে পড়লেই দেখতে খারাপ লাগে, মনটা ভার হয়। বেহারাটা খুব সাধারণভাবেই কথাটা বলেছিল, গলায় বিদ্রূপের সুর ছিল না মোটেই। কিন্তু তার কাছে কথাটা

বিদ্রূপের মতো শোনাল। মুখ-চোখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল তার, যেন কেউ ভৎর্সনা করেছে তাকে। 'দাঁড়াও।···একটা পনেরো বছরের ছেলেকে দিয়ে যে-ডুলি বওয়ানো হয়, আমি সে-ডুলিতে যাব না।'

গঙ্গারাম ক্ষীণ কণ্ঠে বলল 'না হুজুর, আমার বয়েস আঠারো বছর। একটু রোগা-পাতলা চেহারা, তাই আমার গলার আওয়াজ পনেরো বছরের মতো শোনায়।'

'এরই মধ্যে তোর কাঁধ ছড়ে গেছে। একটু পরে তো রক্ত ঝরবে। পেছনে খালি ডুলি আসছে, ওটায় চলে যা তুই।'

গঙ্গারামের চোখ ছলছল করে উঠল। হাত জোড় করে বলল, 'আমায় দয়া করবেন না হুজুর। খালি ডুলি বইলে ফিরতির মজুরিটাই শুধু জুটবে। আপনি যে-ডুলিতে যাচ্ছেন, এ-ডুলি বইলে ওপরে গিয়ে আবার ফিরতির মজুরিও পাব।'

ওর ওই ছোট্ট মুখখানায় বড়-বড় ডাগর চোখ দুটিতে কী বলতে চাইছে? কেন সে তার দিকে অমন করুণ চোখে চেয়ে আছে? কমল পকেট থেকে রুমাল বার করে ওর দিকে বাড়িয়ে দিল, 'নে, এটা ঘাড়ে দে······'

কমল রুমালখানা দিয়ে ডুলিতে পিঠ লাগিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসল। চোখ বুজল সে। আসলে দেখাটাই পাপ। এই পৃথিবীতে চোখ মেলে দেখতে গেলেই রাজ্যের দুঃখ কষ্ট পোয়াতে হয়। ডাইনে পাথরের দেয়াল, বাঁয়ে বিপজ্জনক ঢাল, সামনে গঙ্গারামের ক্ষত-বিক্ষত কাঁধ। যদি তার পেছন ফিরে দেখার ক্ষমতা থাকত, তাহলে সুদীর্ঘ হাজার হাজার বছর ধরে ছড়ানো দারিদ্র আর দুঃখযন্ত্রণা চোখে পড়ত তার। সে-সব থেকে বাঁচার একটাই পথ, কখনো-সখনো একটা রুমাল ছুঁড়ে দাও, তারপর ডুলিতে আরাম করে ঠেস দিয়ে বসে চোখ বুজে চল। কারণ চোখ মেলে দেখাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় পাপ।

ডাইনে যেতে যেতে রাস্তাটা নীল পাথরের খাড়াইয়ের দিকে পেছনে মোড় নিল। অমনি সামনে রয়েল ওক লজের জাঁকজমকপূর্ণ ড্রাইভ চোখে পড়ল। ফটকের দুটো লোহার পাল্লা লজের ভেতরের দিকে ঘোরানো। ফটকের দুপাশে মর্মরের দুই নগ্ন নারীমূর্তির হাতে বিজলী আলোর দুটি শুভ্র বাতি। লজের পেছনে পাহাড় কুয়াশায় ঢাকা। ড্রাইভের স্লেটপাথর আর নুড়িগুলোর ওপর ফোয়ারা থেকে ঝিরঝির করে জল পড়ছে। মর্মরের একটা ছোট্ট জলাশয়ে অজস্র প্রস্ফুটিত পদ্ম। ভিজে স্লেটপাথরের ওপর ভারী পা ফেলে ফেলে বেহারারা তাদের ডুলি লজের বড় বারান্দার সামনে নিয়ে গেল। বারান্দায় বেগম জাবেদ বেতের আরাম-কেদারায় বসে কী একটা বই পড়ছে। সামনে টেবিলের ওপর চায়ের কাপ। টেবিল থেকে বেশ কিছুটা দূরে বেগম জাবেদের পেছনে দরজায় কামিনী রঙের পর্দা টাঙানো। পর্দার ওপারে লজের মধ্যে আলোর বাতি ঝাপসা দেখাচ্ছে। বারান্দায় বেগম জাবেদ ছাড়া আর কেউ নেই। সে চোখ তুলে চেয়েও দেখল না।

কমল ডুলি থেকে নেমে বেহারাদের লজের পুবদিকের বারান্দায় অপেক্ষা করতে

বলল। বেহারারা ডুলি নিয়ে সামনে থেকে চলে গেলে বেগম জাবেদ চোখ তুলে তাকাল। কমল মাথা নীচু করে বলল, 'আদাব আরজ!'

বেগম জাবেদ সম্ভ্রমবোধ বজায় রেখে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। ঢিলেঢালা পায়জামাটা ঠিক করে নিল। তারপর মাথায় সাটিনের ওড়না টেনে দিয়ে হাসি-মুখে জবাব দিল, 'আদাব।'

ধবধবে ফরসা রঙ। মোগল শাহজাদীদের পুরনো ছবিতে প্রায়ই যেমন দেখা যায়, তেমনি ভরাট মোগলাই চেহারা। যদিও কিছুটা স্থূল হয়ে পড়েছে, কিন্তু তার সারা শরীরে মনমাতানো রক্তাভ স্ফটিকের আভা। যখন সে তার গোলাপী চোখ তুলে গভীর দৃষ্টিতে কারো দিকে চায়, তখন তার হৃদয় চঞ্চল হয়ে ওঠে, নিজের অস্তিত্ব ভুলে কয়েক মুহূর্তের জন্যে তাকে ভাবতেই হয়—বেগমের সঙ্গে প্রেম করবে না তার মেয়ের সঙ্গে।

বেগম জাবেদ আবার চেয়ারে বসতে গেলে তার বুক থেকে ওড়না খসে পড়ল। টেবিলের ওপর চায়ের দিকে ডান হাত বাড়াল। সে ফরসা কবজিতে সবুজ চুড়ি রিনঠিন করে উঠল। খুব লজ্জাজড়ানো গলায় বলল, 'চা খাবে?'

কমল জিজ্ঞেস করল, 'শায়েস্তা কোথায়?'

বেগম জাবেদ ভুরু কোঁচকাল, শত শত তীক্ষ্ণ তরবারি ঝলসে উঠল যেন। বলল, 'এখন ওর সঙ্গে দেখা হবে না।'

'কেন? ও তো আজ আমার সঙ্গে সেলিং (sailing) করবে বলেছে। সেজন্যে আমি নীচে থেকে আর-একটা ডুলি নিয়ে এলাম।' কমলের বুকটা জোরে ঢিপঢিপ করতে লাগল।

'শায়েস্তা হয়তো ভুলে গেছে—' বেগম জাবেদের রজতশুভ্র হাসি ছড়িয়ে পড়ল। নিজের কণ্ঠস্বরের ওপর তার আশ্চর্য সংযম, এক-একটি শব্দ যেন রুপোর ঘুঙুরের মতো বেজে উঠছিল।

'এ-বয়সে মেয়েরা প্রায়ই ভুলে যায়।' কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়ার জন্যে বলল সে। তারপর নিজেই কমলের দিকে একটু ঝুঁকল। আতরের গন্ধ ছড়াচ্ছিল।

কমল জিজ্ঞেস করল, 'কী আতর?'

'আতর নয়। প্রসাধনের খোশবু। পুরনো মোগল আমলের একটি প্রসাধন। দীর্ঘকাল থেকে আমাদের বংশে চলে আসছে। এটা তৈরি করার নিয়ম আমরা কাউকে বলিনে। কারণ এই প্রসাধনে আমাদের বংশের সৌরভ মিশিয়ে আছে। আর বলবই বা কেন! এখন তো এই খোশবুটুকুই রয়েছে, বাকি সবই চলে গেছে।' তার কণ্ঠস্বরে কিছুটা বিষণ্ণতা ঝরে পড়লো। তারপর সে আবার জিজ্ঞেস করল, 'আমার সঙ্গে চা খাবে না?'

'না।' কমল স্পষ্ট জবাব দিল। যেন কথাটা চা নিয়ে নয়, অন্য কিছু নিয়ে, যাতে তার আদৌ সম্মতি নেই।

প্রথমে বেগম জাবেদ একটু ঠোঁট কামড়াল। মুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে। তারপর বেশ খোলামেলা গলায় বলল, 'তোমার এরকম স্পষ্ট কথাবার্তা আমার খুব ভালো লাগে।'

কমল আবার জিজ্ঞেস করল, 'শায়েস্তা কোথায় ?'

'বললাম না, ও তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। বিশেষ করে এ সময়।'

'আর যদি আমি এই ঠাণ্ডা চা খাই আপনার সঙ্গে ?'

'তবু দেখা হবে না।' জোরে হেসে উঠল সে। তার হাত, পা, ভুরু, চোখ, ঠোঁট—সবকিছু মিলে যেন কয়েকটি তরল ছবি তৈরি হল কমলের সামনে। সত্যি, মাঝে মাঝে বোঝা দুষ্কর হয়ে ওঠে, মা আর মেয়ের মধ্যে কে বেশি সুন্দরী।

'কেন, শায়েস্তা কি বাড়িতে নেই ? না, আপনি নিষেধ করে দিয়েছেন ওকে ?'

'শায়েস্তা বাড়িতেই আছে। আর আমি ওকে নিষেধও করিনি।'

কমল বিস্মিত চোখে বেগম জাবেদের দিকে চেয়ে রইল।

বেগম জাবেদ বলল, 'অসুস্থও নয়। তোমার ওপর রাগও করেনি।'

'তাহলে ব্যাপারটা কী ?'

'তুমি নিজেই ফোন করে জিজ্ঞেস করো না কেন ?' বেগম জাবেদের কাশ্মিরী আপেলের মতো গালে এক উজ্জ্বল আভা ছড়িয়ে পড়ল। তিনটি সন্তানের মা হয়েও এই মহিলাটিকে এখনো সুন্দরী যুবতী দেখায়! বয়স পঁয়তাল্লিশের কম হবে না কিছুতেই। বড় ছেলে শাহিদেরই বয়স পঁচিশ। ছোট ছেলে ইরফানের বয়স বাইশ। শায়েস্তার বয়স নিশ্চয়ই কুড়ি হবে। এই থেকেই বেগম জাবেদের বয়সটা মালুম হয়ে যায়। কিন্তু সে শুধু বয়সের হিসেবেই। নইলে দেখতে মধ্য-তিরিশের যুবতী বলেই মনে হয় তাকে।

টেবিলের ওপর ফোন ছিল। বেগম জাবেদ কমলের দিকে ঠেলে দিল সেটা। কমল ফোনের দিকে হাত বাড়াতেই দুজনের হাতে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেল। বেগম জাবেদের সারা মুখ লাল হয়ে উঠল। কমল শায়েস্তাকে তার স্টুডিওতে ফোন করতে লাগল। রয়েল ওক লজের এলাকাতেই পাহাড়ের ওপর স্টুডিওটা তৈরি করিয়েছে শায়েস্তা। সে তার মাকে বলেছিল, 'রয়েল ওকে ভীষণ লোকজন আসে দেখা করতে। আমার কাজ করা হয়ে ওঠে না।'

'হ্যালো শায়েস্তা, কী করছ ?'

'খুব ব্যস্ত আছি।' চপল কণ্ঠস্বরে জবাব এল ওদিক থেকে।

'কিরকম ব্যস্ত ?'

'একটা ন্যুড শুরু করেছি।'

'ন্যুড ?' কমল বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'নৈনিতালে ন্যুডের মডেল পেলে কোথায় ?'

'পেয়ে গেছি। সামনেই বসে আছে।'

'কে ?'

'খুব সুন্দরী একটা মেয়ে।'

'কিন্তু কে সে?'

'কে হতে পারে ভেবে দ্যাখো না!'

'আমি চিনি ওকে?'

'ইয়াট ক্লাবে ওর সঙ্গে রোজ দেখা হয় তোমার।'

রিসিভার থেকে চোখ সরিয়ে কমল বেগম জাবেদের দিকে তাকাল। বেগম জাবেদ বড় মজা করে মিটিমিটি হাসছে। নিজের নখের পালিশ দেখতেই সে যেন ব্যস্ত।

'ও কি সাবিত্রী?'

'আচ্ছা?' ওদিকে শায়েস্তা খুব জোরে হেসে উঠল, 'সাবিত্রীকে তুমি খুব সুন্দরী মনে কর! তোমার পছন্দটা ধরা পড়ে গেছে এবার।'

'অনাবিলা?'

'সেই তালগাছের মতো ঢ্যাঙা অখাদ্য মেয়েটি! কমল, তোমার আক্কেলটা গেছে দেখছি!' শায়েস্তা চটে গিয়ে বলল।

'ঠিক আছে, আমার হার, তোমারই জিত!' কমল তার যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিয়ে বলল, 'এখন বলো তো মেয়েটি কে?'

'তোমাদের হিন্দুদের মধ্যে এই একটা বদস্বভাব, খুব তাড়াতাড়ি অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দাও!' শায়েস্তা কমলকে রাগাবার চেষ্টা করল, 'আর একবার চেষ্টা করে দেখো না?'

'তুমি ভুল বুঝেছ, শায়েস্তা। হিন্দুরা কখনো অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দেয় না, ফেলে দেওয়ার ভান করে। পৃথিবীটাই হিন্দুদের ভুল বুঝেছে। হাতের মুঠোয় স্পঞ্জ নিয়ে চাপ দিয়ে দেখছ কখনো? চাপ দিলে চিপসে যায়, চিপসেই যেতে থাকে। যতক্ষণ মুঠোয় চেপে থাক, চাপা থাকবে। দুমড়ে-মুচড়ে এতটুকু হয়ে। কিন্তু মুঠি খুললেই দেখবে আবার আস্ত অটুট অবস্থায় বেরিয়ে আসবে, ঠিক আগের মতন। হ্যাঁ?'

'কিন্তু মুঠি খোলা হবে কেন?'

'মুঠি তো কখনো না কখনো খুলতেই হবে।...আচ্ছা, ও কি জামিলা?'

'ওর চেহারা দেখেছ? ওর বত্রিশটে দাঁত? তুমি ভীষণ বাজে ঠাট্টা-তামাশা করতে শুরু করেছ কমল।'

'ন্যুডে চেহারায় আর কী আসে যায়! ঘাড় থেকে নীচে পর্যন্ত ঠিক থাকলেই তো হল!'

'আজ্ঞে না মশাই।' শায়েস্তা দৃপ্তকণ্ঠে বলে উঠল, 'আমি ন্যুড-চিত্রণে শুধু টর্‌সো-তে বিশ্বাসী নই। এ-ব্যাপারে আমি ইউরোপীয় চিত্রশিল্পীদের মতের বিরোধী। আমার মতে একটি ভালো ন্যুড চিত্রে শরীরের মতো চেহারাটাও সমান জরুরী। শরীরে কাঠামোর পারম্পর্য আর বৈষম্য যেটা চোখে পড়ে, চেহারায়

এসে সেটা পূর্ণতা লাভ করে। ইউরোপীয় চিত্রশিল্পীরা যখন ন্যুড-চিত্র আঁকেন, তখন চেহারাটাকে তাঁরা নেহাত ফালতু হিসেবেই এঁকে দেন, কিংবা একেবারেই বেপাত্তা করে দেন। তাতে ন্যুড-চিত্রটা দেখায় ঠিক যেন গাছের ওপরের অংশটা কেটে ফেলা হয়েছে, মাটি থেকে শেকড় উপড়ে ফেলা হয়েছে। চেহারা ছাড়া ন্যুড-চিত্রে ব্যক্তিত্ব কিভাবে ফুটে উঠতে পারে! আর চেহারাতেও এটা অবশ্যই স্পষ্ট হওয়া দরকার, যাতে মনে হয়, শরীরে যে-কাঠামো রয়েছে, নকশা রয়েছে, চেহারা তারই অবিচ্ছেদ্য অংশ, যেন সেই শরীরেরই বিকশিত ফুল।'

কমল শায়েস্তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আমি সেই ন্যুড দেখতে পারি কি?'

'তোমার উদ্দেশ্য কী? মডেল, না পেন্টিং?'

'দুটোই।'

'তাহলে ওপরে এসে দেখো। কিন্তু মিনিট দশেক পরে—' এ-কথা বলে শায়েস্তা ফোন রেখে দিল।

কমল ফোনের রিসিভার রেখে বেগম জাবেদকে বলল, 'দশ মিনিট পরে যেতে বলেছে। ততক্ষণ চা-টুকু খেয়ে নিই।'

'আমি আগেই সে পরামর্শ দিয়েছিলাম।' বেগম জাবেদ কিছুটা অসন্তুষ্ট গলায় বলল। যেন বলতে চাইছে, এখন তুমি যে চা খাচ্ছো, সেটা কেবল সময় কাটাবার জন্যে। শুধু ঘড়ির কাঁটা ঘোরাবার জন্যে, মনের চঞ্চলতা লুকোবার জন্যে, তার ওপর একটা আবরণ টেনে দেবার জন্যে।

কমল স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। কিন্তু স্তব্ধতার মধ্যেও টেলিপ্যাথি হতে থাকে, স্তব্ধতারও যে একটা ভাষা রয়েছে, তার মধ্যে ভাবনার যে স্রোত বয়, সেটা ধীরে ধীরে বেগম জাবেদের দিকে সরে গিয়ে যেন বলছে, 'আপনি ঠিকই বলেছেন বেগম জাবেদ। আপনার রাগ করাটা মোটেই অযৌক্তিক নয়। কারণ আপনি এখনও মারাত্মক সুন্দরী। বিশেষ এক শ্রেণীর রসিকের কাছে আপনি তো শায়েস্তার চেয়েও বেশি সুন্দরী। আমি ক্লাবের মধ্যে প্রায়ই তাদেরকে আপনার পরেই শায়েস্তার ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে শুনেছি। দুজনকে তুলনা করতেও দেখেছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোকেরা আপনাকেই বেশি নম্বর দিয়ে থাকে। হয়তো ওরা আমার চেয়ে বেশি সাবালক, বেশি অভিজ্ঞ—বেশি সমঝদার। হতে পারে সেটা। কিন্তু আমার নিজস্ব এক সকরুণ দর্শন রয়েছে। ছায়াঘন মহীয়ান পুরনো গাছ আমার খুব পছন্দ, পছন্দ মাটি থেকে সদ্য উদ্গত ছোট ছোট নতুন চারাগাছ, সবুজ মসৃণ পাতাগুলো কেমন হাওয়ায় ঝিরঝির করে, কিন্তু সদ্য-ফলসম্ভবা গাছের সৌন্দর্যের নেশা অন্যরকম। আর এটাকে নেশাই বা বলি কেন। বরং বলতে পারি, নেশার অরুণোদয়, উদ্গত রসের প্রথম ধারা। জীবন যখন দেউলিয়া হয়ে যায় তখন নিত্য-নতুন অনুসন্ধানের মধ্যেই সে এক নতুন আশ্রয় খুঁজে পায়। কিন্তু আপনি তো গভীরতম উপলব্ধির সোনালী অপরাহ্ন। কেউ আপনার কাছে নতুন নয়, আপনিও কারোর কাছেই নতুন নন। যেমন

নবোদিত সূর্যকে মন্দ বলব না, তেমনি মন্দ বলব না অপরাহ্ণের মিষ্টি মধুর পেলবতাকে…দুটির মধ্যে তফাতটাই শুধু বললাম। জানিনে আপনি আদৌ বুঝতে পারবেন কি-না!'

'খুব বুঝি।' বেগম জাবেদ তার রসাল ঠোঁটে যেন বিদ্রূপের হাসি টেনে নীরবে বলছে, 'কিন্তু তুমি এখনো শিশু। জীবনের কতটুকুই বা দেখেছ? আস্ত নির্বোধ তুমি! রূপের লিনিয়ার ডাইমেনসনের জন্যে প্রাণ দিতে চাও, কিন্তু তার গভীরতা ছাখোনি। যখন সেটা নজরে পড়বে, তখন বুঝতে পারবে, বড় দেরি হয়ে গেছে।'

চায়ের কাপ ভর্তি হয়। চলকে-ওঠা চায়ের কাপের মতো বেগম জাবেদের কানে রিং দুটো দুলতে থাকে। হাতের সবুজ চুড়ি রিনঠিন করে বেজে উঠে যেন স্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দেয়। চায়ের কাপ ওঠাতে গিয়ে কমলের আঙুলে বেগমের আঙুল ছুঁয়ে যায়। তার আঙুল থেকে যেন এক বিদ্যুৎ-তরঙ্গ এসে কমলকে শিহরিত করে। সময়টা কোনোরকমে কেটে যায়, নইলে একটা দারুণ দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারতো।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে কমলের মনে হচ্ছিল, যেন সে চা খাচ্ছে না, তরল ডিনামাইট গলাধঃকরণ করছে। বেগম জাবেদের চেয়ারটা একটু কাছে সরে এল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ফোন বেজে উঠল—বেগম জাবেদ রিসিভার তুলে কানে লাগাল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল কমল, তাড়াতাড়ি চা-টুকু শেষ করে কেটে পড়া উচিত। ইয়াট ক্লাবের নির্লজ্জ, বিরক্তিকর বাক্যবাগীশ রাজকুমার নগরম তার খোশামুদে গলায় বেগম জাবেদের সৌন্দর্যের স্তুতিপাঠ করছে। বেগম জাবেদ তাকে আদৌ পছন্দ করে না, কিন্তু সে তার স্তুতি দুগ্ধ-ক্ষুধার্ত বিড়ালের মতো চুকচুক করে পান করছে যেন।

চলো, এই সময় কেটে পড়া যাক—

সে তাড়াতাড়ি চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বেগম জাবেদের কানে তখনো রিসিভার। কমল তাকে ইশারায় বলল যে সে ওপরে স্টুডিও-তে শায়েস্তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। বেগম জাবেদ আস্তে মাথা নাড়লো। কমল বারান্দা থেকে নেমে এল। ঘুরে পাহাড়ে উঠতে লাগল সে। স্টুডিওর দরজার কাছে পৌঁছে কপাটে আস্তে ঠেলা দিল। দরজা একটু ফাঁক হতেই সে ভেতরে প্রবেশ করল। একটা ছোট্ট লাউঞ্জ। সবকিছু অগোছালো। হ্যাঙ্গারে শায়েস্তার একটা রেনকোট এবং নীল রঙের একটা স্কার্ফ ঝুলছে। দেয়ালের রঙ গাঢ় হলুদ। এক কোণে কাঠের কর্ণার-টেবল। তার ওপর সবুজ রঙের কাঠের পটল রয়েছে। শায়েস্তাই তৈরি করেছে ওটা। উড-ওয়ার্কের ওপরেও ঝোঁক রয়েছে তার। কাঠের তৈরি পেঁচার ঠোঁটে একটি রঙ দেওয়া ব্রাশ। সেটাও সে নিজেই তৈরি করেছে। এই কাঠের পেঁচাটি প্রাচীন শিল্পকলার এক নিদর্শন…

তাহলে শ্রেষ্ঠ শিল্পকলার নিদর্শন কি?

শায়েস্তা মুখে কাঠের ব্রাশ কামড়ে ধরে কমলের কাছে দাঁড়িয়েই তাকে তীক্ষ্ণ

দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। কমল হাততালি দিয়ে বলল, 'আমারও শ্রেষ্ঠ শিল্প-নিদর্শন হওয়ার অধিকার আছে।' একটু থেমে সে আবার বলল, 'কিন্তু একটা শর্ত··· ।'

'কী শর্ত ?'

'তুমি নিজের ঠোঁটে কাঠের ব্রাশের বদলে আমার ঠোঁট দুটো নাও।'

সঙ্গে সঙ্গে শায়েস্তা রঙের বাটি ছুঁড়ল কমলের দিকে। অমনি কমলের জামা আধুনিক শিল্পকলার এক অসামান্য চিত্রে পরিণত হল। কমল ধমক দিয়ে বলল, 'তোমার আর্টের সলো-এগজিবিশনে একদিন কিন্তু আমি এই জামাটাও টাঙিয়ে দেব, দেখ।'

লাউঞ্জ থেকে কমল সোজা বড় স্টুডিওর মধ্যে চলে গেল। শায়েস্তা তার হালকা সোনালী আভা ছড়ানো খয়েরী চুলে ঝটকা দিয়ে একটা উঁচু টুলে বসে পড়ল। তার ডান দিকে মানুষ-সমান বড় আয়না। বাঁ-দিকে ইজেল। ঘরে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি ছিল না।

কমল ছুটতে ছুটতেই জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় তোমার সেই চমৎকার মডেল ?'

শায়েস্তা খুব গম্ভীর গলায় বলল, 'আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখ।'

কমল কাঁধ ঝাঁকিয়ে, তারপর যেন একেবারে হতোদ্যম হয়ে পড়ল। হতাশ-কণ্ঠে বলল, 'আমার বোঝা উচিত ছিল, একটা সুন্দরী মেয়ে নিজেকে ছাড়া পৃথিবীতে আর কাউকেই সুন্দরী বলে মনে করে না। তাহলে, মানে, তুমি নিজেই নিজের মডেল—নিজেই নিজের ছবি—আয়নায় যেমন দেখছ, ইজেলেও তেমনি তুলির টান দিচ্ছ ! দেখি তোমার মুড কেমন !' কমল ইজেল-ঢাকা কাপড়টা সরিয়ে দিতে গেল, কিন্তু শায়েস্তা হাত নেড়ে নিষেধ করল তাকে।

দুই

কমল শায়েস্তার খয়েরী চোখে চোখ রেখে বলল, 'কেন ?'

শায়েস্তা মাথা নেড়ে বলল, 'এখন দেখতে পাবে না।'

'কিন্তু কেন ? ছবি বই তো নয় !'

'এখনো অসম্পূর্ণ।'

'এই পৃথিবীতে কোন্ বস্তুটাই বা সম্পূর্ণ ? কোন্ অঙ্গীকারই বা পূর্ণ হয়েছে ? কোন্ বাসনা, কোন্ দার্শনিক চিন্তা ভাবনা ? প্রতিটি বস্তু রয়েছে চলমান—সূর্য আর পৃথিবীর সঙ্গে। যেদিন কোনো বস্তু পূর্ণতা লাভ করে, সেদিন তার মৃত্যু। গন্তব্যস্থলে পৌঁছনো মানেই মৃত্যু। সেজন্যে এই ছবিটিকে অসমাপ্তই থাকতে দাও। ছবির ওপর থেকে আচ্ছাদন সরিয়ে নাও।'

'না। এ-ছবি দেখতে পারি শুধু আমি।'

'এ-ছবির আসল কাঠামোটাই তো রয়েছে তোমার। যা আসল, তার আবার নকলের কী দরকার !'

'অসভ্য কথাবার্তা বোলো না।' শায়েস্তার গাল দুটো লাল হয়ে উঠল।

'আরে আরে, লজ্জা পেয়ে গেলে?' কমল আশ্চর্য হয়ে হাসতে লাগল।

'বোকা সেজো না।' শায়েস্তা কিছুটা চটে গিয়ে, কিছুটা কৃত্রিম ক্রোধের ভান করে বলল, 'এ-ছবি দেখতে পারে শুধু আমার স্বামী।'

'সেটা এমন কি আর কঠিন কথা!' কমল মৃদু কণ্ঠে বলল। শায়েস্তা ওর গালে আস্তে একটা চড় দিলো। কমল ওর হাতটা নিজের গালের ওপর চেপে ধরে বলল, 'অন্য গালটা পেতে দেব?'

'খুব অসভ্য হয়েছ!' শায়েস্তা তেপায়া থেকে উঠতে উঠতে বলল, 'এখন তুমি একটু বাইরে যাও তো। আমি কাপড় পালটে নিই! সেলিং-এর জন্যে তৈরি হই।'

কমল শিষ দিতে দিতে বাইরে চলে গেল।

কয়েক মিনিট পরে শায়েস্তা স্টুডিওর বাইরে এল। খয়েরী চোখ, গাঢ় লাল রঙের ঝলমলে উলের ব্লাউজ, মাথায় বর্ণাঢ্য স্কার্ফ। কানে সোনার বড় বড় রিং। একটা হাত বুকের কাছে, অন্য হাত সে কমলের কাঁধে রেখে বড় রহস্যময় কণ্ঠে বলল, 'আমি মনের দিক থেকে না হিন্দু না মুসলমান, একটি মডার্ন মেয়ে। আসলে, মেয়ে বই তো নই।'

কমল তার কথাটা বুঝল। তার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বলল, 'তুমি আমায় ছবিটা দেখাও নি বলে আমি খুশি।

পথের দুপাশে ঘাসের ওপর হলুদ হলুদ ড্যাফোডিল। মাখনের মতো কোমল সুরাপাত্র যেন। কোথাও কোথাও শিশুদের মতো খিল খিল করে হাসছে হাই-ড্রেঞ্জার ফুল। তা ছাড়া ফুলগুলোর একটা বাঁকা সারি দেবদারু গাছগুলোর দিকে যেতে যেতে হঠাৎ মোড় নিয়ে যেন নীচে চলে গেছে। রৌদ্রচ্ছায়ার মর্মর পাথরের জাফরিতে নীচে রয়েল ওক লজের সরোবর ফুলে গা-ঢাকা দিয়ে ঘুমিয়ে আছে যেন। কত নীরব, কত শান্ত! কিরকম স্বপ্নিল দৃশ্য! দুজনে পাশাপাশি হাঁটছে। যেন দুজন নয়, একজন। যেন এমন একজন যার চারটি পা আর চারটি হাত। কোন আশ্চর্য ছবি। স্রষ্টা বড় ভুল করে যেন দুজন তৈরি করে ফেলেছে, কিন্তু যদি একজনকেই তৈরি করত, একজনের মধ্যেই স্ত্রী আর পুরুষ উভয়ই—আপনাতে আপনি পূর্ণ, স্বতঃস্ফূর্ত—যেন নিজেই সূর্য নিজেই নক্ষত্র, নিজেরই চারপাশে পরিক্রমণরত, কত দুঃখ-দুর্দশা থেকেই না এই পৃথিবী রেহাই পেত! কিন্তু এই যে দুজনকে এক করার বেদনাদায়ক আনন্দ, সেটাই বা কোথা থেকে আসত! সে-যন্ত্রণা ছাড়া জীবন কিরকম হত? কমল ভাবছিল, এই ঠিক আছে, তুমি শায়েস্তা আমি কমল। মাঝখানে কণ্টকাকীর্ণ প্রান্তর। সে আস্তে আস্তে গুনগুন করতে লাগলো, 'কোঈ আব্‌লাহ পা……কোঈ আব্‌লাহ পা—'

শায়েস্তা বলল, 'মনে হচ্ছে তুমি দেওয়ান গালিব পড়ে ফেলেছ, আমি তোমায় যেটা দিয়েছিলাম!'

'হুঁ।'

'কেমন লাগল?'

'কিছু বুঝতে পেরেছি, কিছু পারিনি।'

'যেটা বুঝতে পারোনি, সেটার মূল্য আরো বেশি।'

'হতে পারে। তোমাকেও তো ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি এখনো।'

'সে তো গালিবও বুঝতে পারে না' শায়েস্তা হেসে ফেলল। শায়েস্তার হাসির সঙ্গে কমলের হাসিও যোগ হল। সে-হাসি অর্ধেক-নারী অর্ধেক-পুরুষ কোন এক অজানা পাখির মতো হাওয়ায় ভাসতে লাগল। বেগম জাবেদ চমকে উঠে মাথা তুলে ওপরের দিকে তাকাল। কমল ও শায়েস্তাকে পাহাড় থেকে নীচে নেমে আসতে দেখে রাগে মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল তার। যদিও সে আবেগ-তাড়িত হতে চায় না, তবু বিদ্যুতের ঝটকার মতো রাগে তার শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। কেন সে ভুলে যাচ্ছে, সে শুধু এক নারী নয়, একজন মা! কী নির্বোধ, বেকুব সে কী অবাস্তব চিন্তা-ভাবনা! তার ও কমলের মধ্যে কি কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভব! কিন্তু মনের আবেগ-থরথর এই উত্তেজনা কী করে দমন করবে সে! হঠাৎ আড়ষ্ট দেহে সে বরফের একটা চাঙড়ের মতো বসে পড়ল। শরীর একটা বিশাল বোঝার মতো মনে হচ্ছে। ঠিক দেখে ফেলবে ওরা। হয়তো ব্যাপারটা আঁচ করে নেবে। কিন্তু কী বোকামি! ওরা তো নিজেদেরই রূপ আর যৌবনের মত্ততায় বিভোর।...এগিয়ে আসছে ওর দিকেই... খুশিতে ডগমগ, আত্মহারা...গুলি করে মারা উচিত দুজনকেই।

তৎক্ষণাৎ বেগম জাবেদ চেয়ার ছেড়ে উঠে ভেতরে পালিয়ে গেল। শায়েস্তা পেছন থেকে 'মাম্মী, মাম্মী' বলে তাকে ডাকতেই থাকল। তারপর আশ্চর্য হয়ে ভুরু কুঁচকে সে কমলের দিকে চেয়ে রইল। কমলের মুখে মৃদু হাসি।

শায়েস্তা কাঁধ ঝাঁকিয়ে কিছুটা চিন্তিত কণ্ঠে বলল, 'মাঝে মাঝে আমি মাম্মীকে বুঝতেই পারিনে।' কমল তার হাত ধরে ডুলির দিকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল, 'চলো, সেলিং-এর দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

সেই পাণ্ডুরমুখ যয়তুন রঙের ছেলেটি আবার কমলের ডুলির সামনের দিকে কাঁধ দিয়েছে। রুমালের ওপর একটা লাল দাগ যেন ক্রমশ ফুটে উঠেছে। কিন্তু ছেলেটি এখন দ্রুত পায়ে ঢাল বেয়ে ছুটে চলেছে। পথ ক্রমশ ঢালু বলে ডুলির প্রায় সমস্ত বোঝাটাই সামনের দিকে। কমলের ইচ্ছে হচ্ছিল ওকে পেছনের দিকে চলে যেতে বলে। কিন্তু ছেলেটির ফূর্তি দেখে চুপ করে গেল সে। ছেলেটি বারবার চেষ্টা করে কমলের ডুলিটা শায়েস্তার ডুলির সামনের দিকে নিয়ে আসে। সামনা-সামনি হয়ে কমল আর শায়েস্তা পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসতে থাকে, যেন চাঁদ আর সূর্য ঘুরতে ঘুরতে একে অন্যের সামনে চলে এসেছে। দুজনের চোখ হাসছে, নীরব ওষ্ঠাধরে যেন কোন অকথিত কথার আস্বাদ, নাকের ডগায় ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পাহাড়ী সৌরভ ভেসে বেড়াচ্ছে। ওরা দুজন শূন্যে উড্ডীন দুটি

পাল্কিতে চড়ে পরস্পরকে দেখতে দেখতে চলেছে, আর নীচে একটি লাল ছোপ। একটি ছেলে হাঁপাচ্ছে। কমল নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করল, মনোরম কল্পলোকের নীচে বাস্তবতা অত মনোরম হয় না কেন, যে-কাঁধ স্বপ্নের বোঝা তুলে নেয়, সে-কাঁধ ক্ষত-বিক্ষত হয় কেন ?

ইয়াট ক্লাবের দরজায় ডুলি দুটো এসে পৌছলে কমল মানিব্যাগ খুলে ডুলি বেহারাদের পয়সা দিতে শুরু করল। পয়সা দিয়ে ফিরে দাঁড়াতেই সে দেখল ছেলেটি চোখ বন্ধ করে ইয়াট ক্লাবের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে হাঁপাচ্ছে।

কমল জিজ্ঞেস করলো, 'খোকা, তোর নাম কী ?'

ছেলেটি চোখ মেলে কমলের দিকে তাকাল। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'গঙ্গারাম।'

'এ কী কাজ করছিস তুই ? এখন তো তোর পড়াশোনা করার বয়স।'

'হ্যাঁ, সে তো ঠিক কথা বাবু।'

'তাহলে পড়ছিস নে কেন ?'

ছেলেটি চুপ করে রইল।

কমল ওকে পরামর্শ দিল, 'অন্য কোন কাজ কর তুই। এরকম ভারী বোঝা বওয়ার কাজ তোর দ্বারা হবে না।'

'অন্য কী কাজ করব বাবু ?'

কমল এদিক ওদিক অনেক দূর পর্যন্ত লক্ষ্য করল। সামনে ফ্লাইটের মাঠ। মাঠের শেষে ইয়াট ক্লাব। ইয়াট ক্লাবের সামনে নৈনি ঝিল, ওপরে আকাশ। কমল অনেক দূর পর্যন্ত লক্ষ্য করল। কিন্তু ছেলেটির জন্যে কোথাও কোন কাজ চোখে পড়ল না তার। নিরুপায় হয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'তোর বাবা কী করে ?'

'বাবা মারা গেছে ?'

'আর মা ?'

'মা অন্ধ।' ছেলেটি নিঃস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দিল। বলল, 'আর একটা বোন আছে, বছর বারো বয়স—তাছাড়া ডুলি বইলে ভালো পয়সাও পাওয়া যায় বাবু।

কমল ডুলি বওয়ার মজুরি আগেই দিয়ে দিয়েছে ওকে। তবু সে মায়াবশত গঙ্গারামকে আরো দু টাকা দিল। গঙ্গারাম দেয়াল ছেড়ে উঠে বারবার মাথা নীচু করে সালাম করল তাকে। কমল শায়েস্তাকে সঙ্গে নিয়ে ক্লাবের মধ্যে গেল। বারান্দার লোকারণ্যে ওরা দুটি বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে বসে দু গেলাস মার্টিনি নিল। কারণ সেলিং করতে হবে, তার ওপর আজ আবার বাতাসে কনকনে ঠাণ্ডা ভাবটা বেশি। শায়েস্তার ছিপছিপে শরীর ঝিলের ঠাণ্ডা হাওয়ায় বারবার কেঁপে উঠছে। সেজন্যে সে অল্প একটু ব্রাণ্ডিও সঙ্গে নিয়ে নিল। তাতে কমলকেও সঙ্গদান করতে হল। যেহেতু সে পুরুষ, তাই তাকে একটু বেশি ব্রাণ্ডি খেতে হল। তারপর তারা দুজনে তৈরি হয়ে নীচে নেমে গেল। আজকের রেসে তাদের নৌকোর নাম ডেভিড।

কমল ল্যাণ্ডিং স্টেজে দাঁড়িয়ে শায়েস্তার উদ্দেশে বলল, 'আমি ডেভিড,

তুমি বাথশেবা।'

শায়েস্তা কোনো উত্তর দিল না।

তারপর নৌকোয় উঠে পড়ল ওরা। নৌকোর কাছি সামলাতে সামলাতে শায়েস্তা বলল, 'তার মানে, তুমি আমার জন্যে বেইমানিও করতে পার?'

কমল দাঁড় হাতে নিতে নিতে বলল, 'তাতে সন্দেহ আছে নাকি?'

তিন

শায়েস্তা চঞ্চল দৃষ্টিতে চোখ নাচিয়ে কমলের দিকে চেয়ে বলল, 'তাহলে আমাদের এই দেশেও দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে।'

'সেটা কেমন করে?'

'এত শীগগীর ভুলে গেলে? পয়গম্বর ডেভিড বাথশেবার প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে তার স্বামীকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিয়েছিল, তারপর বাথশেবাকে নিজের প্রাসাদে এনে রেখেছিল। সে জন্যে ঈশ্বর তার দেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছিল।'

কমল মাস্তুলের ওপর উড়তে-থাকা বড় পালটার দিকে চেয়ে বলল, 'আমার মনে হয়, আমাদের দেশে রোজই নতুন নতুন পয়গম্বরের জন্ম হচ্ছে, সব সময়ই বেইমানি করে তারা। নইলে এদেশে সব সময় দুর্ভিক্ষ কেন?'

শায়েস্তা পালে হাওয়া লাগানোর জন্য ডানদিক থেকে বাঁয়ে মোড় নিতে নিতে জবাব দিল, 'রেসের দিকে মন দাও। নইলে আমরা কিন্তু পিছিয়ে পড়ব।'

কমল কিছু বলল না। বেশ কিছুক্ষণ তারা দুজনেই নিজেদের পাল-তোলা নৌকো সামলাতে থাকল। তারপর যখন সাদা-ডানাওয়ালা নৌকো দ্রুতগামী বকের মতো ঝিলের জলে ছুটতে শুরু করল, তখন শায়েস্তা একটা সিগারেট ধরিয়ে কমলের মুখে গুঁজে দিল, তারপর নিজের জন্যে একটা সিগারেট ধরিয়ে তাদের নৌকো থেকে কিছুদূরে 'নর্মদা'-কে লক্ষ্য করে বলল, 'আরে! ওটায় তো আবার সুধা আর মরাতব আলি রয়েছে দেখছি।'

'আবার মানে? ওরা দুজনে তো সব সময় একসঙ্গেই থাকে।'

'কী জানি বাবা, কুমার মরাতব আলির মধ্যে সুধা যে কী দেখেছে?'

'ও দেখতে শুনতে ভাল। খোশ মেজাজ। বড়লোক। আবার কী চাই সুধার?'

'সুধা নিজেও তো একজন রাজকুমারী। ওর আবার টাকা-পয়সার ভাবনা?'

'তা কেন? জমিদারি চলে গেছে। প্রিভি-পার্স এখন বড় দাদার হাতে। মৃত রাজা-সাহেবের যা ধন-সম্পত্তি, তা ওর আট ভাই আর সুধাদের তিন বোনের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গেছে। সুধার অংশ কী আর এমন? ওদিকে কুমার মরাতব আলি একমাত্র অংশীদার।'

'ক্লাবের মেম্বারদের সম্বন্ধে তুমি অনেক খবর রাখ দেখছি। তুমি তো নিজে

মেম্বার হয়েছে বছর দুয়েক হল।'

এরপর কয়েক মিনিট কমল পালটাকে ঠিক করার জন্যেই ব্যস্ত রইল। কুমার মরাতব আলি আর সুধার নৌকো এখনো তাদের কাছ থেকে বেশ কিছুটা দূরে। ও দীর্ঘাঙ্গিনী সুধাকে পেছন থেকে দেখতে পাচ্ছে। হঠাৎ সুধার টুপি মাথা থেকে উড়ে গেল এবং উড়তে উড়তে 'ডেভিডে' এসে পড়ল। সুধা চমকে পেছন ফিরে তাকাল। ওর লম্বা তেকোনা চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কমল টুপিটা তার নৌকোয় ছুঁড়ে দিতেই সুধা বলল, 'থ্যাঙ্কস্।'

ঠিক সেই সময় শায়েস্তা মৃদুকণ্ঠে বলল, 'পিছন দিকটা কিরকম ভারী আর মোটা হয়ে পড়ছে দেখ। নিজের শরীরের যত্ন নেয় না মোটেই এবং সম্ভবত ড্রিঙ্ক বেশি করে।'

এখন নৌকো কাত মেরে নৈনি মন্দিরের পেছন দিক থেকে ঘুরছে। ফিরে যাওয়ার জন্যে। ঝোড়ো হাওয়ায় নৌকো ভীষণ টালমাটাল করছে। কমল চীৎকার করে শায়েস্তাকে বলল, 'সাবধান! শীগগীর পাল গুটিয়ে নাও।'

ঠিক সেই মুহূর্তেই দুর্ঘটনাটি ঘটল। কমলের কথা তখনো শেষ হয়নি, শায়েস্তা কাত হয়ে-যাওয়া নৌকো থেকে নিজের ভার সামলাতে না পেরে জলে পড়ে গেল। সে পড়ে যেতেই নৌকো আবার নিজের ভারসাম্যে ফিরে এল। অবশ্যি কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই কমল নৌকো সামলে নিল। শায়েস্তা সাঁতার কেটে নৌকোর দিকে এগিয়ে আসতেই কমল হাত বাড়িয়ে শায়েস্তাকে ওপরে টেনে তুলল। ভিজে একশা হয়ে-যাওয়া শায়েস্তাকে আপাদমস্তক দেখে কমল ইংরেজীতে চীৎকার করে উঠল, 'আই হ্যাভ সীন দ্য ম্যাড!'

শায়েস্তা তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, 'আহাম্মক।' তারপরই সে দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করল।

কমল হাসতে লাগল। ক্লাবের দিকে চেয়ে দেখল সে। এখন ওরা দুজনেই যেন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। সে নৌকোটাকে খুব আস্তে আস্তে চালাচ্ছে, যাতে শায়েস্তা কান্না থামিয়ে চোখ-টোখ মুছে নেয়। অবশ্যি ক্লাবের বারান্দায় বসে বসে মেম্বাররা হয়তো দূরবীন দিয়ে দুর্ঘটনাটি দেখে ফেলেছে। কিন্তু তার কী দোষ! বরং সে খুশিই হয়েছে। যেভাবে শায়েস্তা তাকে 'আহাম্মক' বলে নিজের ভারসাম্য বজায় রাখতে না পারার সমস্ত অপরাধ তার ঘাড়ে চাপিয়েছে, তাতে সে খুব খুশি। যখন কোন নারী কোন নির্দোষ পুরুষের ওপর সমস্ত অপবাদ চাপিয়ে দেয়, তখন বুঝতে হবে, সে তাকে মনে মনে প্রশংসাই করছে। নিজের ভুলের দায় তার কাঁধে তুলে দিয়ে যেন নিজের সমস্ত বোঝাটাও তার ওপর সমর্পণ করে দিতে চায়। শায়েস্তার ফোঁপানো কান্নায় কমল এক ধরনের মজা পাচ্ছিল। সে তার কান্না থামানোর চেষ্টা করল না। আস্তে আস্তে সে নৌকোটাকে ক্লাবের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে চলল, আর মাঝে মাঝে সিগারেটে টান দিতে থাকল। যখন ক্লাবে পৌঁছতে অর্ধেক রাস্তা বাকী রয়েছে, তখন শায়েস্তা নিজেই চোখের জলে মুছে

ভেজা চোখ পরিষ্কার করল। চুল নিংড়ে নিল। কমল চুপচাপ একটা সিগারেট ধরিয়ে শায়েস্তার মুখে গুঁজে দিল।

অমনি শায়েস্তা হঠাৎ হেসে ফেলল।

ঠিক সেই সময় সুধা নৌকো থেকে পাটাতনে লাফিয়ে নামতে গিয়ে টাল সামলাতে পারল না। পড়ে যাচ্ছিল সে। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কুমার মরাতব আলি তার কোমরে হাত দিয়ে ধরে ফেলল।

শায়েস্তা উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'দেখেছ, পাজী মেয়েটা নিজের সমস্ত ভার কুমারের ওপর ছেড়ে দিয়েছে! সুধাটা খুব পাকা।'

কমল ভাবল, এ ব্যাপারে কিছু বলা উচিত নয়। সে ভেজা কাপড়-চোপড়েই শায়েস্তাকে দুহাতে জড়িয়ে নিয়ে পাটাতনে নেমে এল। তারপর ওকে কাঠের তক্তার ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, 'এখন একছুটে ড্রেসিং রুমে চলে যাও। কাপড়-চোপড় পালটে ফেল। ততক্ষণে আমি তোমার জন্যে গরম জল মিশিয়ে ব্রাণ্ডি তৈরি করে রাখছি।'

শায়েস্তা আলুথালু চুলে লাফ মেরে দৌড়তে দৌড়তে ড্রেসিং রুমে চলে গেল। চোখ তুলে সে কারোর চোখের দিকে তাকাল না পর্যন্ত।

বারান্দায় অনেক লোক সতৃষ্ণ চোখে চেয়েছিল তার দিকে। যখন সে ড্রেসিং রুমের ভেতরে চলে গেল, তখন অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল তারা। কমলের কপাল কুঞ্চিত হল, কিন্তু কিছুই বলল না সে।

রাজকুমার রণধীর সিং বলল, 'ডাক্তার, বেশ চৌকস আছ তুমি।'

কমল কোন উত্তর না দিয়ে সোজা বারে চলে গেল। সেখানে গিয়ে দেখল, টিক্কাসাহেব জগজিত সিং ও টিক্কারাণী কুলবন্ত কউরের সঙ্গে বেগম জাবেদ বসে আছে। ধীরে ধীরে মন্টন পাঞ্চের রক্তিম গেলাসে চুমুক দিচ্ছে। কমলকে দেখতে পেয়েই সে তাকে ইশারা করে কাছে ডাকল। কমল কাছে এসে একটা খালি চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। বেগম জাবেদ তার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল, বড় আদর করে তার হাতে হাত বুলিয়ে দিতে থাকল, মাঝে মাঝে মৃদু মৃদু চাপ দিতে লাগল। শায়েস্তার জলে পড়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোন কথাবার্তাই বলল না। কমলের ভারী আশ্চর্য বোধ হল।

সে বলতে গেল, 'জানেন কি—'

বেগম জাবেদ বাধা দিয়ে বলল, 'জানি। কিন্তু শায়েস্তা তো ভালোই সাঁতার কাটতে জানে। কলেজে ও সাঁতারে প্রাইজ পেয়েছিল।'

বেগম জাবেদকে মন্টন পাঞ্চ পান করতে দেখে কমল আশ্চর্য হল! কারণ হালকা পানীয়ের প্রতি তার আকর্ষণ নেই মোটেই। হুইস্কি অথবা ব্রাণ্ডির চেয়ে হালকা কিছু পান করে না সে। কিন্তু তাতেও পাঁচ-ছ পেগ পান করার পর তার চোখে সামান্যই আনন্দময় উত্তেজনা দেখা দেয়।

'আপনি? আর এই মন্টন পাঞ্চ?' কমল যেন আর নিজেকে সামলাতে

পারল না।

'হ্যাঁ, সর্দি হয়েছে।' বেগম জাবেদের কণ্ঠস্বরে মৃদু কাতরতা, 'চিকিৎসা চলছে। শুনেছি, মণ্টন পাঞ্চ সর্দির পক্ষে নাকি খুব উপকারী।'

ইয়াট ক্লাবের যেসব সদস্য রয়েছে, তারা প্রায়ই বিশেষ বিশেষ পানীয় ব্যবহার করেই নিজেদের যাবতীয় অসুখের চিকিৎসা করে থাকে। এই ক্লাবে যে ডাক্তার সে-ও ওষুধের বদলে বিশেষ পানীয় ব্যবহার করা ভালো বলে মনে করে। টিক্কা-সাহেব জগজিত সিং দেহাতী পাঞ্জাবীতে বলে, 'বেগম সাহেব, সর্দি-কাশির ভালো চিকিৎসা হচ্ছে রাম। বলতে গেলে আধ পেগ রামই। থ্রি এক্স রামের সঙ্গে দু-চামচ ফ্রেঞ্চ ব্রাণ্ডি মিশিয়ে তাতে দু-চার ফোঁটা মাখন ফেলে খান। জীবনে আর কখনো সর্দি-কাশি হবে না। কি কুলবন্ত, তিন-মনালিতে সর্দি-কাশি হওয়ার কথা মনে পড়ছে তো?'

কুলবন্ত বেশ গর্বের সঙ্গে তার দীর্ঘ গ্রীবা আধ ইঞ্চিটাক নাড়ল। এর বেশি ঘাড় নাড়াটাকে সে অশালীন মনে করে। একবার সে মেয়েদের পত্রিকা 'ফেমিনা'র প্রচ্ছদে নিজের ছবি ছাপিয়েছিল। সেখানে নিজের গ্রীবাটিকেই প্রাধান্য দিয়েছিল বেশি। পত্রিকার ভেতরেও তার গ্রীবার প্রশস্তি-সূচক কয়েকটি লাইন ছিল। ব্যস, সেদিন থেকেই টিক্কারাণী কুলবন্ত নিজের গ্রীবা সম্পর্কে খুব সচেতন।

টিক্কারাণী বেগম জাবেদকে বলল, 'আরে, কোল্ডের ভালো ব্যবস্থাপত্র দেখছি তো কর্নেল সিং-এর কাছেই রয়েছে।'

বেগম জাবেদ খুব আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'সেটা আবার কী?'

টিক্কারাণী বুড়ো আঙুল নিজের কড়ে আঙুলে রেখে বলল, 'প্রথমে এক পেগ ব্ল্যাক ডগ খেয়ে বেস তৈরি কর।'

কমল জিজ্ঞেস করল, 'বেস তৈরি হয়ে গেলে?' কমলের কণ্ঠস্বরে দুষ্টুমি।

টিক্কারাণী বুড়ো আঙুলটা দ্বিতীয় আঙুলে রেখে বলল, 'তারপর একটা গেলাসে আধচামচ পোর্ট ওয়াইন ঢাল। তাতে ছ-ফোঁটা শেরি দাও। তার ওপর এক-চামচ সাইডর। সাইডর রোজ হলে আরো ভালো হয়। তারপর করবে কী, তাতে পুদিনার মদ দেবে দশ ফোঁটা। সব ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে ফেলবে। তারপর গলায় আধ পেগ ব্রাণ্ডি ঢেলে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়। সকাল হতে হতেই সর্দি-কাশি একদম সেরে যাবে।'

কমল মন্তব্য করল, 'এত সব ঝামেলার চেয়ে অ্যাসপিরিনের একটা বড়ি মন্দ কী?'

টিক্কাসাহেব সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধমক দিয়ে বলল, 'ধ্যেত!'

গল্পগুজবে আসর জমে উঠেছে, এমন সময় কাছের টেবিল থেকে ডঙ্গারগড়ের রাজা আর মেজর মেহেতাও উঠে তাদের টেবিলে এসে আড্ডায় যোগ দিল। ওরা দুজন বিখ্যাত শিকারী। ডঙ্গরগড়ের রাজা বেগম জাবেদকে বলল, 'সর্দি-কাশি তো একটা সামান্য অসুখ মাত্র। ওটাকে অসুখ বললে 'অসুখ' কথাটাকেই

ঠাট্টা করা হয়। একবার তো আমি মদ দিয়ে হার্টের ব্যামো পর্যন্ত সারিয়েছি।'

'হার্টের ব্যামো ?' বেগম জাবেদ বিস্ময়ে হতবাক।

ডঙ্গরগড়ের রাজা মেজর মেহেতাকে দেখিয়ে বলল, 'ওকে জিজ্ঞেস করুন।'

মেজর মেহেতা পাইপের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে মুখ বেঁকিয়ে নাকী-স্বরে বলল, 'দ্যাট এ ড্যাম ফ্যাক্ট।'

ডঙ্গরগড়ের রাজা মেজর মেহেতাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি বলবে নাকি গল্পটা ?'

'না, তুমিই বলো।'

ডঙ্গরগড়ের রাজা তো আগে থেকেই গল্প বলার জন্যে উৎসুক হয়ে ছিল। সে বলতে শুরু করল, 'আমরা তরাই অঞ্চলে শিকারে গিয়েছিলাম। কোশী বনের ডাকবাংলোয় উঠেছি। ডিসেম্বর মাস। আর ডিসেম্বর মাসের pigstathing-এর মেজাজই আলাদা। কিন্তু ঠাণ্ডাও পড়েছে প্রচণ্ড। একদিন আমরা সারাদিন শিকার খুঁজে বেড়িয়ে খালি হাতে ডাকবাংলোয় ফিরছি। সারাটা দিন ভীষণ ঠাণ্ডায় কাটাতে হয়েছে। আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, তারপর তুষারপাত। তারও ওপর রাস্তা খারাপ, তাতে আবার অন্ধকার। ফলে বারবার রাস্তা হারিয়ে ফেলছি।'

'ওঃ, সে একটা দিনই বটে !' মেজর মেহেতা দ্বিতীয়বার পাইপের ছাই ঝাড়লো।

'সংক্ষেপে ঘটনাটা এই —আমরা যখন রাত্তিরবেলা কোনরকমে ডাকবাংলোয় এসে পৌছলাম, ডাকবাংলোর ভেতরে পা দিতে না-দিতেই মেজর মেহেতা টলতে টলতে মেঝেয় পড়ে গেল। আমি ওকে ওঠাবার জন্যে উবু হয়েছি, তো দেখি কি, মেহেতা ইজ ডেড।'

বেগম জাবেদ বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠল।

টিক্কারাণী পৌনে এক ইঞ্চির কাছাকাছি নিজের ঘাড় সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল। আবেগে উত্তেজনায় তার কানের রিং দুটো থরথর করে কাঁপছে।

তারপর বেগম জাবেদ জিজ্ঞেস করল, 'ডেড ?'

'স্টোন ডেড !' ডঙ্গরগড়ের রাজা উত্তর দিল। 'নাড়ী দেখি তো নাড়ী নেই। নাকে হাত দিয়ে দেখি, শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে না। চোখ দুটো খুলে দেখতে যাই তো দেখি, চোখের পাতা জমে গেছে। জোরে জোরে ঝাঁকুনি দিলাম ওকে। কিন্তু ওর সারা শরীর বরফের মতো ঠাণ্ডা।'

'তারপর ?'

'তারপর ? আমি ছুটে নিজের ঘরে গেলাম। ব্রাণ্ডি নিয়ে এলাম। একটু ব্রাণ্ডি খাওয়াবার চেষ্টাও করলাম, কিন্তু ওর গলা দিয়ে ব্রাণ্ডি নামল না। শেষে ওর জামা খুলে ব্রাণ্ডি দিয়ে বুকে মালিশ শুরু করলাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ওর শ্বাস-প্রশ্বাস চলতে লাগল। আর শ্বাস-প্রশ্বাস চলতেই ওর গলায় ডঙ্গরগড় ককটেল ঢেলে দিলাম। আধ ঘণ্টার মধ্যেই এই লোকটাই উঠে আমার সঙ্গে মদ খেতে বসল।'

বেগম জাবেদ জিজ্ঞেস করল, 'ডঙ্গরগড় ককটেলটা কী রাজাসাহেব?'

রাজাসাহেবের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'সেটা বুঝতে হলে আমার সঙ্গে আপনাকে ড্যান্স করতে হবে।'

বেগম জাবেদ সানুরাগে রাজাসাহেবের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে বলল, 'বেশ, রাজী আমি। কিন্তু আগে ব্যাপারটা বলুন তো!'

'গেলাসে দুচামচ ব্রাণ্ডি ঢালুন। তাতে একচামচ ভারমুথ মিক্স করুন। ভালো করে নাড়ুন। ব্রাণ্ডির রঙ গোলাপী হয়ে এলে তাতে আধ পেগ কমাল ঢেলে চামচ দিয়ে ভালো করে নাড়ুন। ব্রাণ্ডির রঙ সোনালী হলে তাতে দুচামচ গরম জল দিন। ফুটনো গরম জল হওয়া চাই। তারপর তাতে গোগোর কোনিয়াক মেশান। খুব নাড়ুন। তারপর বিশ ফোঁটা জেনেটরস রাম ঢেলে মিশিয়ে দিন। ব্রাণ্ডির রঙ কালচে লাল হয়ে এলে আধ চামচ গরম জল মেশান। তারপর এই মিকশ্চারে বড় পেগের এক পেগ কিং অফ কিংস মিশিয়ে রোগীর মুখে ঢেলে দিন। পাঁচ মিনিট পরেই ঈশ্বরের মহিমা দেখুন। হিন্দু হলে 'রাম রাম', আর মুসলমান হলে খোদার নাম নিয়ে উঠে দাঁড়াবে।'

আড্ডা এমনি জমে উঠেছে যে আশপাশের টেবিল থেকে ক্লাবের অনেক সদস্যই এসে তাদের টেবিলের কাছে জমা হয়েছে। প্রত্যেকেই কোন না কোন অসুখের ওষুধ বাতলাচ্ছে। কমলের মনে হল সে বৃথাই বিলেতে গিয়ে ডাক্তারি পাশ করে এসেছে।

চার

কিছুক্ষণ পর শায়েস্তা যখন কাপড়-চোপড় পালটে বার-রুমে এসে উপস্থিত হল, তখন সকলের চোখ পড়ল তার ওপর। ক্লাবের ড্রেসিং রুমে পোশাক বদল করে বেরিয়ে আসা বলতে গেলে একটা চমৎকার সুযোগ। পুরুষরাও এটা জানে। মেয়েরাও জানে, এই সুযোগ পাওয়াটা মন্দ নয়। কারণ সে-সময় সকলের চোখ গিয়ে পড়ে তার ওপর। এ জন্যেই ক্লাবের ড্রেসিং রুমে চার-পাঁচজন কর্মচারী রাখা হয়েছে। প্রত্যেকটি মেয়েই সাজসজ্জায় অনেকখানি সময় নেয়।

কাপড়-চোপড় পাল্টে বেরিয়ে আসতেই শায়েস্তাকে এখন ভারী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সতেজ আর হাসি-খুশি দেখাচ্ছিল। তার পরনে সালোয়ার, কামিজ আর দোপাট্টা। পীতাভ নীল রঙের ফুলদার চায়না ব্রোকেডের কামিজ। সেই রঙেরই ফুলহীন রেশমী সালোয়ার। সালোয়ারের মুহুরিতে জরির ফুল। পীতাভ নীল রঙের জরিদার দোপাট্টা। গলায় জেড হার। তার ওপর গণ্ডদেশ গোলাপী। তাকে দেখেই দু-একজন পুরুষ সজোরে নিঃশ্বাস নিল। কিন্তু ঠিক সেই সময় quicky's band-এ প্রথম গান আরম্ভ হয়েছে। অনেক প্রণয়ী-যুগল ফ্লোরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। শায়েস্তা কয়েকজন যুবককে পাশ কাটিয়ে কমলের বাহুর

মধ্যে চলে এল। টেক্কাসাহেব মিসেস হপকিন্সের কোমরে হাত রাখল এবং টেক্কারাণী রাজা ডঙ্গরগড়ের সঙ্গে নাচতে শুরু করল।

টেক্কাসাহেব এবং টেক্কারাণীর মধ্যে এক আশ্চর্য বোঝাপড়া রয়েছে। ড্যান্স ফ্লোরে দুজন কখনো একসঙ্গে নাচে না। সব সময় আলাদা আলাদা। টেক্কাসাহেব অন্য কোন মহিলার সঙ্গে, টেক্কারাণী অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে। আজ পর্যন্ত কেউ দুজনকে একসঙ্গে নাচতে দেখেনি। সেজন্যে ক্লাবের লোকদের চোখে ওরা এক আদর্শ দম্পতি।

এক কোণে দুজন বুড়ো আই.সি.এস। দশ বছর আগেই রিটায়ার করেছে তারা। দারুণ মনমরা হয়ে দুজনে বসে বসে ড্রিংক করছে। একজন গিরিধারীপ্রসাদ মাথুর, অন্যজন খাজা আব্দুস সামাদ। দুজনেই কমিশনার পদে থেকে রিটায়ার করেছে। একসঙ্গেই তারা পড়াশোনা করেছে, আই.সি.এস হয়েছে, এবং প্রায় একসঙ্গেই রিটায়ার করেছে। সুধা ও মরাতব আলি এবং কমল ও শায়েস্তাকে একসঙ্গে নাচতে দেখে দুজনেই বড় অসন্তুষ্ট।

'আমি পছন্দ করিনে।' মাথুর শেষ পর্যন্ত নিজের সিদ্ধান্ত তার বন্ধুকে জানিয়ে দিল।

খাজা আব্দুস সামাদ বলল, 'আমারও পছন্দ নয়।'

'সুধা আর মরাতব আলিকে দেখলেই আমার রক্ত গরম হয়ে ওঠে।'

'ইচ্ছে করে, শায়েস্তা আর কমলকে গুলি করে মারি।'

'এসব দৃশ্য আমাদের ব্লাড-প্রেসারের পক্ষে ক্ষতিকারক।'

'মনে হচ্ছে আমার মাথার শিরা ছিঁড়ে যাবে।'

মাথুর নিজেকে সংযত করে বলল, 'তুমি তো আমায় চল্লিশ বছর থেকে দেখে আসছ খাজা! আমি সাম্প্রদায়িকতাবাদী নই।'

খাজা বলল, 'তুমিও জান আমায়। আমার সব মুসলমান আই.সি.এস বন্ধু··· পাকিস্তান জন্ম নিতেই এখান থেকে চলে গেল। আমি শুধু একা পড়ে রইলাম এখানে। কারণ আমি জাতীয়তাবাদী। কিন্তু এ-দৃশ্য আমার পছন্দ না।'

'আমারও নয়।' মাথুর ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়ে জবাব দিল, 'আর দেখতে গেলে, ব্যাপারটা সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন নয়, অন্য প্রশ্ন। গত দশ বছর ধরে আমরা দুজন এই ক্লাবের এই বারে একসঙ্গে একই টেবিলে ড্রিংক করে আসছি। আসছি কি-না?'

মাথুর বলল, 'তুমি ব্রাণ্ডি খাও, আমি হুইস্কি খাই।'

খাজা আব্দুস সামাদ তার কথা হৃদয়ঙ্গম করল, 'হ্যাঁ, ব্রাণ্ডি আমার পছন্দ, তোমার হুইস্কি। আমার ইসলাম ধর্ম পছন্দ, তোমার হিন্দুইজম। কিন্তু আমি কখনো ইসলাম ধর্ম তোমার ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করিনি।'

'আর আমিও আমার হিন্দুইজম তোমার ওপর—' মাথুর সাফাই গাইল। 'সেজন্যে ওদেরও উচিত—' মাথুর সুধা আর মরাতব আলি এবং শায়েস্তা আর

কমলের দিকে চেয়ে বলল, 'নিজের নিজের ব্রাণ্ডি ও হুইস্কি আলাদা রাখা, মিশিয়ে না ফেলা।'

'আমি তোমার সঙ্গে শতকরা একশ ভাগই একমত।' খাজা নিজের ব্রাণ্ডির গেলাস ওঠাল। মাথুরও নিজের হুইস্কির গেলাস তুলে নিল। তারপর দুজনে পরস্পরের গেলাসে গেলাস ছুঁইয়ে খেতে শুরু করল।

ক্লাবের ব্যাণ্ডের গায়ক কম্পমান মাইকের কাছে দাঁড়িয়ে পা নেড়ে নেড়ে গেয়ে চলেছে। ড্রাম জোরে জোরে বাজতে শুরু করল। নাচের গতি দ্রুততর হল।

চারদিকে পাহাড়শ্রেণী ক্রমশ উঁচু হয়ে চলে গেছে। মাঝখানে বাটির মতো জায়গা ভীমতাল। টেক্কাসাহেবের ধারণা, ইংলণ্ডের সঙ্গে ভীমতাল জায়গাটার অনেকটা মিল রয়েছে। সেটা দেখে টেক্কারাণীর আয়ারল্যাণ্ডের কথা মনে পড়ে, রাজা ডিঙ্গরগড়ের জার্মানির ব্ল্যাক ফাস্টরের কথা স্মরণে আসে, শ্যামনারায়ণ ডুবে বুলগেরিয়ার গোলাপ-উদ্যানের কথা ভাবে।

কমল চিন্তা করে, এটা কী ধরনের কথা! এইসব লোক নিজেদের দেশের কোন সুন্দর দৃশ্য বিদেশের কোন দৃশ্যের সঙ্গে মিলিয়ে না নিলে সে-দৃশ্য তাদের কাছে সুন্দর বলে মনে হয় না।

ওরা ক্লাবের বার্ষিক পিকনিকের জন্য নৈনিতাল থেকে ভীমতাল এসেছে। এই বিদঘুটে খেয়াল মিসেস ডোসার মাথা থেকেই বেরিয়েছে। রোগা পাতলা চেহারা। কিন্তু তার মাথা থেকে রোজই নানা উদ্ভট বুদ্ধি বেরিয়ে আসে। নিত্য নতুন পরিকল্পনা সব সময় তার মগজে কিলবিল করছে। এই পরিকল্পনাটিও তার। এবং বস্তুত এটা সবারই পছন্দ হয়েছিল।

এখন তারা ভীমতালের পূর্বতীরে লালটিনের ঘন ঝোপে 'ফাইণ্ড দ্য টিপার' খেলা নিয়ে ব্যস্ত।

মিসেস ডোসা খেলাটি নিয়ে এসেছে ফ্রান্স থেকে।

খুব সাদা-সিধে খেলা।

প্রথমে ছটি মেয়ে।

ছোট ছোট কাগজের টুকরোয় নম্বর লেখা হয়। তারপর সেগুলো ডেলা পাকিয়ে গুলির মতো করে ক্লাবের সদস্যাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। এক থেকে ছ নম্বর যে-সব মেয়েদের কাছে যায়, তাদের দিয়েই খেলার শুরু। মেয়েগুলি লালটিনের ঝোপে ভালোমতো জায়গা বেছে নিয়ে লুকিয়ে পড়ে। প্রত্যেকের কাছে নিজের নম্বর লেখা কাগজের টুকরোটা থাকে। নম্বর-লেখা কাগজ ছাড়াও প্রত্যেকের কাছে থাকে একটি করে খেলনা পিস্তল।

মেয়েগুলি লুকিয়ে পড়লে পুরুষদের মধ্যে লটারি হয়। এক থেকে ছয় নম্বর যাদের ভাগ্যে জোটে, তারা খেলায় যোগ দেওয়ার জন্যে নির্বাচিত হয়।

তারপর দরকার হয় একটা রঙীন বলের। আসলে সেটা সাত রঙের একটা

ফুটবল। বিশেষ করে এই খেলার জন্যেই তৈরি। রেফারি একশো গজ দূর থেকে বলটায় সট মারে। অমনি বল লাফিয়ে উঠে লালটিনের ঝোপের মধ্যে গিয়ে পড়ে। যে-মেয়েটির হাতে বলটি যায়, সে পিস্তল ছুঁড়ে নিজের নম্বর ঘোষণা করে। অর্থাৎ তার নম্বর দুই হলে সে দুবার পিস্তল ছোঁড়ে, তিন হলে তিন বার। লালটিন ঝোপের অন্যপাশে পঞ্চাশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে থাকে পুরুষ-সদস্যরা। তাদের মধ্যে যার সেই নম্বর, সে লালটিন ঝোপের মধ্যে চলে যায় এবং মহিলাটির কাছ থেকে বলটি আদায় করার চেষ্টা করে। অবশ্যি জোর করে নয়, বরং মহিলার কোন প্রশ্নের জবাব দিয়ে। মহিলা তার জবাবে সন্তুষ্ট হলে দুজনে পরস্পরের দুটি হাত ধরে ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসে এবং বলটি আবার রেফারিকে দিয়ে দেওয়া হয়। তাই থেকেই বোঝা যায় মহিলা পরিতুষ্ট। কিন্তু মহিলা সন্তুষ্ট না হলে সে ঝোপের মধ্যেই লুকিয়ে-থাকা অন্য মহিলার দিকে বলটা ছুঁড়ে দেয়। পুরুষটি খালি হাতে ফিরে আসে এবং খেলা থেকে একেবারে বাতিল হয়ে যায়।

ভীমতালের পূর্বতীরে এ-খেলায় দারুণ মজা। এখানে লালটিনের ঝোপ এত ঘন যে লুকিয়ে-থাকা মহিলাদের কেউ দেখতে পায় না। সঠিক নম্বরের মহিলাকে খুঁজে বের করতে পুরুষদের বেশ সময় লাগে। প্রায়ই তারা ভুল করে এমন মহিলার কাছে গিয়ে হাজির হয়, যার কাছে বল নেই। ফলে তারা খেলা থেকে বাতিল হয়ে যায়।

প্রথমে চার নম্বর পিস্তল ছুঁড়ল।

পঞ্চাশ গজ দূরে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা দুজন পুরুষ একসঙ্গে নিজেদের হাতের মুঠি খুলল, পাকানো কাগজের গুলি খুলে নম্বর পড়ল। টিক্কাসাহেবের হাতে চার নম্বরের কাগজ। সে দ্রুত পিস্তলের শব্দ লক্ষ্য করে লালটিনের ঝোপের দিকে ছুটল। তার বুক জোরে জোরে ঢিপঢিপ করতে লাগল, না জানি কোন্ তিলোত্তমা সুন্দরীর দেখা মেলে!

মিসেস ডোসা!

হঠাৎ টিক্কাসাহেবের হৃৎস্পন্দন যেন বন্ধ হয়ে গেল। তাকে দেখে মিসেস ডোসা মুচকি হাসল। লজ্জায় তার শরীরটা যেন কুঁকড়ে গেল খানিকটা, অথচ তার লজ্জা পাওয়ার কোন কারণ ছিল না। টিক্কাসাহেব বড় বিমর্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'প্রশ্ন করুন।'

'আগে বসুন না!' মিসেস ডোসার গলা যেন একটু কেঁপে উঠল।

বাধ্য হয়েই টিক্কাসাহেব তার কাছে বসে পড়ল। বলল, 'প্রশ্ন করুন এবার।'

মিসেস ডোসা তাড়াতাড়ি থার্মোফ্লাস্ক খুলতে খুলতে বলল, 'আগে এক কাপ চা খেয়ে নিন।'

ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে সে সামনে বাড়িয়ে দিল। তারপর নিজের কোমল হাত রাখল টিক্কাসাহেবের হাতে। টিক্কাসাহেব তাড়াতাড়ি চা-টুকু খেয়ে নিয়ে তার হাতখানা সরিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার দেরি হচ্ছে। এবার প্রশ্নটা করুন।'

টিক্কাসাহেবের কণ্ঠস্বর এমন কর্কশ শোনাল যে মিসেস ডোসার রাগ হয়ে গেল। সে তৎক্ষণাৎ বলটা পেছনের দিকে লুকিয়ে থাকা অন্য এক মহিলার দিকে ছুঁড়ে দিল।

ইতিমধ্যে বাইরের লোকগুলোর মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। টিক্কা-সাহেব খালি হাতে ফিরতেই তারা চিৎকার শুরু করে দিল, 'হেরে গেছে। হেরে গেছে।'

টিক্কাসাহেব রাগে মাথা নেড়ে গজগজ করতে করতে একদিকে চলে গেল।

হঠাৎ দুই নম্বরের পিস্তলে আওয়াজ হল।

দুই নম্বর ছিল কুমার মরাতব আলির। সে আওয়াজ লক্ষ্য করে দৌড়ে গিয়ে লালটিনের ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ওদিকে দুই নম্বর ছিল শায়েস্তার—সে লালটিনের একটা ছোট্ট ঝোপের মধ্যে বসেছিল। পেছনে ভীমতালের জল ছলাৎ ছলাৎ করছে। মাথার ওপর একটা তিতির উড়ছে। সারা জায়গাটায় যেন এক গভীর স্তব্ধতা ছড়িয়ে পড়েছে। কুমার মরাতব আলি মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'ভেতরে যাব আমি?'

শায়েস্তা কোন উত্তর দিল না। কুমারজী ভেতরে ঢুকে পড়তেই শায়েস্তা বলল, 'আমার কিছু জিজ্ঞেস করার নেই। আপনি বল নিয়ে যেতে পারেন।'

কুমার মরাতব আলি মৃদু গম্ভীর স্বরে বলল, 'তোমার কিছু জিজ্ঞেস করার নেই, কিন্তু আমার আছে। অনেকদিন পর আজ সুযোগ পেয়েছি। কেবল একটি প্রশ্নের জবাব চাই।'

'বলুন।' শায়েস্তা ক্ষীণকণ্ঠে সম্মতি জানাল।

'তুমি আমায় ঘৃণা কর?'

'না, সেরকম তো কিছু করিনে।'

'তাহলে আমার চেয়ে কমলের দিকে তোমার টান বেশি কেন?'

'কারোর চেয়ে কারোর দিকে আমার টান বেশি নয়।'

'তুমি সব সময় ওর সঙ্গে ঘুরে বেড়াও।'

'আপনাকেও তো সব সময় সুধার সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়।'

'তোমার ব্যবহারে বিরক্ত হয়েই আমি সুধার কাছে গেছি। নইলে সুধার ওপর আমার কোন আকর্ষণ নেই। আচ্ছা, কমলের মধ্যে কী আছে যা আমার মধ্যে নেই? আমি কমলের চেয়ে বেশি ধনী। লোকেই বলে আমি না-কি তার চেয়ে দেখতেও ভালো। তা ছাড়া সে হিন্দু।'

শায়েস্তা শক্ত গলায় বলল, 'হিন্দু-মুসলমানের কথা বলবেন না। ওসব কথা আমার একেবারে পছন্দ নয়।'

কুমার মরাতব আলি কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলল, 'তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দিলে না।'

হঠাৎ শায়েস্তা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠল, 'আপনার কোন প্রশ্নের জবাব আমার

কাছে নেই। তা ছাড়া এখন আর এই বলও দেব না আপনাকে। আপনি খালি হাতেই ফিরে যান।'

কুমার মরাতব আলি করুণ হাসি হেসে বলল, 'তোমার কাছ থেকে সব সময়ই খালি হাতে ফিরছি আমি!'

'এই নিন!' বলেই শায়েস্তা অন্য একটা ঝোপের দিকে বলটা ছুঁড়ে দিল। কুমার মরাতব আলি খালি হাতে মুখ মুছতে মুছতে ফিরে এল। অমনি লোক-গুলো আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করল, 'হেরে গেছে। হেরে গেছে।'

তারপর ছয় নম্বরের পিস্তলে আওয়াজ হল।

রাজা ডঙ্গরগড় গোঁফে তা দিয়ে আওয়াজ লক্ষ্য করে ঝোপের দিকে ছুটল। ঝোপের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে তার বুকের ধুকধুকুনি শুরু হল। ওদিকে বন্ধুরা আগে থেকেই হাততালি বাজাতে শুরু করেছে, কেউ কেউ রাজাজীর নামে জয়ধ্বনিও দিচ্ছে।

শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় সামনে এগিয়ে যেতেই রাজাজী দেখল কি, সবুজ ঝোপে এক রমণী ঘোমটা দিয়ে ঘাপটি মেরে বসে আছে। তার পিঠ রয়েছে রাজাজীর দিকে।

রাজাজীর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠল। বলল, 'এই যে, আসুন।'

'উঁহু!' রমণী মুখ না খুলেই ভৎর্সনা করল যেন।

রাজাজী যথেষ্ট উৎসাহিত হয়ে বলল, 'বলটা একটু দেখাও না! আচ্ছা, বল না দেখাতে চাও, দেখিয়ো না। কিন্তু ঘোমটা তুলে নিজের ছবিটা দেখাও তো।'

'উঁহু' বলে সেই মোহিনী মূর্তি একটু সরে বসল।

শেষ পর্যন্ত হাতাহাতিতে নামতে হল রাজাজীকে। প্রথমে কিছুক্ষণ রমণী নিজের ঘোমটা বাঁচাবার চেষ্টা করল। তারপর হঠাৎ সে একেবারে মাথা থেকে ঘোমটা ফেলে দিল।

দেখেই রাজাজী হতভম্ব।

রমণী তার নিজের স্ত্রী। ডঙ্গরগড়ের রাণীসাহেবা।

রাজাজী রেগে বলল, 'এটা কি ধরনের তামাশা!'

রাণীজী চিবিয়ে বলল, 'তোমার মনটা কেমন দেখছিলাম। আমার সামনে তো নেহাত ভালমানুষটি সেজে থাক। আজ ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়েছে।'

'না ইয়ে—ইয়ে—মানে একেবারেই—মানে আমি বলতে চাইছি কি-এটা একটা খেলা তো।' রাজাজী তোতলাতে তোতলাতে বলল।

রাণীজী রাজাজীকে বলটা দিতে দিতে বলল, 'না এরকম খেলা আমার পছন্দ নয়। চলো, বাইরে চল।'

রাজা এবং রাণী যখন পরস্পরের হাত ধরে বেরিয়ে এল, তখন জোরে জোরে হাততালি পড়তে লাগল, 'হয়ে গেছে, জিত হয়ে গেছে।'

একটা ঝোপ তারায় তারায় ভরে গেছে। না ওগুলো তারা নয়, চামেলি ফুল। ঝোপটার প্রায় কাছেই একটা ছোট্ট দেবস্থান। সেই দেবস্থানে সুধা পূজা দিচ্ছে। একটা ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে আছে কুমার মরাতব আলি, সবকিছু ঝাপসা মনে হচ্ছে তার। চোখ তুলে ওপরের দিকে তাকাল সে। ওপরে কংক্রিটের সাঁকো। সাঁকোর নীচে এই ছোট্ট দেবস্থানটি যেন আড়াল হয়ে আছে। সুধার চোখ বন্ধ, পূজা করছে সে। সাঁকোর ওপর নারী পুরুষদের জোড় বেঁধে পরস্পরের হাত ধরে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে। গোধূলি ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে। দেবস্থানে সুধার আনত মুখখানি ছড়ানো সোনালী চুলের মধ্যে কত না পবিত্র দেখাচ্ছে। দূর থেকে কত সুন্দর, কত পবিত্র, কত সরল। কুমার মরাতব আলি সুধার সুন্দর মুখশ্রীর দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগল দূরত্ব না থাকলে পৃথিবীতে কদর্যতা কত বেড়ে যেত! একবার সে সুধার গালে আতশ কাচ ধরেছিল! পর মুহূর্তেই চমকে উঠে সরিয়ে নিয়েছিল সেটা। প্রত্যেক কোষে একটি করে লোমকূপ রয়েছে, প্রত্যেক লোমকূপে রয়েছে একটি করে চুল, এমনিতে চোখে পড়ে না সেগুলো। কিন্তু আতশ কাচের মধ্যে দেখলে মনে হয়, গণ্ডদেশে যেন এক চুলের জঙ্গল। স্বেদসিক্ত গণ্ডদেশের উপত্যকাসমূহে যেন এক একটি ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত স্তব্ধ হয়ে আছে। আতশ কাচ সরিয়ে সে দেখল, তেমনি কমনীয় গণ্ডদেশ। দূরত্বের বড় প্রয়োজন। কিন্তু নিকটে নিয়ে আসার বাসনাও মানুষের মধ্যে কত তীব্র। সে সমস্ত দূরত্বকে মুছে ফেলতে চায়, সৌন্দর্যকে হাতের মুঠোয় পেতে চায়। কিন্তু দূরত্ব মুছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্যও বিলুপ্ত হয়। জীবন তখন আতশ কাচের মতোই বিশ্রী দেখায়, পুরনো দূরত্ব এক নতুন দূরত্ব সৃষ্টি করে। কুমার মরাতব আলি মনে মনে বলল হতে পারে, আমি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি রোমান্টিক কল্পনার শিকার হয়ে পড়ছি। নইলে সুধার মতো রূপসী লাবণ্যময়ী তরুণী কে পায়!

শায়েস্তা কখনো আতশ কাচ দিয়ে তাকে দেখার সুযোগ দেয়নি। নইলে সম্ভবত সেইরকমই দৃশ্য চোখে পড়ত। আর আতশ কাচের বদলে অনুবীক্ষণে চোখ লাগিয়ে দেখলে উপত্যকাকীর্ণ জঙ্গলের পরিবর্তে টালির ছাদ দেখা যেত।

সেজন্যেই প্রেয়সীকে খুব কাছ থেকে দেখতে নেই। ভেবে দেখ, আতশ কাচ যদি চোখে লাগানো যায়—? তাই তো বিয়ের পর দাম্পত্য-কলহ এত বেশি। দুজনেই মোটা আতশ কাচ চোখে লাগিয়ে পরস্পরকে দেখতে থাকে। একটু দূরত্ব থাকলে, খানিকটা কল্পনা মেশানো থাকলে বছরের পর বছর প্রেম অটুট থাকে, কাছাকাছি হতে না হতেই প্রেম উবে যায়।

সেজন্যে এই দূর থেকে দেবস্থানে আত্মবিভোর হয়ে বসে থাকা সুধাকে দেখে এত ভাল লাগছে। মাঝখানে চামেলী ফুলে ছেয়ে যাওয়া গাছগুলো, ওপরে সাঁকোর ওপর হেঁটে যাওয়া লোকগুলো এবং তাদের অস্পষ্ট কথাবার্তা—ঠন্-ঠন্-ঠন্—দেবস্থানের ঘণ্টা বাজছে…সুধা উঠে আসছে, দূরত্ব কমে যাচ্ছে।

সুধা কাছে এসে প্রসাদ দিল ওকে। মরাতব দুহাত পেতে প্রসাদ নিল।

সুধা জিজ্ঞেস করল, 'কখন থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছ ?'

মরাতব বলল, 'অনেকক্ষণ।'

'তোমায় কে খবর দিল, আমি এখানে রয়েছি ?'

'আমার মন।'

সুধা মৃদু হেসে তার হাত ধরল। বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। খেলার সময় ঝোপের মধ্যে কার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তোমার ?'

'মিসেস ডোসার সঙ্গে।'

'মিথ্যুক কোথাকার! আমি মিসেস ডোসাকেই জিজ্ঞেস করেছিলাম। ও:তো অস্বীকার করলে!'

'অস্বীকার করলে ?'

'পরিষ্কার। সেজন্যেই বলছি, সত্যি সত্যি বল, কে ছিল ?'

'মিসেস রেঞ্জার্স।'

'সেই মুটকি! মিথ্যে বল না। তুমি ওর কাছেও যাওনি।'

কুমার মরাতব আলি হেসে বলল, 'মনে হচ্ছে, তুমি আজ সারাদিন একে-ওকে জিজ্ঞেস করে বেড়িয়েছ! সবাইকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে ?'

সুধা মাথা নেড়ে বলল, 'না। তিনটি মেয়েকে জিজ্ঞেস করিনি। কিন্তু তুমি নিজে বলছ না কেন ? কার সঙ্গে তোমার নম্বর মিলেছিল ?'

'শায়েস্তার সঙ্গে।'

সুধা কুমারের হাত ছেড়ে দিল, কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটতে থাকল সে। তারপর অদ্ভুত কাঁপা কাঁপা গলায়, যেন রাগ দমন করে বলল, 'কী কথাবার্তা হল ?'

'ও একটা প্রশ্ন করেছিল। আমি তার ঠিকমতো জবাব দিতে পারিনি।'

'প্রশ্নটা কী ?'

'প্রশ্নটা কী!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রশ্নটা কী। তুমি কি কালা হয়েছ, শুনতে পাও না ?'

'শুনেছি।'

'তাহলে উত্তর দিচ্ছ না কেন ?'

'ভাবছি, যে উত্তরে শায়েস্তা সন্তুষ্ট হয়নি, সেটা তোমার কি কাজে লাগবে।'

'বাজে অজুহাত রাখ। সাফ সাফ বল, প্রশ্নটা কী ছিল, জবাব কী দিয়েছিলে ?'

কুমার বেপরোয়া কণ্ঠে বলল, 'আমার তো মনে হচ্ছে, যেটা সে প্রশ্ন করেছিল, সেটা আমার জবাব। আর আমি যেটা জবাব দিয়েছিলাম, সেটাই ওর প্রশ্ন।'

'তাহলে তুমি বলবে না ?' সুধা রাগে জ্বলতে লাগল।

'বলবার চেষ্টা করছি তো।'

'তাড়াতাড়ি করো।'

'শোন, শায়েস্তা আমায় জিজ্ঞেস করেছিল, কোন্ মেয়েকে ভালোবাস ? আমি বলেছিলাম, আমি তোমায় সে-মেয়েটির পুরো নাম বলতে পারব না, তার নামের

প্রথম অক্ষরটা বলতে পারি। সেটাও ইংরেজীতে। সে বলল, বেশ, প্রথম অক্ষরটাই বল। আমি বললাম, প্রথম অক্ষর এস।'

সুধা চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল, 'এস ?'

কুমার উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, এস।'

'তার মানে, শায়েস্তা ?'

'না, সুধা।'

কুমার কথা বলতে বলতে সুধার হাত ধরল। সে তো প্রথমে কিছুক্ষণ সরে যেতে চাইল, পা ঠুকতে থাকল, হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শান্ত হল সে। কারণ সময়টা ছিল বড় চমৎকার। সন্ধ্যের অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে, ফিসফিস করে কথা বলছে যেন। তাছাড়া কুমারের হাত খুব মজবুত। সুধা ছটফট করতে করতে থেমে গেল। সাঁকোর ওপর হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়াল। কুমারের বুকে মাথা রাখল সে।

সাঁকোটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে কয়েকটি পাহাড়ী কুঁড়েঘর। দুদিক থেকে দুটি রাস্তা মিলেছে, মাঝখানে একটি নালা। কয়েকটি পাহাড়ী মেয়ে কলসীতে জল ভরছে সেখানে। চারদিকের অস্পষ্ট আলোয় কখনো কখনো তাদের কানের রিং, কপালে ঝুলন্ত টিক আর হাতের কঙ্কন চকচক করে উঠছে। বেহায়া কুমারী মেয়ের তীক্ষ্ণ হাসি শোনা যাচ্ছে। নালার ওপরে সমতল ডাঙ্গা। ডাঙ্গার ওপরে একটি সবুজ পাহাড়। সেই পাহাড়ের ওপর তাদের গেস্ট হাউস।

তখন গেস্ট হাউসের বাইরে পাহাড়ের ঢালুতে একটি খোলামেলা জায়গায় সবাই বসে রয়েছে। তারা এমনি নীরব স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছে যে লোকগুলোকে রাত্রির ঘনায়মান অন্ধকারের অবিচ্ছিন্ন অংশ বলে মনে হচ্ছিল। রাজকুমার বিক্রম সিং অ্যাকর্ডিয়ন বাজাচ্ছিল, গান গাইছিল শায়েস্তা।

ঘুমের মাঝে ডাক দিয়ে যায় কে ?
প্রাণের সখা ? হয়তো কিছুই নয়।
প্রদীপ জ্বেলে ডাকছে কি কেউ ? শুধুই ধোঁয়া। হয়তো কিছুই নয়।
পথ চেয়ে তার রব কি না ভাবছি মনে,
শুনব কি না, পাথুরে কাচ কি ঝঞ্ঝনে,
ব্যথার ব্যথী কি বলে আজ সংগোপনে,
তার আগে এই দ্বার খোলে কে আচম্বিতে
তার আগে এই দ্বার খোলে কে আচম্বিতে
তার আগে এই দ্বার খোলে কে আচম্বিতে

শায়েস্তা শেষ লাইনটা তৃতীয় বার ছুড়ে দিল, যেন সমস্ত দরজা চিরকালের মতো বন্ধ করে দিতে চায় সে।

সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুধা, কুমারের গায়ে গা লাগিয়ে, তার ঘাড়ে আলতোভাবে নখে আঁচড় কাটতে কাটতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'পাজীটা গায়

বেশ। তার গলার স্বরে এত হৃদয়জ্বালা কোথেকে আসে কে জানে !'

'হয়তো তার মনে আগুন লেগেছে। এখনো তা নেভেনি।'

সুধা বলল, 'আগুন তো আমার মনেও লেগেছে। কিন্তু তা সুর হয়ে বেরিয়ে আসছে কৈ !'

কুমার ঠাট্টা করে বলল, 'কখনো আগুন সুরে পরিণত হয়,' কখনো-বা ধোঁয়ায়।'

সুধা তার ঠাট্টার দ্রুত জবাব দিল, 'আর তুমিই বা কেমন ? না আগুন জ্বলে, না আওয়াজ বেরোয়, না ধোঁয়া দেখা দেয়।'

ভীমতাল সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুধার সারা শরীর কাঁপতে থাকল।

'ইস্, ঠাণ্ডা বাড়ছে। চল, ওপরে যাই। আমরাও ওদের সঙ্গে গিয়ে বসি।'

সুধা ঈষৎ ঠাণ্ডার মৃদু কাঁপুনিতে মজা উপভোগ করতে করতে বলল, 'হ্যাঁ, ঠাণ্ডা বাড়ছে।'

'গঙ্গারাম, একটা গান শোনাও। বারোটা বাজতে এখনো অনেক দেরি।' ডুলি-বাহকদের সর্দার রাবত বলল। ওরা ইয়াট ক্লাবের কিছু দূরে ঝিলের ধারে একটি গাছতলায় বসেছিল।

ঠাণ্ডা বাড়ছে। ক্লাবের মধ্যে ঠাণ্ডা বোধ হয় না। গরম ঘর, গরম পানীয়, গরম চোখের দৃষ্টি, গরম পকেট। ক্লাবের মধ্যে বসে বাইরের দৃশ্য বড় চমৎকার লাগে। পাহাড়ের ঝকঝকে বাড়িগুলো দেখে মনে হয় যেন রাত্রি বিজলী আলোর মালা পরেছে। মোটা পশমী কাপড় পরে প্রেমিক-প্রেমিকা যুগল ঝিলের জলে নৌকো ভ্রমণ করে। বছরের পর বছর দুঃখভারাক্রান্ত প্রেমিকের মতো বৃক্ষের পত্র-পল্লব ঝিলের জলে নুয়ে থাকে। আর ক্লাবের মধ্যে মৃদু সঙ্গীতের মূর্ছনা। বাইরে গঙ্গারাম ঝিলের তীরে ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপে, ছেঁড়া চোগা টেনেটুনে বারবার শরীর ঢাকার চেষ্টা করে। পাহাড় থেকে জোর হাওয়া এসে ঝিলের ঠাণ্ডা জল থেকে আরো শৈত্য গ্রহণ করে ডুলি-বাহকদের শরীরে ধাক্কা দিয়ে যায়। ডুলিওয়ালারা বাইরে থেকে অসংখ্য কাচের জানালায় ঝকমকে ক্লাবটাকে দেখতে থাকে, যেন দূর থেকে তারা কাট-গ্লাসের কোন পরীস্থানের প্রাসাদ দেখছে। বাইরে যারা রয়েছে, তাদের কাছে ভেতরের দৃশ্য বড় সুন্দর বলে মনে হয়, আর যারা ভেতরে রয়েছে, তাদের কাছে বাইরের দৃশ্য। গঙ্গারামের গলার আওয়াজ ক্ষীণ, ঠাণ্ডা সামলানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়। সেজন্য তার গানে অন্য ডুলিওয়ালারাও অংশ গ্রহণ করে। যেন ঠাণ্ডাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্যে। তাদের গলার আওয়াজে গঙ্গারামের আওয়াজ মাঝে মাঝে ডুবে যায়। কখনো কখনো সেটা তাদের পছন্দ হয় না, গঙ্গারামকে একা গাইতে দেওয়ার জন্যে থেমে যায় তারা। তখন গঙ্গা-রামের গলার আওয়াজ শূন্য প্রান্তরে ফড়ফড় করে উড়তে থাকে। হঠাৎ আবার তারা ভারী গলায় সুর নাচিয়ে নাচিয়ে গাইতে শুরু করে। যেন পাহাড়

বাতাসের বিরুদ্ধে গাইছে, নৌকো জলের বিরুদ্ধে, মানুষ তার ছেঁড়া চোগার বিরুদ্ধে। সবাই যখন একসঙ্গে গাইতে থাকে, তখন ঠাণ্ডা কম বোধ হয়। গঙ্গা-রামের চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে। তার নজর ক্লাবের দরজার দিকে। কমলবাবু সব সময় তারই ডুলিতে ওঠে। আজ যে কি হল, সকাল থেকে দেখা পাওয়াই গেল না।

এখন রাত্রি প্রায় শেষ। ক্লাবের ঘরের বাতিগুলো ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছে। যাত্রীরা বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। ডুলিওয়ালারা তাড়াতাড়ি ডুলি নিয়ে ক্লাবের দরজার কাছে গেল। অন্যান্য ডুলির মধ্যে গঙ্গারামের ডুলিও রয়েছে। কমলবাবু গঙ্গারামের ডুলিকে দুটাকা বেশি দেয়। সেজন্যে গঙ্গারাম যখন দুজন যাত্রীকে একেবারে মুখের ওপর 'না' বলে দিল, তখনও রাবত কিছু বলল না। বড় নিশ্চিন্তভাবে সে বলল, 'রির্জাভ আছে সাহেব। রিজার্ভ আছে।' যাত্রীরা একে একে সকলেই চলে গেল। ক্লাবের কর্মচারীরাও বেরিয়ে আসতে শুরু করল। এখন আর কোন যাত্রী নেই। রিসেপশন ক্লার্কও চলে যাচ্ছে। গঙ্গারাম সাহস করে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কমলবাবু কি এখনো ভেতর আছেন?'

সে-কথা শুনে রিসেপশন ক্লার্ক বলল, 'আরে গাধা, কমলবাবু তো আজ ভীমতালে। ক্লাবের অ্যানুয়াল পিকনিক। সেজন্যেই তো আজ ক্লাবে এত কম লোক। তোরা এটুকুও খবর রাখিস নে!'

রিসেপশন ক্লার্ক হাসতে হাসতে চলে যায়। আজ ক্লাবের মধ্যে দুবার বকুনি খেয়েছে সে, সেই বকুনি ডুলিওয়ালাদের ওপর ঝেড়ে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। সে ডুলিওয়াদের নির্বুদ্ধিতা দেখে হাসতে হাসতে, খুশিতে ডগমগ করতে করতে বাড়ির পথ ধরে। অমনি ডুলিওয়ালাদের সর্দার গঙ্গারামের ওপর ফেটে পড়ে, 'এই হারামজাদাটার জন্যেই আজ রাতের রুটি গেল। দুজন যাত্রী জুটছিল, তা-ও হাতছাড়া হল।'

'কিন্তু কমলবাবু কাল রাতে যাওয়ার সময় আজ আসার জন্যে বলেছিল।' গঙ্গারামের চোখে জল দেখা গেল।

'তুই কি কমলবাবুর শালা, যে তোকে না বলে সে ভীমতাল যেতে পারবে না?' রাবত রাগে গর্জন করে উঠল।

গঙ্গারাম দুর্বল কণ্ঠে বলল, 'ও তো অমন নয়। কোথাও যেতে হলে আজ আমায় আসতে বলত না।'

রাবত চিৎকার করে বলল, 'তাহলে ক্লাবের দরজায় রাতভর বসে থাক্। যখন কমলবাবু আসবে, তখন তাকে পিঠে করে নিয়ে যাবি।' তারপর রাবত অন্যান্য ডুলি-বাহকদের বলল, 'চল্।'

ওরা চলে গেল। কিন্তু গঙ্গারাম গেল না। সে দরজার কাছেই একপাশে দাঁড়িয়ে কমলবাবুর প্রতীক্ষা করতে লাগল।

ধীরে ধীরে ক্লাবের সমস্ত কর্মচারী চলে গেল। শেষে ম্যানেজারও। তারপর

বড় চৌকিদার ভেতর থেকে ক্লাবের দরজা বন্ধ করে দিল, কারণ সে ক্লাবের মধ্যেই ঘুময়। আস্তে আস্তে সব আলো নিভে গেল। সম্মুখের পাহাড়ের কাছে বাজারের দূরবর্তী কটেজগুলির গায়ে নৌকোগুলি যেন অবোধ শিশুর মতো জলের কোলে ঘুমিয়ে আছে। জলের উপরিভাগ কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে ক্রমশ। তবুও গঙ্গারাম দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডায় ঠক ঠক করে কাঁপছে। ঠাণ্ডা যখন আর একেবারেই সহ্য হল না, তখন সে উবু হয়ে বসে পড়ল। মাথা গুঁজলো দুই হাঁটুর মধ্যে। সে নিজেই বুঝতে পারল না, এখানে সে কার জন্যে অপেক্ষা করছে। বাড়ি যাচ্ছে না কেন? বসে বসেই তার চোখে ঘুম জড়িয়ে এল, ওই ভাবে উবু হয়ে বসেই ঘুমিয়ে পড়ল সে।

ডুলিওয়ালারা যখন তাকে ঘুম থেকে ওঠাল, তখন তার চোখ লাল। সারা শরীর জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। অচেতন অবস্থায় প্রলাপ বকছে সে। ডুলিওয়ালারা তাকে বকতে বকতে তাড়াতাড়ি নিজেদের ডুলিতে শুইয়ে তার বাড়ি পর্যন্ত রেখে এল। সেখানে থাকে তার অন্ধ মা আর বোন। তাদের কুঁড়েঘরটি রয়েল ওক লজের ঠিক বিপরীত দিকে, কটন পাহাড়তলীর একটেরে। সেখান থেকে নৈনিতালের অন্যপাশের দৃশ্য পরিষ্কার দেখা যায়।

কটন পাহাড়তলীতে গরিব পাহাড়ীদের আট-দশটি কুঁড়েঘর। গঙ্গারামের কুঁড়েঘরটি সবার থেকে দূরে, একটু ওপরে। চারদিকে লাউয়ের লতা। একপাশে পেঁয়াজের চাষ। অন্য একপাশে রয়েছে ধনে আর ঢ্যাঁড়স। অন্ধকার নোংরা কুঁড়েঘর। গঙ্গারাম জ্বরে বেঁহুশ, বার বার বিড় বিড় করে বকছে। অন্ধ মা তারাকে জিজ্ঞেস করে, 'এই, কমলবাবু কে রে?'

বারো বছরের সুন্দরী মেয়ে তারা ঝাঁজালো স্বরে জবাব দেয়, 'আমি কি জানি।'

দাদার প্রতি তার বিন্দুমাত্র টান নেই। তারার শরীর ডাগর হয়ে উঠেছে, দেখতে খুব সুশ্রী। এখন থেকেই চোখে রঙীন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। যখন সে কটন পাহাড়ের ওপর সাদা সাদা মেঘ ভেসে যেতে দেখে, তখন তার ইচ্ছে হয়, দুহাত মেলে দিয়ে সে তাদের সঙ্গে উড়ে যায়। এই নোংরা অন্ধকার কুঁড়েঘরে যেদিক দিয়েই যায় সে, আলো ছড়িয়ে দিয়ে যায় যেন।

অন্ধ মা নিজের অন্ধকার জ্যোতিহীন চোখে অশ্রু মুছে বলে, 'তারা, বাইরে থেকে দুটো ধনে এনে দে তো। দুঝাড় পেঁয়াজ আর লাউয়ের একটা ফুলও আনিস। তাড়াতাড়ি যা বাছা। আমি জলদি একটু কাথ তৈরি করে দিই।'

'বাব্বাঃ!' বলে তারা বাইরে চলে গেল। মা গঙ্গারামের শিয়রে বসে তার জ্বরতপ্ত কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। আস্তে আস্তে তার চোখের জল অসুস্থ ছেলের কপালে ঝরতে শুরু করল। অন্ধ মা মনে মনে বলল, 'ভগবান, তুমি এ কী করলে! আমার চোখে আলো দাওনি, জল দিয়েছ। এ কি বিচার ঠাকুর!'

'কমলবাবু···কমলবাবু···কমলবাবু···' এক শীর্ণ শিশুর মতো গঙ্গারামের গলার স্বর। জ্বরে বেঘোর অবস্থায় একটি নামই যেন সে সারাক্ষণ মালা জপছে।

অন্ধ মা গঙ্গারামের কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ভাবছিল, 'আজ রাবত এলে জিজ্ঞেস করব ওকে—'

পাঁচ

শায়েস্তা জানালা দিয়ে বাইরে গনগনে রোদ্দুরে কমলকে হেঁটে আসতে দেখল। পাহাড়ে উঠে তার স্টুডিওর দিকেই এগিয়ে আসছে সে। শায়েস্তা তাড়াতাড়ি তার ন্যূড ছবিটা ঢেকে দিয়ে নিজে কাপড় বদলে তৈরি হয়ে নিল। এমন সময় কমল স্টুডিওর বন্ধ দরজায় করাঘাত করল।

শায়েস্তা দরজা খুলতেই কমল কিছু না বলে একেবারে ভেতর চলে এল। কিন্তু ইজেল ঢাকা দেখে তার মুখ-চোখে হতাশা ফুটে উঠল। বলল, 'ভেবেছিলাম, আজ চমকে দেব তোমায়।'

শায়েস্তা বলল, 'কিন্তু আমি তোমায় আসতে দেখেছি আগেই।'

'একদিন তোমার স্টুডিওতে সিঁধ কাটতে হবে দেখছি।'

'বলপূর্বক অপহরণের চেষ্টা?'

'না, শুধু চিত্রহরণ।' তারপর হঠাৎ আয়নাটার দিকে লক্ষ্য করে বলল, 'এটা কী? আয়না বদল হয়ে গেছে? সেদিন তো একটা এমনি সাদাসিধে আয়না ছিল, আজ আবার এই তিনমুখো আয়না!

শায়েস্তা বলল, 'সামনে থেকে ন্যূড আঁকা হয়ে গেছে। এখন ডানদিক আর বাঁদিকের দুটো ন্যূড বাকি। সেজন্যেই এই তিনমুখো আয়নার দরকার।'

'ওহো, ত্রিমূর্তি ন্যূড তৈরির চেষ্টা করছো?'

'হুঁ, দেখাই যাক কদ্দুর কী করতে পারি!'

কমল উপদেশ দিল, 'আমার কথা শোন। ন্যূড তৈরির খেয়ালটা ছাড়।'

'কেন?'

'ওটা পুরুষের কাজ। সে-কাজ হচ্ছে নারীদেহকে গভীর দৃষ্টিতে দেখা, তার মধ্যে স্বর্গের সন্ধান করা। নারীদেহ তো কখনো আর পুরুষদেহের অংশ ছিল না। পুরুষ তার মধ্যে তার হারিয়ে-যাওয়া স্বর্গের অনুসন্ধান করে। উদাহরণস্বরূপ বৌদ্ধ দর্শনে অনুপ্রাণিত সুদূর অতীতের অজন্তার নগ্নচিত্র—স্বচ্ছ উত্তরীয়ের অন্তরালে নিমগ্ন দৃষ্টি, দর্শকের দিকে চেয়ে দেখছে না সে, তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে লজ্জা এবং সরলতা। সে-চিত্রে দেহ দেহকে আমন্ত্রণ জানায় না, বরং একটু ভেবে দেখলেই বিষাদে আচ্ছন্ন করে ফেলে যা যৌন চিন্তা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। তুমি কি এমন কোন মহিলা শিল্পীর নাম বলতে পার, যে আজ পর্যন্ত একটা সার্থক ন্যূড চিত্র এঁকেছে?'

'অমৃতা শেরগেল—'

'সার্থক ন্যুড চিত্র সেখানেও পাওয়া যায় না। বলতে পার আধা ন্যুড—'

'পলা বেকারের নগ্ন সেল্‌ফ্‌ পোর্ট্রেট।'

'হ্যাঁ, আমি বসলের মিউজিয়ামে দেখেছি। কিন্তু সেটা তো বিশ্রী ধূমসো দেহের ন্যুড।'

শায়েস্তার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। বলল, 'যখন প্রত্যেক নারীকে ভেনাসের প্রতিমূর্তিরূপে তৈরি করে হাজির করা হত, সময় সেই পঞ্চদশ শতাব্দীর দরজা অতিক্রম করে এসেছে। এখন প্রত্যেক নারীই ভিন্ন নারী—সম্ভব-অসম্ভব, তন্বী-স্থূলাঙ্গিনী, পাপীয়সী-পুণ্যবতী-জননী, প্রেয়সী, সতী-অসতী। ডেগা আর গর্গা ক্লাবের নর্তকীদের, গরিব ওয়েটারদের এবং বাজারের মেয়েদের মাটি থেকে তুলে এনে হীরের মতো উজ্জ্বল করে তুলেছেন। নারী শুধু হারিয়ে-যাওয়া স্বর্গই নয়, সেই সঙ্গে সে এক ভয়ঙ্কর নরকও। আমার মনে পড়ছে জর্জ রাব্‌ল্‌-এর নগ্ন বারবণিতার ছবি, যে মাঝরাতে আয়নায় নিজের দেহ দেখে। কী ভয়ঙ্কর ছবি! ছবি তো নয়, যেন অন্ধকার কাঁপানো এক বন্য চিৎকার।'

'তাহলে তুমি কি ওইরকমই ছবি আঁকছ?'

'তুমি কি আমাকেও বেশ্যা মনে কর?'

'না, মানে তা ঠিক নয়। মানে এমনি কথায় কথায়—' কমল শুকনো হাসি হেসে বলল, 'কী আর বলা যায় তোমায়! শায়েস্তা আমার কাছে যেমন, তেমনি হয়তো অন্য পুরুষের কাছেও। নারীকে ভেনাসের প্রতিমূর্তি হিসেবে দেখতেই ভালো লাগে। এ কথাটা ইল্লোরার ভাস্করেরা এবং খাজুরাহো আর অজন্তার চিত্রশিল্পীরা খুব ভালো বুঝতেন।'

'এবং সেটা আমাদের মুঘল আমলের শিল্পীরাও খুব ভালো জানতেন। তাঁরা সাজ-সজ্জা, কমনীয়তা আর দেহাবরণে হিন্দু আমল থেকেও অনেক এগিয়ে গেছেন। দেহ একেবারে নগ্ন নয়, কিন্তু কাপড় ভেদ করে দেহ যেন বাইরে বেরিয়ে এসেছে। উলঙ্গ, কিন্তু পরিচ্ছদে আবৃত।'

'পাশ্চাত্য ন্যুড আমার চোখে কখনোই পূর্ণাঙ্গ ন্যুড বলে মনে হয় না। প্রাচ্যে নারী-দেহ যেন নিজেই একটা দর্শন। পাশ্চাত্যে সেই দর্শনে পৌঁছনোটাই চেষ্টা-মাত্র। উভয় শিল্পীরই বৈশিষ্ট্য আলাদা। তাই আমাদের এখানে ন্যুডের শিল্প সৌকর্য সেই স্তরে ওঠেনি, যাতে বোত্তিচেল্লির ভেনাসের সৃষ্টি কিংবা জর্জিয়ার 'ঘুমন্ত শুক্রগ্রহ' বা কোরেগেভের 'কেভিডের প্রথম পাঠ।' আর আমায় যদি জিজ্ঞেস কর তাহলে, বলব, রক্ত-মাংসের বর্ণাঢ্য ন্যুড ছবিই আমার পছন্দ নয়। বরং বোত্তিচেল্লির ভেনাসের মতো ছবিই আমার পছন্দ। চীনা পোরসেলিনের মতো রঙ, যাতে রক্তের শিহরণটুকুও নেই। গঠনসৌকর্যে অপূর্ব দেহ। কল্পনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আকাঙ্ক্ষার ছাঁচে ঢেলে তৈরি করা হয়েছে। যেন মুক্তোর গঠন কৌশলে নির্মিত। অর্থাৎ ছবিতে রক্তের বর্ণাঢ্যতা নেই, আছে মুক্তোর স্ফটিক

স্বচ্ছতা।'

'আর মুক্তোর স্ফটিক স্বচ্ছ রঙ আমার আদৌ পছন্দ নয়। কটা মেয়ের গায়ের রঙ মুক্তোর মতো স্ফটিক স্বচ্ছ? সবগুলোই তো তৈরি রক্তমাংসের আবদ্ধতায়। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে প্রত্যেক নারীই ভেনাস, কিন্তু রক্তমাংসের গঠনের দিক দিকে নয়। আমার দেহটাও তো 'শেপ' অনুযায়ী নির্মিত নয় মশাই।' শায়েস্তা দুষ্টু চোখে কমলের দিকে চেয়ে বলল।

কমল জবাব দিল, 'সে আন্দাজ আমি এখন থেকে কিভাবে করব!'

শায়েস্তা ওকে ধমক দিল, 'চুপ কর।'

কমল চুপচাপ হাসতে লাগল। তারপর ওর কাছে সরে গিয়ে বলল, 'তুমি সব সময় এমন তর্ক জুড়ে দাও, জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে এমন কচকচানি শুরু কর যে, আমি ভেবে পাইনে তোমার সঙ্গে ফুল নিয়ে কথা বলব কখন। ফুল নিয়ে গন্ধ নিয়ে, মেহেদি ছোপানো ওই আঙুলগুলো নিয়ে, বড় বড় খয়েরী চোখে ভাসমান বাসনার নৌকোগুলো নিয়ে, আতরের গন্ধ-মেশানো বিস্রস্ত চুলগুলো নিয়ে, ওই রসালো ঠোঁটে মন্দ মধুর হাসির মধ্যে আত্মমগ্নতা নিয়ে কথা বলার সময় পাই কোথায়!'

কমল এগিয়ে গিয়ে শায়েস্তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল। ইজেলের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল সে, তাকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে কমল পেছন দিকে হাত বাড়িয়ে ইজেল-ঢাকা কাপড়টা সরিয়ে দিল। হঠাৎ শায়েস্তার মুখ দিয়ে একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কমলের বাহু থেকে ছিটকে সরে গেল।

'এটা কী করলে তুমি বল তো?'

কমল ফ্ল্যাডটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল।

কিন্তু সেখানে কোন নগ্নচিত্রই ছিল না। একটি চেহারা, একটি সেল্‌ফ্‌ পোর্ট্রেট, মুখটা শায়েস্তার। কিন্তু অদ্ভুত ধরনের চেহারা। সেল্‌ফ পোর্ট্রেটে শায়েস্তারই প্রতিকৃতি, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে ভেতর থেকে কমলের চেহারা উঁকি মারছে যেন। রঙের ব্যবহারটাও অদ্ভুত। কখনো মনে হয় একটিই মুখ, আবার কখনো মনে হয় দুটি। একটি অন্যটি থেকেই ভেসে উঠছে যেন। কখনো চামড়ার নীচে পেশী আর রক্তস্রোত চোখে পড়ছে, আবার কখনো মুক্তোর মতো ফটিকজল। দুটি চেহারাই অসম্পূর্ণ।

'এসব কী?' কমল জিজ্ঞেস করল।

শায়েস্তা গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'ওটা একজনেরই মুখ, হারানো স্বর্গের, যখন নারী-পুরুষ একজনই ছিল। এটা বাইবেলের যুগের গল্প নয়। আদম আর হাওয়াকে যখন স্বর্গ থেকে বহিষ্কার করা হয়, এ-গল্প তারও আগের। যখন আদম আর হাওয়া এক ছিল, স্বর্গ আর নরক এক ছিল, স্রষ্টা আর সৃষ্টি এক ছিল। এটা সেই হারানো স্বর্গের ছবি, যা নারী ও পুরুষ নিজের নিজের মতো

করে একে অন্যের মুখ খুঁজে ফিরছে, নরকে যাচ্ছে।'

'দারুণ ভয়ঙ্কর কথা বলছ তো!'

'স্বর্গে যাওয়ার প্রতিটি রাস্তা নরকের মধ্য দিয়ে গেছে।'

'এসব কী বলছ তুমি?'

'একদিন বুঝবে।'

শায়েস্তা আবার কাপড় দিয়ে ইজেলটা ঢেকে দিল।

'কিন্তু তুমি তো ন্যুড তৈরি করেছিলে?'

শায়েস্তা তার কাছে এসে দাঁড়াল। তার কোটের কলার ধরে আশ্চর্য দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নীচু করল সে। সলজ্জ কণ্ঠে বলল, 'আমি ন্যুড তৈরি করতে পারব কি করে! আজ পর্যন্ত নিজের শরীরটাই যে ভালো করে দেখতে পারি নি।'

কমল মৃদুকণ্ঠে ডাকল, 'শায়েস্তা!'

কিন্তু শায়েস্তা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দুহাতে মুখ ঢাকল। বড় কষ্টে কমল তার মুখ থেকে হাত সরাল। কিন্তু সে কিছুতেই চোখ তুলে তাকাতে পারছে না, লজ্জায় তার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে।

ঠিক এমন সময় দরজায় করাঘাতের শব্দ হল। একজন পরিচারিকা এসে বলল, 'বেগম সাহেবের শরীর খারাপ! ডাক্তারবাবুকে ডাকছেন।'

কমল শায়েস্তার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

শায়েস্তা বলল, 'সকাল থেকেই মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে বলছিলেন। দেখে এস।'

'তুমি যাবে না?'

'না, আমি এই ছবিটায় কিছু কাজ করব এখন।'

কমল পরিচারিকার সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

'কমল, তুমি এসেছ?' বেগম জাবেদ এক নাটকীয় ভঙ্গি করে বলল।

কমল ভাবল, এ তো ভারী মজার নাটক! এখন চলচ্চিত্র আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে বহু জটিলতা এনে হাজির করছে। এতদিন পর্যন্ত চলচ্চিত্র ছিল বাস্তব জীবনের কাছে ঋণী, তার মাল-মশলা সংগ্রহ করত বাস্তব জীবনযাত্রা থেকে। এ-পর্যন্ত ব্যাপারটাকে ভালোই বলা যেতে পারে। কিন্তু এখন চলচ্চিত্র আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে, পর্দায় যেমন দেখা যায়, ঠিক তেমনি। আজকাল চুরি-ডাকাতি হয় সিনেমার কায়দায়, সেইভাবেই ব্যাঙ্ক লুঠ হয়। সিনেমার কায়দায় সাজপোশাক করা হয়, গান গাওয়া হয়, প্রেম করা হয়। ব্যাপারটা এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, কান্নাটাও সিনেমার সর্বাধুনিক ভঙ্গি থেকে গ্রহণ করা হয়। আগে আসল থেকে নকল তৈরি করা হত, এখন নকল থেকে আসল তৈরি করা হয়। বাজারে, ক্লাবে, ড্রইং রুমে, পিকনিকে, সমুদ্রে, নৌকোয়, এরোপ্লেনে, ব্যবসা-সংক্রান্ত আলোচনা, সাহিত্য-সভায় —প্রতিটি

ক্ষেত্রে, সবাই যেন ক্যামেরার সামনে অঙ্গভঙ্গি করছে। কাঁধের আচকান থেকে আঙুলে চুটকি বাজানো পর্যন্ত সবেতেই বিশেষ ভঙ্গি। কৃত্রিমতায় মানুষকে এমনি পেয়ে বসেছে যে জীবনের স্বাভাবিক সৌন্দর্যের কথাই ভুলে গেছে তারা। তাই বেগম জাবেদের শোওয়ার ঘরে প্রবেশ করতেই কমলের দারুণ হাসি পাচ্ছিল। কেননা ঘরটি সিনেমার কোন এক সেট-এর মতোই সাজানো। পর্দা কোথাও অবিন্যস্ত নয়, সাধারণত শোওয়ার ঘরে যা প্রায়ই চোখে পড়ে। মনে হচ্ছিল, ঘরটিকে সাজিয়ে-গুছিয়ে সুবিন্যস্ত করে তোলার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে। এবং সে কাজটি করা হয়েছে যেন এই কয়েক মিনিট আগে।

বেগম জাবেদের কাঁধের ওপর ছড়ানো খোলা চুল। পরনে স্বচ্ছ পাতলা নীল রঙের রাত্রির পোশাক। পোশাকের ভেতর থেকে তার শরীরের ঔজ্জ্বল্য বিকীর্ণ হচ্ছে। অসিকোষসদৃশ চোখে এক বেদনাবিধুর ভঙ্গিমা সৃষ্টি করে হাতে একখানি বই নিয়ে পালঙ্কে বসে আছে সে।

এমন সময় কমলের প্রবেশ।

চোখ তুলে চেয়েই এক অদ্ভুত রোমাণ্টিক গলায় সে বলল, 'কমল, তুমি এসেছ?' যেন এমনি অকস্মাৎ চমকে উঠেছে যে হাত থেকে বই পড়ে গেল। বই ওঠানোর জন্যে সুদৃশ্য হাতখানি বাড়াতেই তার বুক থেকে খসে পড়ল রাত্রির পোশাক, হাতের কবজিতে চুড়ি বেজে উঠল রিনঠিন করে। বই ওঠানোর ব্যর্থ প্রয়াস ছেড়ে দিয়ে অপ্রতিভ হয়ে কমলের দিকে তাকাল। দৃষ্টিতে সনির্বন্ধ অনুনয়, লজ্জা, নৈরাশ্য, প্রশ্ন। আর তার নগ্ন কাঁধের একটি পাশ কমলের দিকে, নগ্ন কাঁধের প্রতি দৃষ্টি প্রলুব্ধ হলে সে প্রলোভন ছড়িয়ে পড়ে হাতের আঙুল পর্যন্ত —কেমন কোমল মসৃণ শুভ্র বাহু—দেখ, চেয়ে দেখ—ওর দিকে একবার চেয়ে দেখ কমল।

কমল একখানি চেয়ার টেনে নিয়ে তার কাছে বসে পড়ল। গলায় ডাক্তারের গাম্ভীর্য নিয়ে বলল, 'শুনলাম আপনার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে?'

'হুঁ', বেগম জাবেদ মুখে মৃদু যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে, কমলের হাত টেনে নিয়ে নিজের কপালে রেখে বলল, 'ব্যথাটা এইখানে।'

কণ্ঠে ব্যথা-বেদনার চেয়ে অন্য কোন আবেগেরই প্রাবল্য যেন বেশি।

কমল তার কপাল থেকে আস্তে আস্তে হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, 'আপনার নাড়ীটা দেখি একটু।'

বেগম জাবেদ তার পেলব হাতের কবজি কমলের হাতের মধ্যে বাড়িয়ে দিল।

'হুঁ।' কমল খুব গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'হাঁ করুন তো।'

বেগম জাবেদ ঠোঁট দুটো ফাঁক করল একটু। দন্তকৌমুদী ঝকঝক করে উঠল 'আর একটু—'

বেগম জাবেদ আর একটু হাঁ করল। লাল জিভের ডগা দেখা যাচ্ছে। একেবারে কাছে সরে এসেছে বেগম। ঠোঁট দুটো খুলে একেবারে কমলের দিকে ঝুঁকে পড়েছে:

সে। চোখ বন্ধ। শ্বাস-প্রশ্বাস গভীর থেকে গভীরতর।

'চোখ খুলুন।'

বেগম জাবেদ তার অসিকোষসদৃশ চোখ খুলে তাকাল। তারপর সেই চোখ কমলের চোখের মধ্যে ডুবে গেল যেন।

এখন শ্বাস-প্রশ্বাস আরো তীব্র হয়ে উঠছে।

'হু।' বলেই কমল পেছনে চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

বেগম জাবেদ হঠাৎ একটা ধাক্কা খেল যেন।

কমল বলল, 'মনে হচ্ছে রাত্রে ঘুম হয়নি?'

'একেবারেই না। এক মুহূর্তের জন্যেও ঘুম আসেনি। রাত জেগে জেগে'—

বেগম জাবেদ তার কণ্ঠস্বরে আবার নাটকীয় ভঙ্গি শুরু করেছিল। কমল তাড়াতাড়ি বলল, 'মাথার এই যন্ত্রণা ঘুম না হওয়ার জন্যে। আমি ঘুমের ওষুধ দিয়ে পাঠাচ্ছি। একটা বড়ি খেয়ে শুয়ে পড়বেন।'

কমল উঠতে যাচ্ছিল, হঠাৎ বেগম জাবেদ তার হাত ধরে বলল, 'চললে কোথায়? শোনো না—'

'চুপ।' কমল সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বলল, 'মিঃ জাবেদ দেখছেন।'

'কী?' চমকে উঠল বেগম জাবেদ। কমলের দৃষ্টি অনুসরণ করে সে দেওয়ালের দিকে তাকাল। দেওয়ালে টাঙানো পরলোকগত মিঃ জাবেদের ছবি। তিক্ত কণ্ঠে সে বলে উঠল, 'আমার একুশ বছর বয়সে উনি মারা গেছেন।'

কমলের হাত ছেড়ে দিল সে। নিজেকে সামলে নিয়ে বসল। কমল তার চেহারার পরিবর্তন লক্ষ্য করছিল। কঠিন হয়ে উঠছিল তার মুখমণ্ডল। অবশেষে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি জানেন, আমি শায়েস্তার মা?'

কমল জবাব দিল, 'আজ্ঞে, জানি।'

'আপনার কি মনে আছে যে আপনি হিন্দু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'জানেন কি, আমার বিনা অনুমতিতে এ-বাড়িতে পা রাখতে পারবেন না আপনি? আর যদি না জানা থাকে আপনার, তবে সেটা জানিয়ে দেওয়াই উচিত আপনাকে।'

কিন্তু কমল তার সমস্ত আক্রমণ ব্যর্থ করে দিল। মৃদু হেসে বলল, 'আচ্ছা দাঁড়ান, আপনার ঘুমের ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। সত্যিই, আপনার শরীর ঠিক নেই।'

কমল দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বেগম জাবেদ রাগে ঠোঁট কামড়াচ্ছে তখন। তারপর বিছানায় শুয়ে পড়ল সে এবং বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে শুরু করল।

কমল বেডরুম থেকে বেরিয়ে নীল গালিচা পাতা করিডরে এল। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাগানে এল। একবার চোখ তুলে তাকাল

ওপরে স্টুডিও-র দিকে। এই মুহূর্তে সে ওপরে যাবে না। শায়েস্তার সঙ্গে দেখা করবে না এখন। ভাববার জন্যে কিছু সময় চাই তার। রয়েল ওক লজের সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল সে। হাঁটতে হাঁটতে বাঁ-দিকের দীর্ঘ প্রাচীরে কখনো কখনো পায়ের জুতো দিয়ে ঠোক্কর মারে, কখনো নিজের মনেই হাসে, কখনো বা চিন্তার গভীরে ডুবে গিয়ে গম্ভীরভাবে নীচে ঢালুর দিকে এগোতে থাকে। এমন সময় সে নীচে একটা ডুলিতে টিক্কাসাহেবকে যেতে দেখল। টিক্কাসাহেব রয়েল ওক লজ থেকে একটু ওপরে ব্লুইশ কটেজে থাকে।

'হ্যালো ডক্টর!' টিক্কাসাহেব হাত নাড়ল।

কমল জবাব দিল, 'হ্যালো! ডুলি খালি থাকলে এখানে পাঠিয়ে দেবেন।'

টিক্কাসাহেব তার দুই হাত নাড়তে নাড়তে স্বভাবসিদ্ধ উল্লসিত কণ্ঠে বলল, 'এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি হুজুর। তোমার জন্যে আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত।'

ডুলিটা ফিরে এলে ডুলিওয়ালাদের মধ্যে রাবতকে চিনতে পেরে কমল জিজ্ঞেস করল, 'সেই গঙ্গারামটা কোথায়? অনেকদিন থেকে দেখিনি ওকে!'

রাবত বলল, 'আজ বারো দিন ধরে ওর অসুখ হুজুর।'

'অসুখ? কী হয়েছে?'

'নিউমোনিয়া।'

'নিউমোনিয়া? কী করে হল?'

'হুজুর, ছেলেটা ভীষণ বোকা। হুজুর যেদিন ভীমতাল গিয়েছিলেন, সেদিন সে সারারাত ক্লাবের বাইরে আপনার জন্যে অপেক্ষা করেছিল। বলেছিল, 'হুজুর যখন বলে গেছেন তখন নিশ্চয় আসবেন।'

'আরে!' ছেলেটির নির্বুদ্ধিতা দেখে কয়েক মুহূর্ত কমলের মুখে কোনো কথা সরল না। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'এখন কেমন আছে ও?'

রাবত বলল, 'এখন তো ভালোই আছে হুজুর। দু-তিন দিনের মধ্যেই কাজে আসবে।'

'তোমাদের মধ্যে কেউ ওর বাড়ি চেনে?'

'সবাই চেনে। এই ডুলিওয়ালারাও চেনে।'

'ঠিক আছে। তাহলে আগে ওর বাড়িতে নিয়ে চল আমায়।'

ওর কুঁড়েঘরের কাছে না পৌঁছতেই ডুলিওয়ালারা চিৎকার শুরু করে দিল, 'অ বে গঙ্গারাম! অ বে ও গঙ্গারাম, হুজুর এসেছেন। কমলবাবু—ডাক্তারবাবু এসেছেন।'

গঙ্গারাম তখন কুঁড়েঘরের পেছনে খাটে উপুড় হয়ে শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছিল। আওয়াজ শুনেই সে উঠে ভয়ে ভয়ে কুঁড়েঘরের সামনে চলে এল। কমলকে দেখে আনন্দে তার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কমল দেখল, গঙ্গারাম আগের চেয়েও দুর্বল হয়ে পড়েছে। রোগা-পাতলা

চেহারার ওপর বড় বড় চোখ দুটো আরো বড় দেখাচ্ছে। পাণ্ডুর বিবর্ণ মুখ। রুক্ষ চুল। লম্বা ঘাড়ের নীচে ঢলঢলে চোগা। দেখে মনে হচ্ছে, চোগার ভেতরে একমুঠো হাড় বাকি আছে শুধু।

কিছুই বলতে পারল না সে। আনন্দে উত্তেজনায় ড্যাবড্যাব করে কমলকে চেয়ে দেখতে লাগল শুধু।

কমল বলল, 'তুমি যদি আমার কাছে কাউকে পাঠিয়ে দিতে আমি অনেক আগেই তোমাকে দেখতে আসতাম।'

গঙ্গারাম কিছু বলল না। তার চোখ ছলছল করে উঠল।

কমল জিজ্ঞেস করল, 'এখন কেমন আছ?'

গঙ্গারাম চোখের জল চাপতে চাপতে বলল, 'ভালো। এখন খুব ভালো আছি। অসুখ সেরে গেছে একেবারে।'

'ভালো আছি!' কমল ওকে ধমক দিয়ে বলল, 'তোমার বয়স খুব কম। তার ওপর ভীষণ দুর্বল তুমি। ডুলি বওয়ার কাজ তোমার দ্বারা হবে না।'

কমল পকেট থেকে টাকা বার করে তিনশো টাকা গুনে দিল গঙ্গারামকে। বলল, 'একটা ঘোড়া কিনে নাও। ভালোই সওয়ারি জুটবে। জুটবে না?'

'আজ্ঞে বাবু।' গঙ্গারাম তার কাঁপা-কাঁপা হাতে নোটগুলো ধরে ছিল, আর তার চোখের জলে নোটগুলো ভিজে জবজবে হয়ে উঠছিল। মুখে শুধু বলছিল, 'আজ্ঞে বাবু—আজ্ঞে বাবু—আজ্ঞে বাবু—'

'আর যখন সওয়ারি জুটবে না, তখন আমার আর্দালি হিসেবে কাজ কোর।'

তারপর কমল ডুলিওয়ালাদের দিকে ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, এমন সময় তার চোখ পড়ল একটি মেয়ের ওপর। কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে এসে একটা কাঠের খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়াল সে। যেন কালো সমুদ্রের ফেনারাশি থেকে ভেনাস উঠে এল। কিন্তু কাঁচা বয়সের ভেনাস। বোত্তিচেল্লির ভেনাসে পরিণত হতে এখনো তার দু-তিন বছর সময় লাগবে। কিন্তু হুবহু সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সেই চীনা পোরসেলিনের মতো রঙ, সেইরকমই মুক্তোর মতো ঝকঝকে। ভয়হীন চিন্তাহীন। তার চোখে যেন কোন কিছু মোকাবিলা করার সংকল্প। চেহারায় গঠনে গঙ্গারামের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে কিছুটা।

কমল চিনতে পেরে বলল, 'ও বুঝি তোমার বোন?'

গঙ্গারাম পেছন ফিরে দেখল। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, ও তারা।'

'ঠিক বিড়ালের বাচ্চার মতো দেখাচ্ছে। পুষি।'

তারা লজ্জিত হল না, পালিয়েও গেল না। কাঠের খুঁটি ধরে তেমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে থাকল। পুষি!'

কমল ডুলিতে গিয়ে বসে পড়ল। অমনি গঙ্গারাম গিয়ে তার পায়ে হাত দিল। তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে নিয়ে কমল তার উসকো-খুসকো চুলগুলো নেড়ে দিল একটু। বলল, 'তাড়াতাড়ি সেরে উঠে একটা ঘোড়া কিনে ফেল, কেমন!'

তারপর রাবতের দিকে চেয়ে বলল, 'চল।'

ঢাল বেয়ে ডুলি এগিয়ে চলল। যতক্ষণ সেটা চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য না হল, ততক্ষণ গঙ্গারাম নোটগুলোকে এলোমেলোভাবে হাতের মুঠোয় চেপে ধরে সেদিকে চেয়ে রইল।

ছয়

টেলিগ্রামটা দেখেই কপাল কোঁচকাল কমল। টেলিগ্রামটা চোখে পড়তেই উমেশ বলে উঠল, 'আচ্ছা, আপনি আমার চিঠি ঠিক সেই সময়ে পেয়েছিলেন! তাহলে স্টেশনে যাননি কেন?'

কমল গম্ভীরভাবে বলল, 'আরে ঠিক সেই সময়ে একটা রুগী দেখতে যেতে হয়েছিল আমায়।' বলতে কি, কথাটা সর্ব্বৈ মিথ্যা।

আসলে কমল উমেশকে পছন্দ করে না। উমেশ সেটা জানে, এবং সেজন্যে সে কমলের ওপর খুশি নয়। কিন্তু দুজনের রক্তের সম্পর্কটা এতই ঘনিষ্ঠ যে ভাগ্যচক্রে নিঃসন্তান অবস্থায় কমলের মৃত্যু হলে উমেশই তার সব সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। এবং কমল হবে উমেশের। কেননা উমেশও এখনও পর্যন্ত বিয়ে করেনি। এইরকম একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার জন্যেই কমল সত্যি কথাটা বলতে কুণ্ঠিত হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল, কথাটা 'আপনি এখানে কতদিন থাকবেন?'

উমেশ বলল, 'পুরো সিজনটা।'

কমল মাথা তুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল উমেশের দিকে।

উমেশ বলল, 'কমল, আসল কথাটা হচ্ছে, আমি এখানে এম.পি ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছি।'

কমল উমেশকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখল। বলতে কি, পা থেকে মাথা পর্যন্ত। উমেশের চোখে-মুখে এক আশ্চর্য বিদ্রূপের হাসি। কমল সেটা আদৌ পছন্দ করে না। কমল গভীর দৃষ্টিতে দেখছিল তাকে। শীর্ণ দীর্ঘাকৃতি মুখের গড়ন। শ্যামবর্ণ। বুদ্ধিদীপ্ত ছোট ছোট চোখে চতুরতা। পাতলা ঠোঁটের আড়ালে কাঠবিড়ালীর মতো সরু নরু দাঁত। সেজন্যে যখন সে হাসে, তখন কাঠবিড়ালীর মতোই একটা দংশন অনুভব করে কমল। একটা নিষ্ঠুরতাও। তার অস্থির আঙুলগুলোতে এবং চোখের দৃষ্টিতে চঞ্চলতা, সব মিলিয়ে একটি বুদ্ধিমান, ইন্দ্রিয়সেবী কিন্তু ব্যর্থ মানুষের মুখচ্ছবি। কমল উমেশের জীবনটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল।

জ্যাঠামশাই দক্ষিণ আফ্রিকায় ইম্পোর্ট-এক্সপোর্টের ব্যবসা করতেন। সেখান থেকেই তিনি উমেশকে লণ্ডনে পাঠিয়েছিলেন ব্যারিস্টারি পড়তে। সাত বছর পর যখন সে লণ্ডন থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে ফিরল, তখন অবশ্য তার অনেক

অধঃপতন ঘটেছে। তার বাবা তাকে সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিলেন এবং তাতে কিছুটা কাজও হয়েছিল। কিন্তু এমন সময় জ্যাঠা-মশাইয়ের মৃত্যু হল। অবাধ সুযোগ পেয়ে গেল উমেশ। বাবার যাবতীয় সঞ্চয় কিছুদিনের মধ্যেই সে উড়িয়ে দিল। তারপর সে দিল্লীতে চলে এল। সেখানে কমলের বাবাই তাকে পুনরায় সেই ইম্পোর্ট-এক্সপোর্টের ব্যবসাতে লাগিয়ে দিল। কিন্তু ব্যবসায়ে লোকসান ছাড়া আর কিছুই হচ্ছিল না।

বাবার মৃত্যুর পর কমল তাকে সাহায্য করত। সে তাকে পরামর্শ দিল, উমেশ যদি মন দিয়ে ব্যারিস্টারি করে, তাহলে সে খ্যাতিলাভ করবে, অর্থোপার্জনও করবে।

ছ বছর আগে জুলিকে ত্যাগ করে কমল যখন বিলাত থেকে চলে এসেছিল, তখন থেকেই সে উমেশকে সাহায্য করে আসছে। কিন্তু উমেশ ব্যারিস্টারিতে বিশেষ নাম করতে পারল না। একেবারে যে ব্যর্থ হয়েছিল তা নয়। তার মধ্যে হৈ-হুল্লোড়পনা তো আগে থেকেই ছিল। কূট-তর্কবিতর্কে পারদর্শী। যুক্তি দিয়ে না পারলে জোরালো কণ্ঠে ঝগড়াঝাঁটি করেই সে প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করে দেয়। এসবই একজন উকিলের পক্ষে সদগুণ বলে বিবেচিত হতে পারে, যদি সেই সঙ্গে দিনরাত্রি নিষ্ঠার সঙ্গে সে আইনের গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, উমেশ ছিল বড়ই শ্রমবিমুখ। সেজন্যে নিজের গুণগত বৈশিষ্ট্যে উমেশ একজন উকিল তৈরি হলো ঠিকই, কিন্তু একজন প্রতিষ্ঠিত বিচক্ষণ উকিল হয়ে উঠতে পারল না।

একেই তো উমেশের নিজের ব্যর্থতা, তার ওপর কমলের সাফল্য! যদিও ওপরে ওপরে দুজনের সম্পর্ক বেশ ভালো, কিন্তু সেই সুসম্পর্কের আড়ালে উমেশের মনে এক প্রচণ্ড ঈর্ষা সতত ক্রিয়াশীল, যার ভয়ঙ্কর প্রকাশ উমেশকে অনেক কষ্টে সামলাতে হয়। কারণ মাঝে মাঝেই কমলের সাহায্য নিতে হয় তাকে। এবং এখনো অনেক সাহায্য তাকে নিতে হবে।

কমলের মনে হল, উমেশ এবার ঠিক পথ বেছে নিয়েছে। বছরের পর বছর বৃথা দৌড়-ঝাঁপ এবং ভুল চিন্তা-ভাবনার পরে এবার সে জীবনে এক সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। অর্থাৎ সে ইলেকশনে দাঁড়িয়েছে। তার ভ্রষ্ট স্বভাব ভারতবর্ষের রাজনীতিরই অনুকূল। সাধারণ বুদ্ধি বিবেচনার নিরিখে দেখতে গেলে এ এক উৎকৃষ্ট সিদ্ধান্ত বলা চলে।

কমল খুশি হয়েই উমেশের সঙ্গে করমর্দন করল। উমেশও খুশি হয়ে কমলের কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা চাইল এবং ইলেকশনে সব রকমের সাহায্য দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল কমল। সেই সঙ্গে সঙ্গে কমল আরও ভেবে দেখল যে উমেশের জন্যে একটা আলাদা বাড়ির ব্যবস্থা করা দরকার। তার খরচপত্র সব কমল নিজেই বহন করবে। উমেশ অবশ্যি কমলের কাছেই থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে কমলের কথায় সম্মতি দিল। কারণ কমল তাকে বলল যে ইলেকশনের

কর্মব্যস্ততা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বহুলোক উমেশের সঙ্গে দেখা করতে আসবে। তাতে কমলের নিজের কাজ ও রিসার্চের ক্ষতি হবে। এবং সম্ভবত উমেশও যথেষ্ট স্বাধীনভাবে থাকতে পারবে না। অবশ্য উমেশ মনে করল কমল তাকে নিজের কাছে রাখতে চাইছে না। হয়ত সে তাকে ক্ষতিকর বলেই মনে করছে। যদি তাই মনে করে তো করুক। উমেশের ধারণা, তার পক্ষে পৃথক থাকাটাই সমীচীন। সেটাই তার পক্ষে ভালো। যদিও কমল একরকম ভেবে কথাটা বলেছিল, উমেশ অন্যরকম ভেবে নিয়ে তাতে সমর্থন জানাল। উমেশ মনে মনে বলল, প্রিয় উমেশ, আপাতত এটাই মেনে নাও। এখন এই তো তোমার অবস্থা! পঞ্চাশ হাজার টাকা তার কাছ থেকে নিতে হবে। আর মাত্র পঞ্চাশ হাজারে কী হবে! আরো এক লক্ষ দেড় লক্ষ টাকা ইলেকশনের পেছনে খরচ হবে। সে-টাকা কি তোমার পকেট থেকে যাবে? ওই নির্বোধটার কাছেই তো হাত বাড়াতে হবে তোমাকে। সেজন্যে তার ঠোঁটে মৃদু হাসি খেলে গেল। মনের ক্ষোভকে সে দমন করে মনে মনে বলল, এখন আপাতত মুখে গভীর পেলব হাসি টেনে তুমি কমলের সিদ্ধান্তকেই স্বাগত জানাও।

কমল পরামর্শ দিল 'সবার আগে তোমার ক্লাবের মেম্বার হওয়া দরকার। আজকেই আমি নিয়ে যাব তোমায়। তা ছাড়া আমি ভাবছি, শুধু ইয়াট ক্লাবের নয়, নৈনিতাল ক্লাবেরও মেম্বার হওয়া প্রয়োজন তোমার। নেতৃস্থানীয় সব ব্যক্তিরা অধিকাংশই নৈনিতাল ক্লাবের মেম্বার।'

উমেশ গদগদ কণ্ঠে বলল, 'যা বলবে তাই করব। আমায় শুধু ইলেকশনে জিতিয়ে দাও তুমি।'

কমল মাথা নেড়ে আফশোস করে বলল, 'দুঃখ তো সেটাই। এতদিন এ খেয়ালটা কেন তোমার মাথায় আসেনি। আসলে তুমি এই সব কাজেরই উপযুক্ত লোক।'

কমল অকপটভাবেই তার চিন্তার কথা বলে যাচ্ছিল। কিন্তু উমেশের মধ্যে একটা ক্ষোভমিশ্রিত অবজ্ঞা ঘনীভূত হচ্ছিল। তার আসাতে উমেশের মন তিক্ত হয়ে উঠছিল। কিন্তু বাইরে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে করতে বলল, 'থ্যাঙ্ক য়ু, থ্যাঙ্ক য়ু কমল। আমি তোমার কাছে এটাই আশা করেছিলাম।'

'আমি এখুনি তোমায় বিশ হাজারের চেক দিচ্ছি। কাজ শুরু করে দাও তুমি। তারপর দেখা যাবে। আমি আজকেই আমার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলব। তোমার জন্যে একটা ভালো কটেজের ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে।'

'থ্যাঙ্ক য়ু ডিয়ার কমল, থ্যাঙ্ক য়ু।'

'এখন স্নান-টান সেরে কাপড়-চোপড় পরে তৈরি হয়ে নাও। চলো, একবার ক্লাব থেকে ঘুরে আসি।'

সাত

উমেশ : কুমার মরাতব আলির প্রতি

এটা মনে ভাববেন না যে হুইস্কির প্রভাবে আমি এ কথা বলছি। আমি বড্ড সাদাসিধে, মনের দিক থেকে সহানুভূতিশীল। কিন্তু সেরকম নীচু দৃষ্টির সংকীর্ণমনা বুদ্ধিমোটা হিন্দু নই যে আপনার আর সুধার প্রেমের মহত্ত্ব চিনতে পারব না। পবিত্র অনুরাগ নিজের মর্যাদা নিজেই প্রতিষ্ঠা করে। আপনার চেহারাই বলে দিচ্ছে, আপনি কোন সাম্প্রদায়িক ধ্যান-ধারণায় আদৌ বিশ্বাসী নন। আর সুধাও তাই। আসুন, হাতে হাত দিন। আমি বারবার আপনার সঙ্গে করমর্দন করতে চাই। কারণ আপনি খুব সৌভাগ্যবান। খুবই সৌভাগ্যবান। সুধার পবিত্র আচার-ব্যবহার ও সমুন্নত চিন্তা-ভাবনা তার চোখের দৃষ্টিতেই প্রতীয়মান। সত্যি কথা বলতে কি, উনি একজন দেবী। আজকালকার মডার্ন মেয়েরা এরকম নয়। আমি একজন বিশ্বপ্রেমিক, বিশ্বভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী। আমি পৃথিবীকে ধুয়ে মুছে শুচিশুভ্র করে তুলতে চাই। আমি কয়েকদিনের মধ্যেই লক্ষ্য করেছি সুধা ক্লাবের অন্যান্য মেয়েদের থেকে কতখানি পৃথক, বাইরে দেখতে মডার্ন হলেও কতকগুলি অত্যাবশ্যক প্রাচীন মূল্যবোধের পূজারী। আপনি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান।

উমেশ : রাজা হিম্মত রায়ের প্রতি

আমি তো ক্লাবে নবাগত। অন্যান্যদের ব্যাপারগুলোকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখাটা আমি পছন্দ করিনে। কিন্তু গতকাল এক সাহেব কুমার মরাতব আলি ও সুধার ব্যাপারে এমন একটা গোপন কথা বললেন যে আপনার কাছে আসাটা বিশেষ কর্তব্য বলে আমার মনে হল। অবশ্যি তিনিই, তাঁর নামটা এই মুহূর্তে প্রকাশ করাটা সমীচীন হবে না মনে করছি, তিনিই আমাকে আঙুল তুলে বললেন, 'আপনি আজকাল রাজা হিম্মত রায়ের কাছে খুব ওঠা-বসা করছেন, আপনি রাজাসাহেবকে বোঝাচ্ছেন না কেন? সুধা তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয়া। রাজাসাহেবের রাজপুতের গায়ের রক্ত কি হল! ওদের সাহসটা দেখুন না, একজন মুসলমান এক হিন্দু মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছে! আর সেটাও কি-না স্বাধীনতার পরে! পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পরেও এরা আমাদের মাথার ওপর বসে দাঁত বার করে হাসছে!' আমি বললাম, 'আমি এরকম খারাপ কথাবার্তা শুনতে ভালোবাসিনে। আর যদি রাজপুতের গায়ের রক্তের কথাই বলেন, তাহলে

কুমার মরাতব আলিও তো রাজপুত বংশ থেকেই এসেছেন। হা-হা-হা!' কিন্তু মশাই, আমার কথায় তিনি ঘায়েল হলেন না। উল্টে আমায় হাসতে দেখে তিনি রেগে গেলেন। বললেন, 'ব্যাপারটা খুবই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। আপনি কিনা সেটা হেসে উড়িয়ে দিচ্ছেন। আপনাদের মতো হিন্দুরাই তো এ দেশের ভরাডুবি ঘটিয়েছেন।' আমি বললাম, 'তা আমি কী করব বলুন! তরোয়াল দিয়ে কুমারের মাথা কেটে ফেলব?' তিনি বললেন, 'আমি তো তা বলছিনে। কিন্তু সুধাকে বোঝানো উচিত।' বললাম, 'প্রেমের ব্যাপারে কে কাকে বোঝাতে পারে! তবে, যদি একান্তই বলেন, ব্যাপারটা আমি রাজাসাহেবের কাছে তুলতে পারি।' কারণ এ ব্যাপারে লোকজনের মধ্যে একটা চাপা গুঞ্জন ক্রমাগত বাড়ছে।

উমেশ : সুধার প্রতি

আরে, আসুন আসুন। আমাদের কাছেও একটু-আধটু বসুন না। আপনার প্রিন্স চার্মিং কোথায়? শুনলাম, ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করার জন্যে গেছেন তিনি! ঘোড়ায় চড়ার শখ আছে না-কি আপনার? আমার অবশ্যি নেই। লোলো হোটেল থেকে ডাফরিন হাউসের দূরত্ব অনেকটা। অশ্বারোহীদের পক্ষে বেশি তামাক সেবনটা ক্ষতিকর। তারা কখনো জিততে পারে না। আমরা তো মনেপ্রাণে চাইছি, কুমার সাহেব জিতে আসুন। কী চমৎকার মানুষ! সেদিন রয়েল ওক লজের গেটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী সুন্দর গাম্ভীর্য নিয়ে শায়েস্তা জাবেদের সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি! আমি দূর থেকে দেখে তো ভেবেছিলাম, বোধহয় কোন সিনেমার হিরো। কাছে যেতেই বুঝতে পারলাম কুমার সাহেব। আজ্ঞে হ্যাঁ, পরশুকার ঘটনা…

উমেশ : বেগম জাবেদের প্রতি

জী হাঁ, আপনি যথার্থই বলেছেন। ধর্ম ও কালচারের গভীর সম্পর্কের কথাই বলেছেন। আমিও এটা স্বীকার করি। অবশ্য আমি তা কারোর ওপর প্রয়োগ করতে চাইনে। কিন্তু ধর্ম ও কালচারের গভীর এবং অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের প্রতি আমি আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাই। এই সম্পর্ককে অসাধারণ ছাড়া আর কিই বা বলা যেতে পারে! আসলে ব্যাপারটা খুবই সরল। দেখুন না, আমি হিন্দু, আমার একরকম কালচার। আর আপনি মুসলমান, আপনার একরকম কালচার। দুটিই আলাদা আলাদা। আর আপনার দিক থেকে বলতে গেলে আপনি অসাধারণ সুন্দরী লাবণ্যময়ী। যদিও আমরা দুজনেই ভারতীয়, কিন্তু কালচার আলাদা আলাদা। তাই আপনারা কেউ কেউ যখন এই দুটি কালচারের ঐক্যের বা মিলনের কথা বলেন, তখন দারুণ ভুল করেন। গাধা এবং ঘোড়ার মিলনের ফলে খচ্চরের জন্ম হতে পারে। সেই রকম হিন্দু-খ্রীষ্টান, হিন্দু-মুসলমান,

হিন্দু-ইহুদী বা ইহুদী-মুসলিম কালচার কখনো কি এক হয়ে মিশে যেতে পারে? এ-কথা কিছুতেই আমার মাথায় আসে না। হয়ত হতে পারে, আমারই ভুল। ও আচ্ছা, আপনার মতে আমার ভুল নয়। সত্যি? আপনি যেমন সুন্দরী মহিলা, তেমনি সহানুভূতিশীল—হা-হা-হা—না, আমি ঠাট্টা করছিনে! সারা ক্লাবের মধ্যে আপনার কাছে দাঁড়াতে পারে, এমন কোন মহিলা নেই। ইয়াল্লাহ্—

উমেশ : পণ্ডিত কৃষ্ণ বিহারীলালের প্রতি

নৈনিতালের ব্রাহ্মণরা আপনার কথা কখনো অমান্য করতে পারে না। শুধু নৈনিতালই বা বলি কেন, সারা হিন্দী-জগতে আপনার কথা কেউ উড়িয়ে দিতে পারে না। আপনি যে মহান সাহিত্যের স্রষ্টা, আমি তার আর কী প্রশংসা করব। আজকের সমালোচকরাই বা কী বলবে! তার জন্যে ভবিষ্যতে সম্ভবত কোন মহাগ্রন্থ রচিত হবে। পণ্ডিতজী, আমি একজন খাঁটি হিন্দী প্রেমিক। শুধু এইটুকু জানি, যদি আমি কখনো পার্লিয়ামেণ্টে যেতে পারি, হিন্দীর জন্যে লড়াই করতে করতে দরকার হলে প্রাণ দেব।

উমেশ : সৈয়দ শরাফত হোসায়েনের প্রতি

উর্দু? সৈয়দ সাহেব, উর্দু তো আমাদের কাছে মাতৃদুগ্ধতুল্য। উর্দু হচ্ছে আমাদের প্রাণ। উর্দুর জন্যে আমাদের প্রাণ উৎসর্গিত। আমাদের ঘরে ঘরে মেয়েরা উর্দুতে শায়েরী করে। খোদার মেহেরবানিতে আমার দিদিমা বেহেশতে চিরশান্তি ভোগ করুন, লক্ষ্ণৌয়ের এক ছাপাখানা থেকে তাঁর একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কমলারাণী নাতোয়ার নাম নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন আপনি! জী হাঁ, তিনিই, তিনিই। জী হাঁ, তিনিই এই অধমের দিদিমা ছিলেন মরহুমা…

উমেশ : পুরণচন্দ্র পন্তের প্রতি

পন্তজী পাহাড়ী, হিন্দী ও উর্দুরও আগে, অনেক আগে, কমাও অঞ্চলের পার্বত্য ভাষাই ছিল এখানকার অধিবাসীদের মূল ভাষা। পার্বত্য ভাষার যথার্থ মর্যাদা ও যথাযোগ্য স্থান পাওয়া একান্ত প্রয়োজন। আমি আজকাল পার্বত্য ভাষার অনুকূলে একটি মেমোর‍্যাণ্ডাম তৈরি করছি। ইলেকশনের পর আপনাকে দেখাব। মেমোর‍্যাণ্ডামটি রাষ্ট্রপতিসকাশে পেশ করতে চাই। পার্বত্য ভাষার সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্যে পার্লিয়ামেণ্টে বিল পেশ করব আমি। তাছাড়া উত্তর-প্রদেশ সরকারকে বাধ্য করব যাতে আগের মতোই নৈনিতালে একটি অ্যাসেম্বলি ভবন স্থাপন করা হয় এবং সেখানে রাজ্যপালের ভাষণ দেওয়া হয় বিশুদ্ধ পার্বত্য ভাষায়।

উমেশ : কৃষ্ণকান্ত যোশীর প্রতি

যোশীজী, কমাও অঞ্চলের অধিবাসীদের অধিকার যদি আদায় না হয়, তাহলে উমেশ নারায়ণ সাক্সেনা পার্লিয়ামেন্টের সদস্যপদে ইস্তফা দেবে। পার্লিয়ামেন্টের মেম্বার হওয়ার কোন বাসনা নেই আমার। ঈশ্বরের দয়ায় বাড়িতে খাওয়া-পরার অভাব নেই। আমি নিজে ব্যারিস্টার। সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেটও। বর্তমান সরকার তো আমাকে জাস্টিস পদের অফারও দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি তা গ্রহণ করিনি। আমার মনের মধ্যে কমাও-এর লোকদের জন্যে কিছু দুঃখ-বেদনা আছে। আমি কি নিজের চোখে দেখছিনে বাইরে থেকে লোকজন কমাও অঞ্চলে এসে কিভাবে এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে? আপনার পাশেই যে শহাল সিং রাবতের ছড়ির দোকান ছিল, সেখানে আজকাল এক পাঞ্জাবী ফলওয়ালা বসছে। ওর কাছেই বসত তোতারাম ময়রা, সেখানে এখন সিন্ধ্রী সুইট হাউস খোলা হয়েছে। নৈনিতালের সবচেয়ে বড় জহুরী আতর চন্দ জয়পুরওয়ালা। কমাও-এর সবচেয়ে বড় ঠিকেদার পাঞ্জাবী। কমাও ডিভিসনের কমিশনার সাউথ ইণ্ডিয়ান··· কমাও-এর অধিবাসীদের ওপর যে-নির্যাতন চলছে, সেটা কি আমার হৃদয়কে নাড়া দেয় না? একদিক থেকে দেখতে গেলে আমি নিজেও কমাও-এর লোক। আমার মা কাঠগুদামের মেয়ে ছিলেন। অবশ্য পরে ওঁর দাদা বেরিলি চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানেই ওঁর বিয়ে হয়। তারপর মা-র আর কখনো কাঠগুদামে আসা হয়ে ওঠে নি। কিন্তু ছিলেন তো কাঠ-গুদামের মেয়ে—তাই আপনারা আমাকে কমাও-এর লোক বলেই ধরবেন। বাইরের লোকদের অত্যাচার, বাইরের লোকদের অবিচার···

উমেশ : উত্তম সিং নিরাওলার প্রতি

তাহলে সর্দারজী, যদি বাইরের লোকেরা কমাও-এর অধিবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, সেটা তাদের নিজেদের অধ্যবসায়ে। আপনি তো নিজেই বলেন, আপনি যখন কমাও অঞ্চলে আসেন, তখন আপনার পকেটে ছিল মাত্র আট আনা পয়সা। আর আজ আপনি কমাও-এর জঙ্গলে আশী লক্ষ টাকার ঠিকে নিয়ে রেখেছেন। তাহলে এটা কি আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল নয়? কোন কমাও-এর লোক কি আপনাকে ব্যাঙ্ক থেকে বার করে দিয়েছিল এই টাকা? না সর্দারজী আপনার মেহনত, আপনার সততা, আপনার সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার এবং আপনার বিচক্ষণতার মধ্যেই আপনার সাফল্যের চাবিকাঠি। আমি তো বিদেশীদের বড় অনুরাগী সর্দারজী। সত্যি বলছি একথা। এটা তো আমাদের নিজেদের মধ্যে আপস-আলোচনা। এটা অন্য কাউকে বলার কথা নয়। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, বিদেশীরা না থাকলে কমাও-এর লোকেরা হয়তো না খেতে পেয়ে মরতো। ও শালাদের আছেটা কি? চরস-খাওয়া জাত! সারাদিন জঙ্গলে ঠক্ঠক্ করে কাঠ কেটে একটা বোঝা বাঁধবে, আর সন্ধ্যেয় ফিরে নৈনি-

তাদের বাজারে সেটা বিক্রী করবে। ওদের দিয়ে কি কাজ হবে সর্দারজী! ····· এই বয়েসেও আপনি যেমন মন দিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন —কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য! এই তো সেদিন, কাঠগুদামে যার কাঠ-চেরাইয়ের কারখানা আছে, সেই সর্দারেশ সিং মালহোত্রা আমায় বলছিলেন, নৈনি বাজারের মসজিদের কাছে যে গুরুদরওয়াজাটি তৈরি করা হয়েছে, তার মেঝের জন্যে সমস্ত মার্বেল পাথর আপনি না-কি নিজের পকেট থেকে কিনে দিয়েছেন। অথচ সে-কথা একদিনও বলেননি আমায়! আশ্চর্য···আশ্চর্য! এটা তো ঘটনা, প্রায়ই দেখা যায় যে, বড়লোকেরা সুদিনের সময় ঈশ্বরকে ভুলে যান না। কিন্তু আপনি তো কখনো ভুলে যান নি। আর তাই সৎগুরু মহারাজও আপনাকে ভোলেন না। ওয়াহ্ গুরু— ওয়াহ্ গুরু—

উমেশ : ডঙ্গরগড়ের রাজার প্রতি
আজ্ঞে না, কোনো পলিটিক্যাল পার্টির সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। আমি একজন স্বাধীন নির্দল প্রার্থী···

শায়স্তো : কমলের প্রতি
তোমার এই উমেশটাকে আমার একেবারেই পছন্দ না।

আট

ওরা দুজনে চীনা ঘাটের একটি তৃণভূমিতে বেড়াচ্ছিল। চীনা পিকের দিকে যাওয়ার পথে দেবদারু-বনে এই গোপন জায়গাটি। জায়গাটির সন্ধান শুধু তারা দুজনেই জানে, দুদিকে উঁচু উঁচু পাথরের রাশি, একদিকে খাদ, অন্যদিকে দেবদারুর দীর্ঘ সারি। ঘন বৃক্ষরাজি একটির সঙ্গে অন্যটি জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। ওরাই জায়গাটা আবিষ্কার করেছিল। যেন ওদের দুজনের জন্যেই জায়গাটি তৈরি হয়েছে এবং তাদের জন্য সেই আদিকাল থেকেই রয়েছে। দুদিকে উঁচু পাথরের রাশি, একদিকে খাদ, অন্যদিকে দেবদারু বন। পায়ের নীচে ছোট্ট তৃণভূমি, মাথার ওপর একফালি আকাশ। ছোট্ট জায়গাটার জন্যে আকাশটাও কত ছোট্ট। যেন একটা ঘরের ছাদ। ওরা দুজন ছাড়া এখানে কেউ আসে না। মাঝে মাঝে দুচারটি খরগোশ আসে, ওদের দেখেই দৌড়ে পালায়। মাঝে মাঝে খাদের ধারে তাদের সাদা সাদা লম্বা কান দেখা যায়, যেন কান খাড়া করে তারা ওদের প্রেমালাপ শুনছে। তারপর আবার নিজের নিজের ঝোপে গর্তে ঢুকে পড়ে, আর সেই প্রেমালাপই তারা পুনরাবৃত্তি করে। প্রেমের এই পুনরাবৃত্তি ঘটছে সেই আদিকাল থেকে। তাই কখনো পুরনো হয় না। সাদা-কান খরগোশেরা এর পুনরাবৃত্তি করে, পুনরাবৃত্তি করে, উদাস চোখ হরিণেরা। বরফ থেকে উৎপন্ন পার্বত্য স্রোতের ধারা

রুদ্ধগতি হয়ে প্রেমের সরোবর সৃষ্টি করে। আর ক্লাবের দরজায় ডুলি থেকে নামতে না-নামতেই প্রেম আর প্রেম থাকে না। প্রেম তখন বিজনেসে পরিণত হয়ে যায়।

'তোমায় ধমকানোটা মার অন্যায় হয়েছে। তুমি আমার কাছে হিন্দুও নও, মুসলমানও নও, তুমি আমার স্বামী। যদি সে একজন নারী হয়, তাহলে এটাই তার জন্যে যথেষ্ট। ঈশ্বর আদমকে তার ধর্ম জিজ্ঞেস করেননি। এক নারী তাকে যেমন আপেল খাইয়েছিল, আমিও তেমনি তোমায় আঙ্গুর খাওয়াব।'

শায়েস্তা একটা ঝুঁকে-পড়া ডালের আঙ্গুরগুচ্ছ থেকে কয়েকটা আঙ্গুর পেড়ে নিল। তারপর সেগুলো কমলের মুখে গুঁজে দিল।

'সত্যিই তুমি আমায় এত ভালোবাস?'

'ভালোবাসা শব্দটিই তো বিবর্ণ হয়ে গেছে। তুমি তার পোশাকটা দেখছ না, ধূসর হলদে ছোপ! ওগুলো হচ্ছে মানুষের বাসনার বমি। ভালোবাসার নাম নিও না। আমাদের দুজনের মাঝখানে যেন ও শব্দটি না আসে। আঙ্গুরগুলো মিষ্টি না?'

'উঁহু অম্লমধুর।'

'হ্যাঁ সমস্ত সুন্দর বাসনাই ওইরকম অম্লমধুর। তিক্ত অথচ পেলব। আকাশের রঙ আর সরোবরের সুরভি। অরণ্যের ঘুম আর মাঠের শীতল হাওয়ার স্পর্শ। কণ্টক যন্ত্রণা আর মধুর অশ্রু। ভালোবাসার বেদনা থেকে নির্গত অশ্রুও মধুর বলে মনে হয়। কখনো কি তুমি সেটা অনুভব করেছ? ভালোবাসা হচ্ছে দুটি প্রতিকূল অবস্থার মিলন। আর মিলনের চেয়েও অধিক উদারতা। আকবর সেটা উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই উদারতা ছিল একমুখী। তিনি হিন্দু সম্প্রদায় থেকে মেয়ে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাদের কোন মেয়ে দান করেননি। এটাই ছিল তাঁর ক্রুটি। নইলে মুঘল শাসন এখনো এক হাজার বছর টিকে থাকত।'

'মনে হয় পরিস্থিতি তাঁকে বাধ্য করেছিল।'

'আমি এটা মেনে নিতে রাজী নই। তিনি খুব বিচক্ষণ, জ্ঞানী এবং দূরদর্শী ছিলেন। তিনি ছবির শুধু একটা দিকই দেখেছিলেন, এটা হতে পারে না।'

'তুমি কি সেজন্য ভারসাম্য ঠিক করতে চাইছ?'

'আমি কী ঠিক করবো! সে সময় চলে গেছে, সে সুযোগও নষ্ট হয়েছে। এখন তো এমন একটা যুগ, যখন সমাজের নগ্নদেহে পেয়ারার একটি পাতাও অবশিষ্ট নেই।'

'সেজন্যেই তো আমরা পৃথিবী থেকে পালিয়ে এসে এই তৃণভূমিতে লুকিয়ে দেখা সাক্ষাৎ করছি।'

'আচ্ছা, এখন চুপ করো।'

'না আমিও তো কিছু বলতে চাই। আজ যে কথাটা বলতে চাই সেটা।'

'চুপ।' বলেই শায়েস্তা ওর মুখ আঙ্গুরে ভর্তি করে দিল। তারপর নিজের ঠোঁট

রাখল তার ঠোঁটে, যাতে কমল কিছু বলতে না পারে।

কমল চোখ বন্ধ করল। রক্তে তার ভীষণ আলোড়ন। চোখ খুলে দেখল, আকাশও মুখর। খাদের ধারে খরগোশগুলো কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ তুলে পদ্মরাগমণির মতো লাল-লাল চোখ মেলে চেয়ে দেখছে। তাদের দিকে চেয়ে হাসছে যেন। আঙুরের থোকাগুলি শিশুর মতো শূন্যে ঝুলতে ঝুলতে আনন্দে চিৎকার করছে যেন। বাতাস তার পালকের মতো নরম আচ্ছাদনে ঢেকে দিল তাদের। মাটি তাদের আপন কোলে টেনে নিয়ে বলল, 'এটাই তো হয়ে থাকে বাছা। হাজার হাজার বছর থেকে এটাই তো হয়ে আসছে। তোমরা কি জান যে তোমরা প্রেম করছ? আমি শুধু তোমাদের উপলব্ধির কথা ব্যক্ত করছি। এবং এই উপলব্ধির চারপাশে পরিক্রমণ করতে করতে আমি সূর্যকে খুঁজছি। আসলে সূর্যের কাছে ভালোবাসার প্রত্যাবর্তনই হচ্ছে আদি আকাঙ্ক্ষা। সেজন্যে ভালোবাসা একটি চমৎকার শোকাতুর বিলাপ। কারণ এ আকাঙ্ক্ষা কখনো পূর্ণ হতে পারে না। সূর্যের কাছে পৌঁছতে পারে না কখনো। তার সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজের ব্যক্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না। সূর্য ছাড়া কিছুই থাকে না শেষ পর্যন্ত। এই জন্যেই ভালোবাসা হচ্ছে একটি শ্রেষ্ঠ ত্যাগ —হাজার হাজার বছরের মাঝখানে, নারী আর পুরুষের মাঝখানে। এটা পূর্ণ মিলন নয়। মিলনের মধ্যে কোন ব্যক্তিই অবশিষ্ট থাকে না—'

'কিন্তু আমি আমার ব্যক্তিত্ব বজায় রাখব।' কমলের বাহুপাশ থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে শায়েস্তা বলল।

'কী বলছ তুমি? কই, আমি তো কিছু বলিনি তোমায়!' বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কমল।

'কে যেন আমার সঙ্গে কথা বলছিল।'

কমল আরো আশ্চর্য হয়ে বলল, 'কে?'

'হয়তো কেউ। মাঝে মাঝে আমি আশ্চর্য সব কথাবার্তা শুনতে পাই।'

'কী কথা?'

'জানিনে। তবে বড় রহস্যময় সে কথাবার্তা। আমার জীবনের প্রথম দিন থেকেই যেন শুনে আসছি আমি। চল, যাই এখান থেকে। এখন এ-জায়গাটা আমার কাছে অজানা মনে হচ্ছে।'

'অজানা কেন?'

শায়েস্তা রহস্যময় কণ্ঠে বলল, 'জানিনে। মাঝে মাঝে তোমাকে দেখেও আমার অচেনা লাগে। এক মুহূর্তের জন্যে হলেও হঠাৎ সন্দেহ হয়, এ তো কমল নয়, যাকে আমি ভালোবাসি। এ অন্য আর কেউ। এক অপরিচিত কমল, যাকে আমি চিনিনে পর্যন্ত। আমার ভীষণ ভয় করতে থাকে তখন। তোমার কি এরকম হয় না কখনো?'

কমল চিন্তিতভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'না।'

শায়েস্তা জোরে হেসে উঠল, 'আমি কী বোকা! তোমাকে এরকম প্রশ্ন করছি! পুরুষরা তো আবেগে ডুবে যায় না কখনো। তারা সব সময় হৃদয়ানুভূতির ওপরে থাকে শুধু। ঠিক সেটা যেন জলের ওপরে সাঁতার কাটা, জলের গভীরে ডুব নয়।'

কমল জিজ্ঞেস করল, 'আর মেয়েরা যখন যায়, তখন জলের গভীরে যায় কি?'

শায়েস্তা হেসে বলল, 'সেজন্যেই ঠকতে হয় তাদের। এই সুধাকেই ধর না। ও মনে করে, কুমার মরাতব আলি ওর প্রেমে পাগল। কিন্তু আমি জানি, সে সুধাকে ভালোবাসে না।'

'কী করে জানলে তুমি?'

'কারণ ও আমাকে ভালোবাসে। দুবছর আগে, তুমি তখনো আসনি এখানে, যখন বসন্ত আসেনি, রঙের খেলা শুরু হয়নি, বাতাস চুপিচুপি…'

'আচ্ছা আচ্ছা, এখন কবিত্ব রাখ। আগে বল, দু বছর আগে কী হয়েছিল?' কমলের কণ্ঠস্বরে বেশ তিক্ততা।

'দুবছর আগে ও আমায় ভালোবাসতে শুরু করে। আমি চাইতুম না, কিন্তু তবুও আমায় ভালোবাসত। আমার মায়েরও মত ছিল তাতে। শেষ পর্যন্ত আমার ওপর জোরজবরদস্তি করে মা ওর সঙ্গে আমার প্রায় বাগদানের ব্যবস্থা করে ফেলেছিল আর কী।'

'প্রায় বাগদানের ব্যবস্থা?'

'মানে বাগদানের কাজ হতে যাচ্ছিল, ঠিক এমন সময় তুমি এসে পড়লে। আর তুমি আসতেই—' শায়েস্তা চুপ করে গেল।

কমল অস্থির কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ, আমি এসে পড়লাম। তারপর?'

'তারপর? তারপর কুমার রিবাউণ্ড করল। আর সুধার চারদিকে পরিক্রমণ শুরু করল। বলতে গেলে, সুধাও ওকে ভালোবাসে না।'

'অঁা!' বিস্ময়ে কমলের মুখ হাঁ হয়ে গেল।

'হিন্দু মেয়ে বলে চমকাচ্ছ কেন? তোমার ধারণা, ভালোবাসাটা হিন্দু মেয়েদের একচেটিয়া?' শায়েস্তার কণ্ঠেস্বরে ক্ষোভ দিতে লাগল।

'কিন্তু —'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরাই সব ধোয়া তুলসীপাতা, আর বাকী সবাই ঘাস।' শায়েস্তা একলাফে ঘাস থেকে উঠে দাঁড়াল। জোরে জোরে পা ফেলে দেবদারু-বনের দিকে হাঁটতে লাগল। কমলও ওর পেছনে ছুটতে ছুটতে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু আমি কি করেছি যে একেবারে দপ করে জ্বলে উঠলে?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি দপ করে জ্বলে উঠি, আর তুমি একেবারে শান্তিজল! পাজী হিন্দু কোথাকার!'

কমল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভীষণ হাসতে লাগল। কারণ দেবদারু গাছগুলোর কাছে এসে ওরা পৌঁছে গিয়েছিল। ঘন আঙুরলতা গাছগুলোকে জড়িয়ে জড়িয়ে

এমন দুর্ভেদ্য জালে তৈরি করেছে যে, শায়েস্তার পক্ষে পার হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

কমলের হাসিতে শায়েস্তার রাগ বেড়ে গেল আরো। ঘুরে দাঁড়িয়ে সে কমলের গালে এক চড় মারল। তারপর আবার বনের দিকে এগিয়ে যেতেই আঙ্গুরলতায় পা জড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল সে, এমন সময় কমল তাকে দুহাতে তুলে নিল। কমলের পথ জানা ছিল। অসংখ্যবার সে তাকে তুলে নিয়ে বাহুপাশে আবদ্ধ করে পথ পার করে দিয়েছে। অন্যসময় এই মুহূর্তটি শায়েস্তার কাছে বড়ই প্রীতিকর। কিন্তু আজ শায়েস্তা তার এই আলিঙ্গনের মধ্যেও ছটফট করছিল। কমলের কাছ থেকে সরে যাবার চেষ্টা করেছিল সে। কিন্তু কমলের বাহুবন্ধন শক্ত ছিল বলে শায়েস্তাকে হার স্বীকার করতে হল। দেহ বিবশ হয়ে এল তার। বাহু দুটোও আপেলের শাখার মতো ঝুলে পড়ল। শ্বাস-প্রশ্বাসে রাগের ভাবটা কমে আসতে লাগল যেমন তেমনি সেখানে এক আনন্দানুভূতি ফুটে উঠতে লাগল।

পথ পার হয়ে ওরা যখন বনের অন্তপাশে এসে পৌছল, তখন আকস্মিক ভাবে ওরা বনের ধারে দেখতে পেল সুধা আর মরাতব আলিকে। সুধার পরনে ছিল আকাশী রঙের শাড়ি, হাতের কবজিতে জয়পুরী মিনার কাজ করা কঙ্কণ। কুমারের হাতে ছিল ঘোড়ার চাবুক। স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্যের দুটি ছবি। হাসি-খুশীতে দুজনে পরস্পরের হাত ধরে হাঁটছে।

সুধা ও মরাতব আলি দুজনেই ওদের দুজনকে বন থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছিল। কুমার একবার বিস্মিত দৃষ্টিতে বনটার দিকে তাকাল। যেন বুঝবার চেষ্টা করল, কোত্থেকে আসছে ওরা ? পর মুহূর্তেই কমল ও শায়েস্তা ওদের দুজনকে সম্ভাষণ করল, 'হ্যালো !'

একইভাবে কুমার ও সুধাও সাড়া দিল, 'হ্যালো।' তারপর ওরা দুজনে ওপরের দিকে চলে গেল। শায়েস্তা ও কমল নীচে নামতে শুরু করল।

অনেকটা নীচে নামার পর কমল খুব নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তুমি সুধার ব্যাপারে কি বলছিলে যেন ?'

এখন শায়েস্তার রাগ পড়ে গেছে। সে কমলের হাতে মৃদু চাপ দিতে দিতে বলল, 'পাগল, আমি বলছিলাম যে সুধা কুমারকে ভালোবাসে না। ঘটনাচক্রে হল কি সে সময়—একেবারে ঘটনাচক্রই আর কি —সে সময় ক্লাবে কোনো উপযুক্ত অবিবাহিত যুবক ছিল না। সে জন্তেই সুধাকে কুমারের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। সে-ই এখন তার ক্লাবের বিল মেটায়, ড্রেস তৈরী করিয়ে দেয়, সুধায় যাবতীয় শখ তামাশা মেটায়। নইলে রাজকুমারী পরিবার তো এখন একেবারে ফতুর।'

'আরে না না।' কমলের মুখ দিয়ে কথাটা যেন ছিটকে বেরল।

'না মশাই। মোটেই না। ও সতী সাবিত্রী হিন্দু মেয়ে কি না ! যতসব নোংরা জঞ্জাল আমার মধ্যেই। ওর প্রেম তো বিশুদ্ধ গঙ্গাজল, ওর মন সতীদাহর জন্য প্রস্তুত ! তা ওর সঙ্গেই প্রেম করো না ! তাছাড়া ওর গায়ের রঙটাও আমার চেয়ে ফরসা। শরীরের দিক দিয়েও লম্বা। চোখ দুটোও নীলচে নীলচে।

'ধ্যুত! তুমি ভুল করছ। আমি তা বলতে চাইনি।'

'জানিনে বাবা, তুমি কি বলতে চাইছ। আমি কিন্তু নিজের কানে শুনেছি, ক্লাবের এক কোণে রাজা হিম্মত রায় ওকে ধমকাচ্ছিল। রাজকুমারী সুধার ওপর রাগে ফেটে পড়েছিল ও। কারণ, ও একটা মুসলমানের সঙ্গে প্রেম করছে কেন? আর জানো, সুধা তার কী জবাব দিয়েছিল? বলেছিল প্রিভি পার্সের কিছু অংশ আমায় দাও না? মোটে সাতশো টাকা আমি পাই। আর এই সাতশো টাকায় তো আমার পেট্রোলের খরচটাও মেটে না। তাহলে তোমার রাজপুত বংশের মান-মর্যাদার জন্যে আমি কি না খেয়ে মরব? আমি নিজের কানে কথাগুলো শুনেছি মশাই। কিন্তু তোমার বিশ্বাস হবে কেন, ও যে হিন্দু মেয়ে!'

ইতিমধ্যেই শায়েস্তার স্টুডিও-র কাছে এসে পৌঁছে গিয়েছিল ওরা। শায়েস্তা কথা শেষ করে দ্রুত ভেতরে চলে গেল। আর কমলও ভেতরে ঢুকতে যাবে, এমন সময় দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল সে।

কমল অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে থাকল।

নয়

কটনঘাটি ছাড়িয়ে ফুলওয়ালীঘাটি। অসংখ্য ফুলের সমারোহ সেখানে, সেটাই তার নামের তাৎপর্য। লাল, নীল, ধূসর, হলুদ গোলাপী, কমলা—নানারঙের ফুল। নারীর ওষ্ঠের মতো জ্বালাময় এবং তার স্পর্শের মতো মেদুর অজস্র ফুল ফুটে থাকে পাহাড়ী ঢালুতে বসন্ত থেকে হেমন্ত পর্যন্ত। তার মধ্যে দেশী ফুলও যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে বিদেশী ফুলও। একদা এখানে এক পার্বত্য রাজার প্রাসাদ ছিল। এখন তা ধ্বংসস্তূপ। প্রাসাদটি ছিল পাহাড়ের ওপর সমতলে। শোনা যায়, পাহাড়ের চারদিকে, ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত, অসংখ্য ফুলের গাছ লাগিয়েছিলেন রাজা। প্রাসাদ আজ বিধ্বস্ত, রাজবংশ অবলুপ্ত। কিন্তু বংশপরম্পরায় টিকে রয়েছে কোমল ফুলগুলি। ওদের সৌন্দর্য সৌরভ নষ্ট করা সহজ নয়। কারণ কোন মালী এই উদ্যানের পরিচর্যা করে না—পরিচর্যা করে প্রকৃতি। উন্মুক্ত প্রান্তর, নির্মল বাতাস, উজ্জ্বল রৌদ্র আর মেঘের সিক্ত অঙ্গুলি মাটির গহ্বরে ফুলের বীজগুলিকে সস্নেহ আদর করে, তাদের ফুল ফোটানোর জন্যে উত্তেজিত করে, ঠিক যেমন আয়না বারো বছরের মেয়েকে চোদ্দ বছরের সৌন্দর্য লাভ করার জন্যে চঞ্চল করে তোলে।…কমল এইসব ভাবতে ভাবতে চারদিকে চেয়ে দেখছিল আর হাল্কা, তাজা, আতরের মতো সুগন্ধে ভরপুর হাওয়ায় জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। আজকের আবহাওয়াটা ভারি সুন্দর। কোথাও রৌদ্র, কোথাও ছায়া। কোথাও ঝোপঝাড়, কোথাও লতাপাতা, কোথাও ফুল, কোথাও বা গাছ। পাহাড়ের সমতল জায়গাটিতে প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। ছয়টি গ্রীক স্তম্ভ সেখানে এখনো দাঁড়িয়ে। সেগুলোর মধ্যে পাথরের লম্বা-চওড়া শক্ত মেঝে

এখনো অটুট অক্ষত। বাকি সবকিছু ধ্বংসস্তূপে পরিণত। পরিষ্কার ঝলমলে দিন দেখে ক্লাবের মেম্বাররা মাঝে মাঝে এখানে পিকনিক করতে আসে। ঠিক এই সময় ইয়াট ক্লাবের ব্যাণ্ড-পার্টি নিজেদের সাজসজ্জায় সুসজ্জিত হয়ে একপাশে কয়েকটি ফোল্ডিং চেয়ারে বসে বসে বাজনা বাজাচ্ছে। কারণ পার্টি এখনো জমেনি। কিছু লোক আসতে এখনো বাকি। যারা এসে পড়েছে, তারা পাহাড়ের ঘাসে-ঢাকা মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে। টিক্কা জগজিত সিং অনাবিলার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনাবিলা তালগাছের মতো দীর্ঘাঙ্গিনী হলেও ইউরোপীয়ান তো! টিক্কারাণী কুলবন্ত কোর মেজর মেহতার সঙ্গে ঘন দেবদারু গাছের আড়ালে পদচারণা করছে। মেজর মেহতা তার কানে বল-বীয়ারিং-এর গুলির মতো নানা কুমন্ত্রণা ছুঁড়ছে। গোল-গোল বর্ণাঢ্য মন-ভোলানো মন্ত্রণা। ওইসব গোলাগুলিতে টিক্কারাণীর কান যখন ভর্তি হয়ে যাবে, তখন মেজর মেহতা তার কোমরে হাত দিয়ে ভালোবাসার নাট-বল্টু আটকে দেবে।

মেজর মেহতা অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে কাজ করে। সে মনে করে, একটি উৎকৃষ্ট মানের মেয়ে এবং একটি উৎকৃষ্ট মানের স্টেনগানের গঠন, বিন্যাস আর যন্ত্রপাতির পারম্পর্য একই ধরনে, একই নিয়মে কাজ করে।

রাজকুমার নগ্‌রম হাঙ্গেরীর এক সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে এসেছে এই পিকনিকে। সোনালী চুল, সবুজ চোখ, দেখতে ভীষণ সাদা। সযত্নে-ছাঁটা সোজা সোনালী চুলগুলো মুখের দুপাশে এসে পড়ে তার চেহারাটাকে রহস্যময় করে তুলেছে।

আন্না লেক বালব্রতান জেলার মেয়ে। সন্তরণে পটু। সেরা মদ, উপাদেয় খাদ্য এবং প্রিয়দর্শন পুরুষের প্রতি আসক্ত। রাজকুমার নগ্‌রম পাশ্চাত্য প্রণয়ের সমস্ত অন্ধিসন্ধিতে পারদর্শী। সেজন্য সে ক্লাবের মধ্যে শীঘ্রই আন্নার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল। আন্নার কাছেও সেটা ছিল হৃদয়গ্রাহী এক এশীয় অভিজ্ঞতা। সে এখানকার কমাও-এর পার্বত্য অঞ্চলের লোকগীতি সংগ্রহ করতে এসেছে। মেয়েদের লোকগীতি সাধারণত পুরুষদের উদ্দেশেই রচিত হয়। তাই লোকগীতি-সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষসংগ্রহও অত্যাবশ্যক। আন্না যখন তার নীলরঙের দীর্ঘ চক্ষু পল্লব দুটি তুলে তাকায়, তখন রাজকুমার নগ্‌রমের মনে হয়, নীল জলের হ্রদ থেকে কোন এক জলপরী উঠে এসে তার দিকে চেয়ে রয়েছে।

আন্না বলছিল, 'আমাদের বালব্রতান হ্রদের জল খারাপ ঋতুতেও সুন্দর এবং ঈষদুষ্ণ থাকে। কিন্তু তোমাদের অঞ্চলে হ্রদের জল খুব ঠাণ্ডা।'

রাজকুমার নগ্‌রম বলল, 'জল ঠাণ্ডা হতে পারে, কিন্তু আমাদের এলাকায় পুরুষের হৃদয় বড় গরম।'

আন্না মুচকি হাসল। চাপা ঠোঁট দুটো ফাঁক হল একটু। মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কতটা গরম?'

রাজকুমার নগ্‌রম এদিক-ওদিক চাইল। যেখানে ওরা দুজন দাঁড়িয়ে কথা

বলছিল, সেখানে কোন আড়াল ছিল না। কয়েক গজ দূরে একটা গাছে চামেলীফুলের লতা ঝুলছে। কিন্তু দূরত্বটা তো কয়েক গজ। অথচ সে-সময় তাদের দুজনের ঠোঁটের ব্যবধান কয়েক ইঞ্চি মাত্র।

আন্না ওর ইচ্ছেটা বুঝতে পেরে বলল, 'দাঁড়াও একটু, চুলে কয়েকটা ফুল গুঁজে নিই।'

'উঁহু' বলেই রাজকুমার নগ্‌রম সকলের সামনেই আন্নাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। আন্নাও দুটি হাত বাড়িয়ে দিল তার গলার দুপাশে। এসময় যদি রাজকুমার নগ্‌রম তাকে চুম্বন করত, তাহলে দুলতে থাকত সে। কেমন হত সেই চুম্বন? মিষ্টি না হলেও, মধুর মতো স্বাদ দিত না কি! আন্নার চোখ বুজে এল।

সেই সময় তাদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল কর্নেল সিনহা আর মিসেস সিনহা। মিসেস সিনহা চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ওহ্ মাই ডিয়ার, সবাই দেখছে যে!'

আন্না বলল, 'লুকোচুরি সেক্সের পক্ষপাতী নই আমি।' এই কথা বলেই আন্না আবার রাজকুমার নগ্‌রমকে আলিঙ্গন করল।

কর্নেল সিনহা আড়চোখে ওদের পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে দেখল। তার মনে হল, এই অনুপম পার্বত্য উপত্যকার উন্মুক্ত প্রান্তরে সেক্সও সরল শিশুর মতো আত্মবিস্মৃত আনন্দমুখর দেখায়। সে বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে রাজকুমার নগ্‌রম আর আন্নার দিকে তাকাল। তারপর সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে তাকাল নিজের কুৎসিত সহধর্মিণীর দিকে। কোমর থেকে অনেকটা ওপরে পিঠে তার ছোট্ট কাঁচুলি। কাঁচুলির বাইরে ঝুলছে থলথলে মাংসপিণ্ড। কেন যে এই বয়সে এখনো মিসেস সিনহার স্বল্প-পরিসর কাঁচুলি পরার শখ! কর্নেল সিনহা উসখুশ করতে লাগল। তার মুখ-চোখ অসন্তোষে কালো হয়ে উঠল।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে একটি শিলাখণ্ডের আড়ালে পৌঁছল ওরা। মিসেস সিনহা স্বামীর হাত ধরে বড় সোহাগ-ভরা কণ্ঠে বলল, 'ডার্লিং, মনে পড়ে, চল্লিশ বছর আগে আমরা লালঠপ্পায় এইরকম পিকনিক করতে গিয়েছিলাম? তুমি কি করেছিলে বল তো।'

তারপর কী যেন একটা মনে করে মিসেস সিনহা চোখ নাচাল। কোমরে মোচড় দিল। হাবভাবে এমন একটা কিছু বোঝাতে চাইল যে কর্নেল সিনহার গা বমি-বমি করতে লাগল। মেয়ে মানুষ এক আশ্চর্য বস্তু! আজ থেকে চল্লিশ বছর আগের একটি ঘটনা স্মৃতিতে এমন প্রাণবন্ত করে তুলতে পারে, যেন কয়েক মুহূর্ত আগেই তা ঘটেছে।

মিসেস সিনহার ছলাকলা ভ্রূভঙ্গি আর আদর সোহাগ দেখে কর্নেল সিনহা বুঝতে পারল, লালঠপ্পার ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি চায় সে এখানে।

সে তাড়াতাড়ি একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল।

'কী হল?' মিসেস সিনহা তাকে বিমর্ষ দেখে জিজ্ঞেস করল।

'কিছু না। পেট ব্যথা করছে।' কর্নেল সিনহা হাত দিয়ে পেট চেপে ধরল।

কটনঘাটি থেকে একদল যাচ্ছিল নীচে ফুলওয়ালীঘাটির দিকে। কমলের ঘোড়ার লাগাম ধরে ছিল গঙ্গারাম। কাছাকাছি শায়েস্তা ঘোড়া চালিয়ে আসছিল গুনগুন করতে করতে। তার পরনে ছিল বেগুনী রঙের মখমলের যোধপুরী। গায়ে ছিল ভীষণ হালকা সিমন রঙের নেটের ব্লাউজ। খোলা কলার। কলারের ফাঁক দিয়ে তার উচ্ছ্রিত বুক প্রথম প্রভাতের আকাশের মতো দেখাচ্ছিল। ভেতরের কাঁচুলির গোলাপী আভা চোখে পড়ছিল। গুনগুন করে গান গাইছিল শায়েস্তা, 'ধীরে চলো···ধীরে চলো বন্ধু হে—'

বিনা কারণেই গঙ্গারামের মুখ-চোখ রাগে লাল। কমল জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপার কী গঙ্গারাম? আজ সকাল থেকেই তুই আমার সঙ্গে কথা বলছিস নে যে?'

গঙ্গারাম মৃদুকণ্ঠে বলল, 'বাবু, বলার মতো কথা থাকলে বলতে হবে বৈ-কি।'

কমল হেসে বলল, 'আচ্ছা!'

শায়েস্তার ঘোড়া কমলের খুব কাছে এসে পড়েছিল। শায়েস্তা তার হাত ধরে বলল, 'এইসব পাহাড়িয়ারা খুব চালাক। ওদের মনে এক কথা, মুখে আর-এক।'

গঙ্গারামের চোখ দুটো দপ করে জ্বলে উঠল। পরমুহূর্তে আবার তা নিভে গেল। ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল একটু, যেন কিছু বলতে চায়। কিন্তু ঠোঁট দুটো আবার শক্ত হল। অবশেষে তার নিষ্কলঙ্ক দুগ্ধশুভ্র গাল দুটো রক্তাভ দেখাতে লাগল শুধু। সেটা তার ক্রোধের লক্ষণ। কিন্তু কারণটা জানা ছিল না। সে-সম্বন্ধে কমলের কৌতূহলও ছিল না বিশেষ কিছু। কেননা সে-সময় শায়েস্তার হাত তার হাতখানিকে কিছু বলছিল যেন। তারপর সামনে একটা এবড়ো-খেবড়ো ঢালুর কাছে এসে পৌঁছতেই দুজনের হাত ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই বিদ্যুৎ-প্রবাহের মতো কথাবার্তা স্তব্ধ হয়ে গেল, যেন কানেকশন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

তাদের পেছনে রাজকুমারী সুধা ডুলিতে চেপে আসছে। পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়ে আসছে কুমার মরাতব আলি। দুজনের মধ্যে কথাবার্তা চলছে। তাদের পেছনে বেগম জাবেদ আর রাজা হিম্মত রায়ের ডুলি। সবার পেছনে অশ্বারূঢ় উমেশ। সকলেই কটনঘাটি থেকে নীচে ফুলওয়ালীঘাটির দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

অকস্মাৎ গঙ্গারামের বোন তারা তাদের অন্ধকার কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে এল। ছুটতে ছুটতে গঙ্গারামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'দাদা, কোথায় যাচ্ছ?'

গঙ্গারাম বলল, 'নীচে ফুলওয়ালীঘাটিতে বাবুদের পিকনিক।'

'আমিও যাব দাদা।'

'তুই গিয়ে কী করবি?'

কমল বলল, 'আচ্ছা, ও চলুক না সঙ্গে। দুজন বেয়ারা কম পড়বে হয়তো। খাবে ওখানে। দু-চার টাকাও হয়ে যাবে।'

গঙ্গারাম বেশ কঠোর স্বরে বলল, 'না, তুই ঘর যা।'

তারা জিভ বার করে গঙ্গারামকে মুখ ভেঙচাল। বলল, 'আমি যাবই।'

উমেশ জোরে ঘোড়া চালিয়ে সামনে চলে এল। তারাকে বলল, 'তুই আমার ঘোড়ার লাগাম ধরে নিয়ে চল। বুড়ো ঘোড়াওয়ালাটা পেছনে কোথায় যে রয়ে গেছে, পাত্তা নেই।'

উমেশকে দেখে তারার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে তাড়াতাড়ি ঘোড়ার লাগামটা ধরল। উমেশ ঘোড়া থেকে নেমে তারার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল।

শায়েস্তা মৃদুকণ্ঠে ডাকল, 'কমল।'

কমল শায়েস্তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল 'কী বলছ?'

'তোমার কাজিনের এই পাহাড়ী মেয়েটাকে পছন্দ হয়ে গেছে।'

কমল চুপ করে রইল।

উমেশ তারার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল এরকম মেয়ে শুধু পিকনিকেই নয় —হরিণ শিশুর মতো কমনীয় গমনভঙ্গি, সদ্যবিকশিত কুচযুগলের আন্দোলন, নিঃশঙ্ক নির্ভয় চোখের চাহনি যা এখনও কোন পুরুষের দৃষ্টির সামনে নত হতে শেখেনি, ঠিক এমনিই কুসুমকলি পছন্দ তার।

দলটি এখন কটনঘাটি পার হয়ে ফুলওয়ালীঘাটিতে এসে পৌঁছেছে। কমল একটু ঝুঁকে পড়ে শায়েস্তার ঘোড়াটা থামাল। এখন ওরা দুজন পাশাপাশি ঘোড়ার ওপর চড়ে। সামনে ফুলওয়ালীঘাটি।

ইয়াট ক্লাবের ব্যাণ্ড পার্টিতে নাচের বাজনা শুরু হয়েছে। কয়েকটি যুগল গ্রীক-স্তম্ভের মেঝেটিতে গিয়ে নাচতে শুরু করেছে।

কমল শায়েস্তার চোখে চোখ রেখে বলল, 'আজ তুমি শুধু আমার সঙ্গেই নাচবে।'

শায়েস্তা বলল, 'হ্যাঁ, শুধু তোমার সঙ্গেই নাচব আজ।'

ফুল-পাহাড়…নাচের মধ্যে ক্রমশ নিমজ্জিত দেহ…পুরাতন প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের নীচে, অনেক নীচে পশ্চিম দিকে এক মন্দির…মন্দিরের চূড়ায় কলসের ওপর আন্দোলিত এক ভাগোয়া ঝাণ্ডা…নিম্নে দূর প্রান্তরে একটি স্রোতরেখায় চিকচিক করছে জল…একদিকে পাইনের তরুশ্রেণীর বাইরে ঈষৎ দৃশ্যমান একটি পুরাতন পানচাকি…আর একটি সৌরভ…সৌরভ…

এই নয়নাভিরাম নববসন্তের শোভা যৌবনের মতোই স্বপ্নময়…অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার স্পর্শানুভূতি যা অতীতের গাঢ় চুম্বনে হারিয়ে গেছে, চিত্রাবলীতে প্রিয়তমের মুখ যা ভাবীকালের বাতায়নে উঁকি মারছে, তা এই সৌরভ…সৌরভ… আমাদের পূর্বেও অনেকে এসেছে এখানে, আমাদের পরেও অনেকে আসবে…কিন্তু একটি সৌরভ রয়েছে যা অতীত থেকে বর্তমান এবং বর্তমান থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত এক সুতীব্র মিলনাকাঙ্ক্ষার মতো চলতে থাকে…আর দিগন্ত থেকে দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে—কমল ভাবছিল।

মোটের ওপর পাঁচ-ছয় পালা নাচ সাঙ্গ হয়েছে। এক কোণে বসে প্রাক্তন কমিশনার গিরিধারী প্রসাদ মাথুর অন্য প্রাক্তন কমিশনার খাজা আব্দুস সামাদকে মাথা নেড়ে বলল, 'আমি এসব পছন্দ করিনে।'

খাজা আব্দুস সামাদ দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'আমিও না।'

তারা দুজন বীয়ারের পাত্র পরস্পরের সঙ্গে ছোঁয়াল এবং বড় বড় চুমুকে বীয়ার পান করতে শুরু করল।

পাঁচ-ছয় দফা নাচ হয়ে যাওয়ার পর রাজা হিম্মত রায় প্রস্তাব করল, নীচে মন্দিরে গিয়ে তারা সাধুবাবার কাছে গীতার উপদেশ শুনবে। সাধুবাবা নিজে খুব মডার্ন, পুরাকালের ধর্মাত্মা নন। তাঁর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শুনলে মনে বড় শান্তি পাওয়া যায়। রাজা হিম্মত রায় বিষয়টিকে এমন সচিত্র ও সালঙ্কারে নিবেদন করল যে দুচার জন বাদে পিকনিকের প্রায় সবাই সাধুবাবার উপদেশ শোনার জন্যে আগ্রহী হয়ে উঠল। দূরত্বটাও খুব বেশি না, সাত-আটটি ঢাল পার হয়ে গেলেই সাধুবাবার সেই মন্দির, যার চূড়ায় স্বুবর্ণকলসের ওপর ভাগোয়া ঝাণ্ডা পতপত করে উড়ছে। বলতে কি, ব্যাপারটিকে পিকনিকেরই একটি অঙ্গ হিসেবে ধরে নিল তারা এবং যুগলবন্দী হয়ে ঢালের দিকে হাঁটতে শুরু করল। হাত ধরাধরি করে, কেউবা কারোর কোমর জড়িয়ে ধরে, পরস্পরের স্পর্শ-সুখ অনুভব করতে করতে, 'ইয়া আল্লাহ্', 'হায় রাম' ইত্যাদি মেয়েলী শব্দ ফিসফিস করে উচ্চারণ করতে করতে সুন্দর উপত্যকা অতিক্রম করে চলল তারা।

যারা আগে গিয়ে পৌছল, তারা গিয়ে মন্দিরের বাইরে শান-বাঁধানো পাথরের মেঝেতে বসে পড়ল। যারা পরে এল, তারা বসল পেছনে।

রাজা হিম্মত রায় মন্দিরের ভেতরে গিয়ে সাধুবাবাকে ডেকে আনল। সবার সামনে একটা পাথরের চৌকি, সাধুবাবা বসলেন তার ওপর। তিনি পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে লোকগুলোর দিকে তাকালেন, লোকগুলোও দৃষ্টি নিবদ্ধ করল তাঁর ওপর। সাধুবাবার মহিমান্বিত চেহারা, দেখলে মনে ভয়-ভক্তি জাগে। মুখমণ্ডল থেকে যেন সূর্যকিরণ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। কিন্তু রাজা হিম্মত রায়ের বর্ণনা অনুযায়ী সাধুবাবার বয়স আশি বছর।

টিক্কা জগজিত সিং সাধুবাবাকে দেখেই দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে মৃদুস্বরে মেজর মেহতাকে বলল, 'এ তো দেখছি চমৎকার স্বাস্থ্য। ওঁর বয়স নিয়ে কিন্তু অতিশয়োক্তি করা হয়। সাধুবাবার বয়স কোনমতেই চল্লিশের ওপর হবে না।'

মেজর মেহতা হেসে বলল, 'টিক্কাজী, আপনি তো সেই গল্পটা শুনেছেন নিশ্চয়ই। একবার এক সাধু তার দুই শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণ করতে করতে পথের মধ্যে এক ধর্মশালায় পদধূলি দেন। সেখানে আরো অনেক পথিক আশ্রয় নিয়েছিল। সবাই সাধুর চরণ স্পর্শ করল। তারপর তাদের মধ্যে সাধুর অলৌকিক

ক্ষমতা আর মাহাত্ম্য নিয়ে তর্ক-বিতর্ক শুরু হল। বড় শিষ্য তাদের বলল—আমাদের সাধুবাবার বয়স তিনশো বছর। লোকগুলো সাধুর তারুণ্য আর চমৎকার স্বাস্থ্য দেখে কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। অবশেষে তারা ছোট শিষ্যকে জিজ্ঞেস করল—তোমাদের সাধুবাবার বয়স তিনশো বছর কথাটা কি সত্যি? ছোট শিষ্য মাথা নেড়ে বলল—বলতে পারিনে। আমি তো মাত্র দেড়শো বছর ধরে ওঁর সঙ্গে রয়েছি।'

টিক্কা জগজিত সিং হাসবার জন্যে মুখে রুমাল চাপা দিল। এমন সময় সাধুবাবা আঙুল তুলে ভরাট গলায় শ্লোক-পাঠ শুরু করলেন,

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥

অর্থাৎ, হে অর্জুন, আমি অব্যক্ত স্বরূপে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করে আছি। সমস্ত ভূত আমাতে অবস্থিত, আমি কিন্তু তৎসমুদয়ে অবস্থিত নই। এই সমগ্র জগৎ ঈশ্বরে পরিপূর্ণ। শাস্ত্র এর উদাহরণস্বরূপ বরফ ও জলের কথা উল্লেখ করেছে। বরফ যেমন জল দ্বারাই পরিপূর্ণ, এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডও তেমনি ঈশ্বরে পরিপূর্ণ।'

'দ্বিতীয়ত' সাধুবাবা এবার তাঁর দ্বিতীয় আঙুল তুলে বললেন 'এই-সমস্ত জগৎ ঈশ্বরের মধ্যে আশ্রিত। যেমন সর্বত্র গমনশীল মহান বায়ু আকাশে অবস্থিত, সেই-রূপ সমস্ত ভূত ভগবানে অবস্থিত। কিন্তু ভগবানের স্বরূপ চক্ষুদ্বারা দৃষ্ট নয়, মনশ্চক্ষু দ্বারা তা সম্পূর্ণরূপে পরিলক্ষিত হয়। আরো পরে ভগবান কৃষ্ণ বলছেন—মোহ-গ্রস্ত ব্যক্তি আমাকে দেখতে পায় না,

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞাণা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥

'অর্থাৎ—' সাধুবাবা তাঁর কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তুলে বললেন, 'এই-সকল মোহগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্ত আশা ব্যর্থ, যাবতীয় কর্ম নিষ্ফল, সব জ্ঞান নিরর্থক এবং তাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত। এইরূপ বিবেকহীন ব্যক্তিরা রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতির বশীভূত। এরা পৈশাচিক পথগামী। পৈশাচিক পথই এদের সর্বদা মোহান্ধ করে রাখে, ভোগ-বিলাসে আবদ্ধ করে রাখে এবং ভগবানের দিকে অগ্রসর হতে দেয় না। পক্ষান্তরে,

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম॥

'অর্থাৎ, হে অর্জুন, সাত্ত্বিকীপ্রকৃতিপ্রাপ্ত মহাত্মগণ অনন্যচিত্ত হয়ে আমাকে সর্বভূতের কারণ এবং অব্যয়স্বরূপ জেনে ভজনা করেন। তাঁরা যত্নশীল ও দৃঢ়ব্রত হয়ে ভক্তিপূর্বক সর্বদা আমায় কীর্তন ও বন্দনা করেন এবং নিত্য সমাহিত চিত্তে আমার উপাসনা করেন।'

এই উপদেশ শুনতে শুনতে সুধার চোখে প্রায় ঘুম এসে গেল। প্রথমে তো সে সাধুবাবার বড় বড় উজ্জ্বল চোখে হারিয়ে গেল যেন। তারপর তার চোখ পড়ল সাধু-বাবার শক্ত কাঁধের ওপর, সেখান থেকে তার দৃষ্টি নামতে নামতে আপনা থেকেই

যেন সাধুবাবার বলিষ্ঠ বাহুদুটিতে এসে নিবদ্ধ হল এবং সেই বলিষ্ঠ বাহুদ্বয়ের কাল্প নিক স্পর্শসুখে বিবশ হয়ে সুধার দৃষ্টি আনত হয়ে এল।

সাধুবাবা পঞ্চাশ টাকার নৈবেদ্য গ্রহণ করে ভেতরে চলে গিয়েছিলেন কিন্তু বাইরের চত্বরে তখনো তাঁর সম্বন্ধেই বিতর্ক চলছিল। অধিকাংশ ব্যক্তিই তাতে অংশগ্রহণ করছিল। রাজা হিম্মত রায় বলছিল, 'গীতায় শ্লোক রয়েছে—

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ।।

'অর্থাৎ, হে অর্জুন, তুমি তোমার এই চর্মচক্ষুদ্বারা আমার এই রূপ দর্শনে সমর্থ হবে না। এজন্য তোমাকে দিব্যচক্ষু দিচ্ছি, তার দ্বারা আমার এই ঐশ্বরিক যোগসামর্থ্য দেখ।'

খাজা আব্দুস সামাদ বললেন, হাফিজও এই একই কথা বলেছেন তাঁর কাব্যে—

দীদানে রূয়ে তুরা দীদায়ে জাঁ মী বায়েদ্ ।।

'অর্থাৎ, হে খোদা, তোমার স্বরূপ দর্শনের জন্য মনশ্চক্ষু অর্থাৎ আত্মদৃষ্টি প্রয়োজন। আমার এই চর্মচক্ষুর অতোখানি দৃষ্টিশক্তি কোথায় যে তোমার দিব্যরূপ দর্শনে সমর্থ হব!'

ব্যারিস্টার জয়েদী তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, 'মওলানা রুম-ও এই একই কথা বলেছেন—

চশ্‌মে সর্ রা তাকত্ দীদান্ না বুদ্।
চশ্‌মে দিল্ রা লাইক্ দীদার কুন্ ।।

অর্থাৎ বাইরের জল-ভরা চক্ষু দিয়ে দিব্যরূপ দর্শনের ক্ষমতা নেই, তাই তিনি মনশ্চক্ষুই দর্শনের উপযুক্ত বলে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া একই চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে ডক্টর ইকবালের রচনাতেও—

যাহির কি আঁখ সে না তমাশা করে কোঈ।
হো দেখ্‌না তো দীদায়ে দিল্ ওয়া করে কোঈ ।।'

টিক্কা জগজিত সিং বলল, 'একথা আমাদের পাঞ্জাবের বিখ্যাত কবি বুল্লে শা-ও বলেছেন। আর গুরু নানক তো অনেক আগেই বলে গেছেন—নানক, সে চোখ অন্য জিনিস যা দিয়ে আমি আমার প্রিয়তম প্রভুকে দেখতে পাই।'

কিন্তু রাজা হিম্মত রায় সহজে হারবার পাত্র নয়। সে আর-একটা শ্লোক শোনাল। তর্ক-বিতর্কে আলোচনা উত্তপ্ত হয়ে উঠল। প্রত্যেক ধর্মের ভক্তই রাজা হিম্মত রায়কে পরাজিত করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা শুরু করল। গীতার প্রতিটি শ্লোকের মোকাবিলা করতে নিজের নিজের সম্প্রদায়ের যাকে সামনে পেল তাকেই এনে হাজির করল তারা। ফলে ধর্ম নামক বলটি ফুটবলের মতোই কখনো এর পায়ে কখনো ওর পায়ে ঠোক্কর খেতে খেতে সাম্প্রদায়িকতার সামনে এসে পড়ল। কারণ উদ্দেশ্যটা তাদের ঈশ্বরভক্তিও নয়, ধর্মও নয়, সেটা তখন বিরোধিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা মাত্র।

শায়েস্তা তো বেশ কিছুক্ষণ ধরে এই তর্ক-বিতর্ক মন দিয়ে শুনছিল। তারপর সে একটি দীর্ঘ হাই তুলে কমলকে বলল, 'আমার মনে হয়, ধর্ম মরে গেছে।'

কমল বলল, 'শুধু গোলটাই বাকি আছে। ফুটবল সামনে রেখে দেব কি ?'

শায়েস্তা মৃদু হেসে বলল, 'না। আমার তো এখন দারুণ খিদে পেয়েছে।'

খেতে বসে উমেশ চোখ-ভরে তারাকে দেখছিল। তারার অনাঘ্রাত যৌবনোচ্ছল দেহটা যেন ইতিমধ্যেই তার নাগালের মধ্যে এসে গেছে। তারাও বারবার ওর জন্যে নানাবিধ ব্যঞ্জন নিয়ে আসছে। পরিবেশনের সময় উমেশ ফিসফিস করে কী যেন বলছে, অমনি তারা খিলখিল করে হেসে উঠছে। উমেশ পকেট থেকে দশ টাকা বার করে টিপস দিল ওকে।

এক কোণে খেতে বসেছে কুমার মরাতব আলি আর সুধা। দুজনে গায়ে গা লাগিয়ে যেমন বসেছে, তেমনি দুজনের প্লেটও রয়েছে পাশাপাছি। একজন আরেক জনের প্লেট থেকে খাবার তুলে খাচ্ছে। পরস্পরের প্রতি মুগ্ধ দৃষ্টি ওদের খাদ্যবস্তুকে আরো উগ্রস্বাদবিশিষ্ট করে তুলছে। লবণাক্ত ব্যঞ্জন আরো চোখা হয়ে উঠছে। মিষ্টান্নাদি আরো সুমিষ্ট বোধ হচ্ছে। ভালোবাসার অম্ল-মধুর নির্যাস বড় আশ্চর্য বস্তু। কুমার মরাতব আলি খেতে খেতে সুধার দীর্ঘ আঙুলগুলো বার-বার বন্ধ হতে আর খুলে যেতে দেখছিল। দেখতে দেখতে নিজের বাগানের পুষ্করিণীতে উন্মীলিত আর নিমীলিত শতদলের কথা মনে পড়ছিল তার। সুধার আঙুলগুলো চিরন্তন চিত্রাবলীর নিদর্শন যেন, এরূপ শিল্পসুষমামণ্ডিত আঙুল সে কখনো কোন নারী-চিত্রে দেখেনি।

সুধা বলল, 'তুমি চাও আমি তোমার বাচ্চার ভ্রূণ হত্যা করি ?'

'তার মানে ?' কুমার একেবারে চমকে উঠল। হাতের গ্রাস পড়ে গেল প্লেটের ওপর।

'তার মানে আমার পেটে তোমার বাচ্চা রয়েছে।' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসে উচ্চারণ করল সুধা।

'তো-তো-তো তুমি এখনো আমায় বলনি কেন ?'

'এ-পর্যন্ত আমার নিজেরই সন্দেহ ছিল। যেই নিঃসন্দেহ হয়েছি অমনি জানালাম তোমাকে।'

এক দীর্ঘ স্তব্ধ বিরতি। প্লেটে খাবার নিয়ে খেলতে থাকল দুজনে।

'কী বলছ তুমি ?' সুধার কণ্ঠস্বরে রুক্ষতা।

'আমি তোমায় বিয়ে করতে চাই।' মৃদু কণ্ঠে বলল কুমার।

বেশ কিছুক্ষণ সুধার সারা দেহ কাঁপতে থাকল যেন। অনুভূতির অগাধ জলে সহস্র সহস্র তরঙ্গ আন্দোলিত হয়ে উঠল। সংগীতের সুরধ্বনিতে লক্ষ লক্ষ বুদবুদ ভেসে যেতে লাগল।

হঠাৎ সুধার চোখ আনন্দাশ্রুতে পরিপূর্ণ হয়ে এল।

কুমার জিজ্ঞেস করল, 'চোখে জল কেন ?'

'আমি ভেবেছিলাম তুমি ভ্রূণ হত্যা করতেই বলবে।'

কুমার তার বড় বড় চোখের ওপর চোখ রেখে বলল, 'এর আগে আমি নিজেও জানতাম না তোমায় আমি এত গভীরভাবে চাই।'

গিরিধারী প্রসাদ মাথুর বলল, 'এসব যা চলছে, আমার আদৌ পছন্দ নয়।'

খাজা আব্দুস সামাদ সায় দিল, 'আমারও না।'

'আর একটু জীন নেবে ?'

'না। চল খেয়ে নিই।'

খাওয়া-দাওয়ার পর কিছু লোক তাস খেলতে বসল। কেউ কেউ ঘাস আর ফুলে ঢাকা মাঠে হাত পা ছড়িয়ে ঝিমোতে লাগল। কেউ কেউ পাইনের শীতল ছায়ায় অদৃশ্য হয়ে গেল। শায়েস্তা আর কমল নীচে নালার দিকে হাঁটতে শুরু করল। হাঁটতে হাঁটতে কমল জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কখনো নৈসর্গিক দৃশ্য নিয়েও ছবি এঁকেছো তো ?'

শায়েস্তা বলল, 'তার মানে নৈসর্গিক দৃশ্য যেমন, তেমনি ছবি ?'

'হ্যাঁ।'

'না।'

'না কেন ?'

'আমি দৃশ্যের বহিরাবয়ব দেখিনে, তার ভিতরকার সত্যের অনুসন্ধান করি।' শায়েস্তা কমলের হাতে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলল।

কমল টিপ্পনী কাটল, 'তার মানে নারীর মধ্যে তার দেহের শিরা উপশিরা, ফুলের মধ্যে মাকড়শার জাল, আর মাকড়শার জালের মধ্যে রোদ্দুরে গেঁজিয়ে-ওঠা ডিম ?'

শায়েস্তা খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল, 'তোমার চোখ একজন প্লাস্টিক-সার্জেনের চোখ, আমার চোখ একজন শিল্পীর চোখ।'

কমল দুষ্টুমি-ভরা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তোমার শিল্পীর চোখ আমার মধ্যে কী দেখতে পায় ?'

শায়েস্তা বিদ্রূপ করে বলল, 'কখনো ভেবে দেখিনি।'

'এখন ভালো করে ভেবে নিয়ে বল না !'

'তোমার নিজের সম্বন্ধে এতো কৌতূহল ?'

'তা নয়। বরং আমার কৌতূহল হচ্ছে আমার সম্বন্ধে তোমার আগ্রহ কতখানি ?'

'সেটা আজ পর্যন্ত বুঝতে পারোনি তুমি ? সত্যি, পুরুষ মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভূতি কত না অস্বচ্ছ ! মনে হয়, প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ানুভূতিতেই যেন ছানি পড়েছে।'

'কথা এড়িয়ে গেলে চলবে না। আজ কিন্তু প্রশ্নটা করতেই থাকব।'

শায়েস্তা গম্ভীর হয়ে বলল, 'আর আমি সেই ফাঁদে পা দেব, যাতে মনের কথা জিভের ডগায় এলে আসল সত্যটাই হারিয়ে যায়!'

'তাহলে প্রকৃতি কি শুধু মিথ্যে কথা বলার জন্যেই জিভ দিয়েছে?'

'একে অপরকে বুঝবার জন্যেই দিয়েছিল কিন্তু এখন প্রায়ই একজনের অন্যজনকে ধোঁকা দেওয়ার কাজেই সেটার ব্যবহার হয়।'

কমল বেশ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'আমি তোমায় ধোঁকা দিচ্ছি?'

শায়েস্তা তার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বলল, 'তুমিও না, আমিও না। আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাইছি যে, মনের অনুভূতিকে যখন শব্দের শবাচ্ছাদন পরাতে যাওয়া হয়, তখন ভেতর থেকে শুধু মৃতদেহই বেরিয়ে আসে।'

'সেটা কিভাবে?'

'ধরো না, এই তুমিই যেমন আমায় বলতে চাইছ, আমি তোমায় ভালোবাসি! কিরকম ঘষামাজা চিন্তা-ভাবনা—লক্ষ লক্ষ বছরের পুরনো।'

'লক্ষ লক্ষ বছর ধরেই তো ফুল বিকশিত হয়, বাতাসে সৌরভ ভেসে বেড়ায়, শিল্পীরা শিল্পের বিষয়বস্তুও লাভ করে। তাই থেকে প্রত্যেকটি পুরনো চিন্তা-ভাবনাই নতুন উপলব্ধির ওষ্ঠপ্রান্তে এসে সজীব সতেজ হয়ে ওঠে।'

শায়েস্তা মৃদু হেসে বলল, 'এস কমল, আমরা ওই পানচাকি পর্যন্ত হেঁটে যাই।'

এই পানচাকিটায় এখন আর কেউ থাকে না। নালাটি তার গতিপথ পরিবর্তন করেছে, পানচাকিটা থেকে গেছে ওপরে। সেজন্যেই এখন সেটা অকেজো—এখন আর তাতে গম পেষাই করা যায় না। ভেতরটা ভ্যাপসা অন্ধকার। মাকড়শার জালে ভর্তি। চাকিটার দুটো পাটই এখন চুপচাপ পড়ে রয়েছে।

শায়েস্তা কমলের হাত ধরে তাকে নীচের দিকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল, 'তুমি যা জানতে চাইছ, তার উত্তর হয়তো পাওয়া যাবে ওখানে।'

'তাহলে বরং না হেঁটে ছুটতে ছুটতে যাব।'

দুজনে ওরা লাফাতে লাফাতে, হাসতে হাসতে, গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে তৎক্ষণাৎ পানচাকির কাছে এসে পৌঁছল।

পানচাকি নীরব অন্ধকার। উন্মুক্ত ভাঙা দরজা। জলের নালায় জল নেই। আর চাকি ঘোরানোর কাঠের চাকা নিশ্চল, হতাশ, যেন কার প্রতীক্ষা করছে।

শায়েস্তা আস্তে ফিসফিস করে বলল, 'পানচাকিটা ভারি রহস্যময় মনে হচ্ছে। চল ভেতরে গিয়ে দেখি।'

সে কমলের হাত ধরে তাকে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে গেল।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তারা চীৎকার করে দৌড়তে দৌড়তে বেরিয়ে এল। পানচাকির এক অন্ধকার কোণে সাধুবাবা একটি পাহাড়ী ছেলেকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গনরত অবস্থায় পড়ে আছেন।

শায়েস্তা অনেকক্ষণ মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসতে থাকল। পানচাকির মোড় পেরিয়ে এসে ওরা এখন পুরনো প্রাসাদের দিকে চড়াই ভেঙে উঠছে। এমন সময় সামনে গঙ্গারামকে দুটি ঘোড়ার লাগাম ধরে আসতে দেখা গেল। ওদের দুজনকে দেখেই সে থমকে দাঁড়াল। কমল জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

গঙ্গারাম নীচে নালার দিকে ইশারা করে বলল, 'নীচে যাচ্ছিলাম। ঘোড়া দুটোকে জল খাওয়ানোও হবে আর আপনারাও ঘোড়ায় চড়ে ফিরতে পারবেন।'

'তাহলে শীগগীর ঘোড়া দুটোকে জল খাইয়ে নিয়ে আয়। আমরা এখানেই বসছি।'

গঙ্গারাম মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলে কমল আর শায়েস্তা ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল। তাদের মাথার ওপর ফুলে ফুলে আচ্ছাদিত চামেলীর ঝোপ। আর তাদের চতুর্দিকে অজস্র বুনো ফুল আর ফুল।

শায়েস্তা হঠাৎ গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'এরকম কেন হয়?'

কমল জিজ্ঞেস করল, 'প্রণয়?'

'না ওই পানচাকির ব্যাপারটা।'

'কারণ সাধুবাবা তার সমস্ত বৈরাগ্য সত্ত্বেও একজন পুরুষ। রোমান ক্যাথলিক চার্চের মতো আমাদের হিন্দুসমাজেও একটি বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে যে সন্ন্যাসীদের চিরকুমার থাকা ভালো। জানিনে কেন এইরকম একটি কল্পনা মানুষ তৈরি করে নিয়েছে যে, কৌমার্য এক শ্রেষ্ঠ আচার। যদিও জোর করে আরোপিত কৌমার্যের মূঢ়তায় বহু জঘন্য মনোবিকৃতির অন্ধকার জমাট বাঁধে। এইসব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যেই প্রায় সমস্ত পয়গম্বরই বিয়ে করতেন। কারণ তাঁরা মানুষকে পবিত্র জীবনযাপনের শিক্ষা দিতে চাইতেন।

কমল পাশ ফিরে শায়েস্তার কাছে চলে গেল। কিন্তু শায়েস্তা তেমনিই সোজা হয়ে শুয়ে রইল। যেখানে ওরা শুয়েছিল, ওপর থেকে সে জায়গাটা চোখে পড়ে না! আর নীচে থেকেও যতক্ষণ না কেউ পানচাকির মোড় ছাড়িয়ে উঠে আসছে, ততক্ষণ ওদের দেখতে পাবে না।

কমল শায়েস্তার মুখের ওপর আনত হল। কিন্তু শায়েস্তা একটুও নড়ল না। তার চোখে এক রহস্যময় উজ্জ্বলতা।

শায়েস্তা একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, 'তোমার কাছ থেকে কিরকম একটা সুগন্ধ আসছে যেন?'

কমল বলল, 'ফুলের গন্ধ হতে পারে।'

'তা তো রয়েছেই। চামেলী, গোলাপ আর মৌরীফুলের গন্ধ আছে। কিন্তু এ-সবের সঙ্গে মিশে আছে তোমার গন্ধটাও। সব গন্ধ থেকে আলাদা।'

'আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে এটা হচ্ছে হরমোন-এর গন্ধ।'

'শুনেছি প্রত্যেক পুরুষের দেহেই হরমোন থাকে। তাহলে সব পুরুষের কাছ

থেকে এই গন্ধ পাওয়া যায় না কেন?'

'সম্ভবত এটা ভালোবাসার সৌরভ।' কথাটা বলেই কমল শায়েস্তার চোখের আরো কাছে মুখ নামাল।

শায়েস্তা কিছু বলল না। তার চোখের দীর্ঘ পলকগুলি কমলের ঠোঁটে কাঁপছিল। কমলের তপ্ত ওষ্ঠাধর থেকে যেন বাষ্প নির্গত হচ্ছিল।

কমল তার ঠোঁটের ওপর মুখ নামাল এবার।

ঠিক সেই সময় পানচাকির মোড় থেকে ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি শোনা গেল। কমল দ্রুত সরে গেল শায়েস্তার কাছ থেকে।

গঙ্গারাম ঘোড়াকে জল খাইয়ে নিয়ে ফিরল। তার চোখ ভেজা-ভেজা।

কমল জিজ্ঞেস করল, 'কী রে, তুই কাঁদছিস?'

গঙ্গারাম বলল, 'না বাবু। পায়ে একটা কাঁটা বিঁধেছে। বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে।'

শায়েস্তা উঠে বসে বলল, 'এই ছেলেটা, এদিকে আয়। আমি কাঁটা বার করে দিচ্ছি।'

গঙ্গারাম মাথা নেড়ে বলল, 'না দিদিমণি, কাঁটাটা অনেকখানি ভেতরে গিয়ে ভেঙে গেছে। বাড়ি গিয়ে ছুঁচ দিয়ে বার করব। আপনারা ঘোড়ায় চড়ে বসুন।'

কমল আর শায়েস্তা নিজের ঘোড়ায় চড়ে বসল। গঙ্গারাম একটা সরু ছড়ি হাতে নিয়ে পেছনে পেছনে আসতে লাগল।

প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ক্রমশ কাছে চলে আসছে। পুরনো গ্রীক-স্তম্ভগুলি ক্রমশ উঁচু হচ্ছে। বাবুইপাখিরা বাতাসে উড়ছে। সাদা হাঁসের মতো মেঘগুলি নীল আকাশের বুকে ভেসে চলেছে। শায়েস্তা বেশ কিছুক্ষণ ধরে গুনগুন করছিল। তারপর সে ধীরে ধীরে উচ্চকণ্ঠে গাইতে শুরু করল—

তোমার সঙ্গে খেলেছে বলে, হে প্রাণ সখা,
বাতাস হয়েছে মন্দ-মধুর স্নিগ্ধ-শীতল।
বাতায়নপথে তোমার অঙ্গে ঝরেছে বলে চন্দ্রকিরণ
রাতের ব্যথায় হয়েছে এমন প্রাণ-বিহ্বল॥

বন্ধু, তুমি জীবনের মধু-মুখচ্ছবি দেখেছ বলে
সেই জীবনের স্বপ্নে আমার প্রাণ সঁপেছি।
তোমার রূপে অকম্পিত যাদুকরী এই মগ্ন আঁখি—
জান জান তুমি, হে প্রিয়তম,
কেন এ-জীবন পণ ধরেছি॥

প্রেমের ব্যথা পরম দয়া—বলেছ আমায়, হে দয়াময়,
এতই দয়া—সে-জলধির কূল-কিনারা কোথায় পাব!
এ-ভালোবাসায় আমরা দুজন কী হারালাম কী যে পেলাম—
তোমায় ছাড়া অন্য কারে কী বোঝাব!!

শায়েস্তা কমলের দিকে চেয়ে অর্থপূর্ণ কণ্ঠে শেষ পঙক্তিদুটি বারবার পুনরাবৃত্তি করল। কমল তার স্বপ্নঘন চোখে, তার ঈষৎ আন্দোলিত গোলাপী ওষ্ঠাধরে হারিয়ে গেল যেন।

দশ

গঙ্গারাম কমলের ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিল। ওদের সঙ্গে সঙ্গে আসছিল তারা। তার হাতে একটা থলে। উমেশ তাতে মিষ্টি, ফল ইত্যাদি নানারকম খাবারের জিনিস ভরে দিয়েছে। গঙ্গারাম ক্রুদ্ধ চোখে মাঝে মাঝে ছোট বোনটার দিকে তাকাচ্ছিল। কিন্তু তারা তার চোখরাঙানিকে অগ্রাহ্য করে দিব্যি থলে দোলাতে দোলাতে কমনীয় ভঙ্গিতে হাঁটছিল। তার ঠোঁটে দুষ্টু হাসি।

কটনঘাটিতে পৌঁছে তারা তাদের কুঁড়েঘরের মধ্যে চলে গেল।

গঙ্গারাম তার ঘোড়ার মুখ ডিভাইন ক্যাসল-এর দিকে ঘুরিয়ে নিল। জোরে জোরে পা ফেলে হাঁটছিল সে।

কমল জিজ্ঞেস করল, 'তোর পায়ের ব্যথাটার কী হল ?'

গঙ্গারাম বলল, 'মনে হচ্ছে কাঁটাটা বেরিয়ে গেছে ?'

'আপনা থেকেই ?'

'হ্যাঁ বাবু, এই দুনিয়াতে অনেক জিনিসই আপনা-আপনি ঘটে যায়। কারোর ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে না।'

'এত অল্প বয়েসে এমন পাকা পাকা কথা কোথায় শিখলি ?'

'এই অল্প বয়েসেই বাপ মরেছে বাবু। কাকা মরেছে। দাদা মরেছে। যেটুকু জমি-জায়গা ছিল, ছোটকাকা হাতিয়ে নিয়েছে। আমি আমার অন্ধ মা আর ছোট বোনটাকে নিয়ে নৈনিতাল চলে এসেছি।' গঙ্গারাম বলে যাচ্ছিল, 'ছোট-কাকা ভয় পেয়ে মাঝে মাঝে এটা-ওটা ফসল-কুটো পাঠিয়ে দেয়। সব সময় পাঠায় না। হ্যাঁ বাবু, জীবনে বড় জ্বালা-যন্ত্রণা। পরপর কয়েকদিন যখন উপোসে কাটাতে হয় তখন এইসব কথাই ভাবি। নইলে গরিবি হাল বরদাস্ত হত কী করে! কিন্তু আমি শুধু গরিবি কথাই বলছিনে। বাবুর দয়ার কথাটাই বলছি। এই ঘোড়া কিনে দিয়ে আপনি আমায় নতুন জীবন দান করেছেন। ইচ্ছে করে আপনার পায়ে প্রাণ সঁপে দিই।'

গঙ্গারামের কথাগুলোতে প্রচণ্ড আবেগ ছিল। কমল বিচলিত না হয়ে পারল না। কিছুক্ষণ সে চুপচাপ বসে রইল ঘোড়ার পিঠে। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তোদের গাঁয়ের নাম কী ?'

গঙ্গারাম বলল, 'রামঘর।'

'গাঁ-টা কোন দিকে ?'

'আপনি তো সেদিন চীনাঘাটি গিয়েছিলেন বাবু। রাস্তার বাঁদিকে জঙ্গলের

মধ্যে একটা রাস্তা ঘুরে গেছে। ওটাই আমাদের গাঁয়ে যাওয়ার রাস্তা। আজ সকালে যদি হাঁটতে শুরু করেন, রাতের বেলা পৌঁছে যাবেন সেখানে।'

'তোদের কতখানি জমি ছিল ?'

'দুটো ক্ষেত ছিল ধানের। তিনটে ক্ষেত ছিল মকাইয়ের। বাড়ির কাছে ছোট্ট একটা বাগান ছিল। আড়ু আর খুবানির দশটি গাছ ছিল সেখানে। খুব মিষ্টি খুবানি হত বাবু।'

'বাড়িটা চিনতে পারবি এখন ?'

'খুব পারব। যদি ওদিকে কখনো যান, তাহলে আপনাকে সেখানে নিয়ে যাব।'

'যাব একদিন গঙ্গারাম। ও-অঞ্চলে একটা হাসপাতাল খোলার ইচ্ছে আছে আমার।'

'আমাদের গাঁয়ে খুলুন বাবু। ওদিকে কুড়ি পঁচিশটি গাঁয়ের মধ্যে একটিও হাসপাতাল নেই। আপনি আমার সব জমি নিয়ে নিন।'

'তোর কাকার সঙ্গে মারামারি করতে হবে তো ?'

'সে-তো করতেই হবে। কিন্তু জায়গাটা ভারি সুন্দর বাবু। দেখলেই প্রাণ জুড়িয়ে যাবে আপনার।'

'আর বড় গাঁয়ের মেয়েরা ? দেখতে খুব সুন্দর তো ?' কমলের গলায় দুষ্টুমি।

গঙ্গারাম লজ্জিত হল একটু। গাল দুটো আরক্ত হয়ে উঠল তার। বলল, 'বাবু, মেয়েরা সুন্দর কি-না, সেকথা আমি বলতে পারব না। তবে হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে যদি কোন পাহাড়ী মেয়ের ভাব হয়ে যায়, তবে তা এমন হবে, সারা জীবন আপনার পায়ের তলায় চোখ পেতে দেবে। কখনো সরে যাবে না সে।'

কমল জিজ্ঞেস করল, 'আর শহরের মেয়েরা ?'

'থুঃ !' ঘেন্নায় থুতু ফেলল সে।

কমল হাসতে লাগল। বলল, 'তুই বড় হবি যখন, তোর বিয়ে দেব একটা শহরের মেয়ের সঙ্গে !'

এগারো

রয়েল ওক লজের পাথর বিছানো রাস্তায় ব্যারিস্টার জয়েদীর ঘোড়া দুলকি চালে চলতে চলতে বারান্দার সামনে এসে দাঁড়াল। ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল ব্যারিস্টার জয়েদী। সহিসের হাতে লাগাম ধরিয়ে দিয়ে সে ভেতরে চলে গেল। দরজার কাছে একজন ভৃত্য আগে থেকেই প্রতীক্ষা করছিল। ব্যারিস্টার জয়েদীকে দেখে নত হয়ে আদাব জানাল সে। তারপর বলল, 'বেগম সাহেব আপনাকে ভেতরে আসতে বলেছেন।'

ভৃত্যটি তাকে বেগম জাবেদের ঘরে নিয়ে গেল।

হলদে সাটিনের পুরু পর্দার ওপর গোলাপী রঙের লতাপাতার কারুকার্য। বেগম জাবেদ বালিশে ঠেস দিয়ে বিছানায় হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। পরনে সাদা লেসের পাতলা শাড়ি। অসি-কোষ সদৃশ চোখ দুটিতে এক আশ্চর্য রহস্য-ময়তা। সাদা লেসের ফাঁক দিয়ে তার ফরসা দেহের উজ্জ্বলতা ঠিকরে বেরুচ্ছে।

ব্যারিস্টার জয়েদীকে ভেতরে আসতে দেখেই বেগম জাবেদ ড্রেসিং টেবিলের টুল টেনে নিয়ে তার বিছানার কাছে বসতে বলল।

ব্যারিস্টার জয়েদীর হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হল। বেগম জাবেদের শরীর থেকে সুগন্ধ ভেসে আসছিল। তার সুডৌল কবজিতে ভাঁজ। নাকে হীরের নাকছাবি। আঙুলের ডগা থেকে কাঁধ পর্যন্ত নগ্ন বাহুতে গোলাপের সুষমা। চুলের বেণী দুটো আলগা হয়ে কাঁধের ওপর এসে পড়েছে। একটা তো কাঁধ থেকে নেমে গেছে একেবারে কোমরের নীচে পর্যন্ত। বেণী দুটো নিয়ে খেলা করতে বড় ইচ্ছে করছিল ব্যারিস্টার জয়েদীর।

জয়েদীর বয়স বড় জোর বছর তিরিশ। লক্ষ্ণৌয়ের কোন এক অভিজাত পরিবারের গৌরব সে। পিতামাতার একমাত্র সন্তান। শৈশব থেকেই ভীষণ রক্ষণ-শীলতার মধ্যে লালিত-পালিত। লণ্ডনে থাকার সময় তার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু শৈশবে যে রীতিনীতি শিক্ষা করেছে, মনের দিক দিয়ে সেইরকমই থেকে গেছে এখনও। শরীর-স্বাস্থ্য ভালো। স্থূল নয়, বরং ছিপছিপে বলা যেতে পারে। সূক্ষ্ম পাতলা গোঁফ। বুদ্ধিদীপ্ত দীঘল চেহারা। পেছনদিকে আঁচড়ানো চুল। নিজের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে তার আঙুলগুলো অস্থির হয়ে উঠছিল। কিন্তু কেন?

বেগম জাবেদ তাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল। ক্রীম রঙের আঁটসাট জামা আর চোস্ত পাতলুনের মধ্যে তার শরীর হালকা দেখালেও তাতে যথেষ্ট পৌরুষ আর ক্ষমতার আভাস রয়েছে। বেগম জাবেদের বুক ঢিপঢিপ করে উঠল। ক্লাবে সে ব্যারিস্টার জয়েদীকে কয়েকবার তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে দেখেছে। তার দৃষ্টি বেগম জাবেদের দেহটাকে শুধু ছুঁয়ে যায়নি, বরং দৃষ্টি দিয়ে সে তার সর্বাঙ্গকে আদর করেছে যেন।

ব্যারিস্টার জয়েদী গদগদ কণ্ঠে বলল, 'বলুন, কী হুকুম?'

বেগম জাবেদ আর-একবার জয়েদীকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল। স্থির চোখে তাকাল তার মুখের দিকে। যখন সে সুনিশ্চিত হল যে পাখি খাঁচায় আটকা পড়েছে, তখন সে আঁচল নিয়ে খেলা করতে করতে বলল, 'আমি রয়েল ওক বিক্রি করতে চাই।'

ব্যারিস্টার জয়েদী চমকে উঠল। যদিও সে জানত, বেগম জাবেদ ধীরে ধীরে তার সম্পত্তি বিক্রি করে ফেলছে, লক্ষ্ণৌয়ের বাড়ি ইতিমধ্যেই হস্তান্তরিত হয়েছে, তরাইয়ের ধোরিয়া গ্রামের কাছে জাবেদ ফার্মের দরদাম পাকা হয়ে গেছে, তবু 'রয়েল ওক লজ' বিক্রি করার কথা ভাবতে পারেনি সে। রয়েল ওক লজ···

এলাম। ঠাকুর্দার লাশ টপকে আস্তে আস্তে খেতের ধারে ধারে হাঁটতে লাগলাম। হঠাৎ যেন কার পায়ের শব্দ কানে এলো। ভয় পেয়ে পেছন ফিরে দেখলাম, রুমীও আমার পেছনে পেছনে আসছে।

তুই কোথায় যাবি রুমী? তোর পেটে তো বাচ্ছা রয়েছে। কুকুর তুই। তোর তো কোনো ভয় নেই। তুই কি আর মানুষ যে তোর প্রাণের ভয় থাকবে! এসব তো সভ্যতার ব্যাপার-স্যাপার। উন্নত সভ্যতা ও রীতিনীতির ঝগড়া। প্রচণ্ড রক্ষণশীলতা থেকে এই তরবারি নিষ্কাসিত হয়েছে। এই তরবারি দিয়ে তোর গলা কাটা যাবে না, সেজন্যে তুই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যে তুই অসভ্য, অভদ্র, মূর্খ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যে তুই জানিসনে ধর্ম কি, কখনো পূজো-পার্বণ করিসনি, কখনো পাঁচ অক্ত নামাজ পড়িসনি। কখনো তুই গীর্জা, মন্দির, মসজিদেও যাসনি। তুই কখনো স্বাধীনতার মূল্য বুঝিসনি, কখনো রাজনৈতিক নেতার বক্তৃতা শুনিসনি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যে তুই একটা কুকুর, মানুষ নোস্।

পালিয়ে যা। আমার পেছনে পেছনে আসিস নে। কারণ আমি একজন মানুষ, নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে অন্য মানুষের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। যা, চলে যা। নিজের গ্রামে ফিরে যা, যেখানে আমি থাকতাম, তুই থাকতিস, যেখানে আমার জন্ম হয়েছিল, তোরও জন্ম হয়েছিল। সেখান থেকে আমাকে বার করে দিয়েছে, কিন্তু তোর গায়ে কেউ হাত দেবে না। কারণ তুই একটা কুকুর, মানুষ নোস।

সেই বাড়িতেই ফিরে যা। ও বাড়ি কি চিরদিন ওইরকমই জনপ্রাণীহীন ও ধ্বংসস্তূপ হয়ে থাকবে? কেউ না কেউ আবার সেই আলবোলার সটকা তুলে নেবে, জামার ঝুলে ঝেড়ে-মুছে নিয়ে মুখে লাগাবে। আলবোলায় টাটকা জল ভরবে, ছিলিমে নতুন তামাক পুরে তার ওপর আঙার চাপাবে। তারপর চৌকিতে বসে বসে ধূমপান করবে কেউ। সেই রেশমী ডোরগুলোতে আবার কোনো লাজুক সরল বউয়ের মেহেদি-রাঙা আঙুলগুলো খেলা করবে। এটাও আশা করা যায়। বাড়িটা আবার গমগম করে উঠবে। উনুনে আগুন গনগন করবে, চাঙারি-ভর্তি গরম রুটির মিঠে মিঠে গন্ধ ছড়াবে, লাউগাছের সবুজ লতায় ঢাকা উঠোন কুমারী মেয়েদের গানে মুখর হবে। আর কোনো রূপবতী পুণ্যবতী কলকল করে গাইতে গাইতে খিলখিল হাসিতে ভেঙে পড়বে—

কেক্ এক্ লীরদি
পেগ্ মেরে বীরদি
দোপাট্টা মেরে ভাঈদা
কাটে মুঁহ্ জো আঈদা॥'

হ্যাঁ, আবার নতুন জীবনের স্রোত বইবে, সমস্ত অত্যাচার-নিপীড়ন ধুয়ে-মুছে দেবে। সেজন্যে তুই ফিরে যা রুমী।

কিন্তু ক্ষমী ফিরে গেলো না। ও আমার পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগল। নীচু করে, কান লটকে। নির্বোধ আহাম্মুক কোথাকার!

চার

এখানে আমার বিপদের কথাটা আপনাদের বুঝিয়ে বলা দরকার। আমাদের গ্রাম কোটলি সওদকা রেলওয়ে স্টেশন দরবার সাহেব কর্তারপুরের দেড় মাইল এদিকে। ওদিকের বসতি কঞ্জ্‌রোডের দূরত্ব আড়াই মাইল। মাঝখানে রেল-লাইন। সেটা নারোয়ালের দিকে চলে গেছে। আমি তো নারোয়াল হয়ে এসেছি। সেদিকে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই আর। বাঁচার পথ একটাই, কোনোরকমে যদি গুরুদ্বার কর্তার সাহেব পৌছে যেতে পারি, সেখান থেকে বরেত। বরেত হয়ে রাবী নদীর তীরে পৌছে যাব। ওপারে ডেরা বাবা নানক গ্রাম। মাঝখানে সাঁকো। সাঁকোটা পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের সীমান্তকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

আমি যে-কথা ভাবছিলাম, ঠিক সে সময় কঞ্জ্‌রোড ও কঞ্জ্‌রোডের গ্রামাঞ্চল থেকে আগত হিন্দু যাত্রী-দলও সেকথাই ভাবছিল। ওরাও দরবার সাহেব কর্তারপুর স্টেশন অতিক্রম করে সড়ক ধরে আসছিল। ডেরা বাবা নানকের সাঁকোর দিকে।

দলটিতে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ হাজার লোক রয়েছে।

আমি একা। তাতে আবার আমি একটা ভীতু হাবাগোবা লোক। জীবনে কখনো মারপিট করিনি, কারোর সঙ্গে সেরকম কোনো ঝগড়া-বিবাদ করিনি। দুঃখকষ্টও পোয়াতে হয়নি সেরকম। বেশ আরাম-আয়েশেই জীবনটা কেটে যাচ্ছিল। তাই কারোর প্রতি খুব ঘেন্না-পিত্তি করার সুযোগ হয়নি। আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা আমার মন থেকে উচ্চ-নীচ, জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের পার্থক্য সব একাকার করে দিয়েছে। ওসব ব্যাপার আমার একটুও ভালো লাগে না। ওসব থেকে যেন বাসি দইয়ের একটা টক গন্ধ নাকে আসে। ইচ্ছে করে, যেখান থেকেই হোক, ওসব বস্তু পাওয়া গেলেই সঙ্গে সঙ্গে তুলে পূতিগন্ধময় নর্দমায় ভাসিয়ে দিই। আমার বন্ধুদের মধ্যে হিন্দু, শিখ, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদী, ইংরেজ—সব ধরনেরই লোক ছিল। একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া হতো। বিজনেস্‌-ম্যানদের সাধারণত যা হয়ে থাকে। আমি তাদের সঙ্গে যেমন ভালো ব্যবহার করতাম, তারাও আমার সঙ্গে কখনো খারাপ ব্যবহার করেনি। আমার জন্যে তাদের কখনো দুঃখ পোয়াতে হয়নি, আমার মনেও কখনো আঘাত দেয়নি তারা। নিশ্চিন্ত নির্ভাবনা খোলামেলা মেজাজ আমার, মোটামুটি সচ্ছল অবস্থা, ওসব জাতপাতের কথা আমার ভাববার ফুরসত কোথায়! আর এখন তো ওসব কথা ভাববার প্রশ্নই ওঠে না। কেননা, এখন আমি একা, জঙ্গলের এক

নখদন্তহীন জন্তুর মতো নিজের প্রাণটুকু বাঁচাবার কথাই ভাবছি শুধু। নিজেকে নিজেরই বেজায় অপটু মনে হচ্ছে। আরণ্যক জীবনযাপনের অভ্যাস তো কয়েক হাজার বছর আগেই কেটে গেছে। নিজেদের সভ্যতার পেতল-গিল্টি কখনো যাচাই করিনি। আজ ঘটনাচক্রে দুর্বিপাকে, ইতিহাসের নির্মম রথচক্রে সেটা বেরিয়ে পড়েছে। ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে অরণ্য। তাই দেখে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি আমি। লোকালয়ে মানুষ হয়েছি, মানবসভ্যতাকে অনড় অবিনশ্বর বলে ভেবে এসেছি। মানবসভ্যতার বড়াই করা মানুষ আমি, আজ ভাবছি, এই জঙ্গলে কি করে থাকব! কে জানে কতোদিন কতো মাস কাটাতে হবে এখানে। আখের খেতকে শত্রুর ঘাঁটি বলে মনে হচ্ছে। প্রত্যেকটি ঢিবির আড়ালে, প্রত্যেকটি খানাখন্দে মৃত্যু যেন ওত পেতে আছে। রেলস্টেশনটাও যেন এক নেকড়ের মতো অপেক্ষা করছে। এই রেললাইনকে আমার সর্বদা বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা ও নিরাপত্তার নিদর্শন বলে মনে হতো। হাঁটতে হাঁটতে পথ হারিয়ে ফেললাম আমি। আখ-খেতের ভেতরে ভেতরে গুরুদ্বার কর্তার সাহেবের দিকে না গিয়ে দরবার সাহেব কর্তারপুর স্টেশনের দিকে এসে পৌছলাম। আখের ঝোপের আড়াল থেকে দেখলাম, ঢিবিটার পেছনে কুলের ঝোপঝাড়ে আর আখের খেতে, ঠিক আমার সামনে অনেক মুসলমান দাঁড়িয়ে আছে। থমথমে মুখ। ঢাটা-বাঁধা দাড়ি। হাতে বল্লম, ছুরি, কুড়ুল আর বন্দুক। আখের খেতের ওপারে রেললাইনের অন্যপাশে কঞ্জ্ রোডের দিক থেকে সড়ক ধরে আসছে হিন্দুদের একটা দল, সেদিকে চেয়ে আছে ওরা। আমাকে দেখতে পাচ্ছে না। কারণ ওরা আমার দিকে পেছন ফিরে। ওদের পেছনে আমি আখের খেতের আড়ালে। কিন্তু আমি ওদের পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। ওরা বল্লম বাগিয়ে শিকারীদের মতো দক্ষতা ও সতর্কতার সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে, ওদের দেখে হঠাৎ আমার মনে হলো, আমি মানুষ নই, যেন একটা খরগোশ, একটা শেয়াল অথবা খেঁকশেয়াল। চারদিকে এক অন্ধকার ঘন জঙ্গল, সবুজ সবুজ পাতার আড়ালে নিষ্করুণ রক্তচক্ষু, লম্বা লম্বা ছুরির মতো ধারালো নখ যেন আমার গায়ের মাংসে বসে যাওয়ার জন্যে নিশপিশ করছে।

জীবনে এই প্রথম আমার এক আশ্চর্য অনুভূতি হলো। আমি ভাবতে লাগলাম। যদিও মৃত্যু সামনে অপেক্ষা করছে, তবু ভাবতে লাগলাম। কখনো কখনো মন দুই দুই তিন তিন প্রভৃতি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ কাজ করতে থাকে। আমি খেতের মধ্যে আত্মগোপন করে রয়েছি। আমার সামনে আখের খেতে, কুল গাছের আড়ালে, লাইনের ওপারে ঝোপঝাড়ে হামলাকারীরা তৈরি হয়ে ওত পেতে দাঁড়িয়ে আছে। দূরে সড়ক দিয়ে দলটা চলে আসছে। আবালবৃদ্ধবনিতা, হিন্দু, শিখ, খত্‌রী, ব্রাহ্মণ, চামার, মেথর, রাজপুত, তেলী, জমিদার, মহাজন, সবাই আসছে। অন্য সময় এরা নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া-ঝাঁটি করে, একজন অন্যজনের সঙ্গে বেইমানি করে, একজন অন্যজনের সর্বনাশ করে, একজন

অন্যজনের গলা কাটে। কিন্তু আজ সবাই একসঙ্গে মাথা হেঁট করে পালাচ্ছে। আমার মনে পড়ল, জঙ্গলে যখন দারুণ কোনো বিপদ আসে, বন্যা, ঝড়বৃষ্টি কিংবা আগুন, তখন জঙ্গলের সমস্ত জন্তু-জানোয়ার—হরিণ, সিংহ, ভালুক, হাতি চিতাবাঘ, নীলগাই, সাপ, শেয়াল—সব একসঙ্গে পালাতে থাকে। জঙ্গলের সেই জন্তু-জানোয়ারের মতোই······সড়কটাকেও এখন আমার জঙ্গলের একটা রাস্তা বলে মনে হচ্ছে। সেই রাস্তায় হাজার হাজার জন্তু-জানোয়ারের পাল ভীত-বিহ্বল হয়ে দ্রুতবেগে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে দৌড়চ্ছে।

যখন আর মাত্র তিন-চতুর্থাংশ রাস্তা বাকী, তখন মুসলমান হামলাকারীদের দলপতি একটা সংকেত করল। সংকেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা উচ্চস্বরে 'আল্লা হো আকবর' বলে চীৎকার করতে করতে ছুরি বল্লম কুড়ুল তরোয়াল লাঠি নিয়ে দলটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দলের মধ্যে একটা হুটোপাটি শুরু হলো। যে যেদিকে পারল, প্রাণ নিয়ে দৌড়ল। বাধা-বিপত্তির মুখে কারই বা হুঁশ থাকে! এরকম সম্ভাবনা তাদের মন থেকে ঘুচেই গিয়েছিল। জোট বেঁধে একটাই আশা নিয়ে তারা হাঁটছিল, কোনোরকমে যদি রাবী নদীর সাঁকো পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে! নইলে এমনিতে দেখতে গেলে অনেক আগেই মরে গিয়েছিল সবাই। সেজন্যে হাজার হাজার লোক আধ ঘণ্টার মধ্যেই মুলো-গাজরের মতো কেটে টুকরো টুকরো হলো। আর নিজেদের কাজ সেরে হামলাকারীরা অন্যদিকে যাত্রা করল।

ভাবলাম, দলের সঙ্গে যাওয়াটা আরো বোকামি। একা থাকলে প্রাণ বাঁচলেও বাঁচতে পারে কোনোরকমে। নইলে মৃত্যু সুনিশ্চিত।

এই ভেবে আমি কোনো দলে ভিড়ে যাওয়ার চিন্তা ছেড়ে দিলাম এবং সন্ধ্যে পর্যন্ত ওখানেই আখ-খেতের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে রইলাম।

সারাক্ষণ দারুণ তেষ্টায় কাটলো। গলায় যেন কাঁটা ফুটছে। এখন তো আর ঢোঁক গিলতেও পারছিনে। তালু শুকিয়ে খসখসে হয়ে উঠেছে। এক সময় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে এলো। ভয় পেয়ে আমি দরবার সাহেব কর্তারপুর স্টেশনে যাওয়াই ঠিক করলাম। ওখানে অবশ্যিই জল মিলবে। একবার জল তো খেয়ে নিই, তারপর কপালে থাকলে মরতে তো হবেই।

এই ভেবে আখের খেত থেকে বেরোলাম। রেললাইনের ধারে ধারে নয়ান জুলিতে লুকিয়ে লুকিয়ে দরবার সাহেব কর্তারপুর স্টেশনে গিয়ে পৌঁছলাম।

আজ স্টেশন অন্ধকার। দরজায় টিকেটবাবু নেই। প্লাটফর্মে বাতি জ্বলছে না। স্টেশন-মাস্টারের ঘরে স্টেশন-মাস্টার মরে পড়ে রয়েছে। বাইরে প্লাটফর্মের চারদিকে শিখ ও হিন্দুর লাশ বীভৎস অবস্থায় ছড়িয়ে আছে। বিমর্ষ চোখে এইসব দৃশ্য দেখতে দেখতে আমি সোজা হিন্দু-জলের দিকে গেলাম। আকণ্ঠ জল খেলাম। কিন্তু ঠিক চোরের মতো হাঁটছিলাম আমি। যেন এতোটুকু পায়ের শব্দ না হয়। জল খেয়ে চাঙ্গা হয়ে চারদিকে ভালো করে তাকালাম।

কোথাও জনপ্রাণী নেই। চারপাশে শুধু লাশ আর লাশ।

হঠাৎ প্লাটফর্মের পশ্চিম মুড়োয় একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তিকে নড়াচড়া করতে দেখলাম। ছায়ামূর্তিটা দেখেই হিন্দু-জলের বড় জালাটার পেছনে লুকিয়ে পড়লাম আমি।

হিন্দু-জলের সামনেই মুসলিম-জলের কালো জালা। সেটার সামনে কয়েক গজ দূরে স্টেশনের ছাদ থেকে ঝুলছে পেতলের ঘণ্টা। তার কাছেই সেই অস্পষ্ট ছায়াটা কি যেন খুঁজছে। লাশগুলোর ওপর তাকে ঝুঁকে পড়তে দেখা যাচ্ছে, কিছুক্ষণ পর আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে। এখন আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি। একটা বুড়ো থুত্থুড়ে লোক। সাদা দাড়ি। হাড়-জিরজিরে দুর্বল চেহারা। তার এক হাতে স্টেশনের লাল-সবুজ আলোর লণ্ঠন। লাশগুলোর মধ্যে ঘুরে ঘুরে সে যেন কিছু খুঁজছে ভাবলাম, বেচারা বুড়ো, হয়তো তার জোয়ান ছেলে খুন হয়েছে, কিংবা অন্য কোনো আপনজন; আর সে লণ্ঠন-হাতে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাকে। লাশগুলো উলটে-পালটে তাকে চিনে বার করার চেষ্টা করছে।

যখন সে আমার খুব কাছে এসে পড়ল, তখন দেখলাম, সে লোক চেনার চেষ্টা করছে না, লাশগুলোর জিনিসপত্তর হাতড়াচ্ছে। এবং টাকা পয়সা প্রভৃতি দামী দামী জিনিস বার করে নিয়ে একটা থলেতে পুরছে।

হঠাৎ আমার মনে কি এলো কি-জানি, আমি আমার জায়গা থেকে উঠলাম। ও যখন একটা লাশের ওপর ঝুঁকে পড়েছে, অমনি আমি পেছন দিকে গিয়ে তার হাত ধরে ফেললাম। ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কে তুই?'

বুড়ো হকচকিয়ে গেলো। তার চোখের সাদা সাদা মণি-দুটো বেরিয়ে এলো। ঠোঁট কাঁপতে লাগল তার। ভয়ে তার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল, 'আমি মুসলমান।'

আমি তার ঘাড় চেপে ধরে বললাম, 'মুসলমান হলে এখুনি মেরে ফেলবো তোকে।'

বুড়োর মুখ থেকে কফ বেরিয়ে দাড়িতে মাখামাখি হতে লাগল। থলে ফেলে দিয়ে দুহাত জোড় করে বলল, 'না না, আমি মুসলমান নই। আমি—আমি—বুলাকী শাহ্। কঞ্জ্ রোডের বুলাকী শাহ্। নিশ্চয়ই নাম শুনেছ আমার।'

আমাদের সারা অঞ্চল জুড়ে কঞ্জ্ রোডের বুলাকী শাহের নাম কে আর শোনেনি! ও আমাদের এলাকার সবচেয়ে বড় মহাজন। এমন কেউ চাষী নেই যে ওর খাতক নয়। এমন একটা বাড়ি নেই, যে-বাড়ির জিনিসপত্তর তার বাড়িতে বন্ধক নেই।

'বুলাকী শাহ্! তুমি এখানে কি করছ?'

'আমার সবাইকে মেরে ফেলেছে! যা-কিছু ছিল আমার, সব লুটপাট করে নিয়েছে।'

'সে সব তোমার ছিল কোথায় বুলাকী শাহ্?'

আমার কথার জবাব না দিয়ে ও বলল, 'শুধু এক মেয়ে বেঁচে আছে। ও আগের দলটায় গেছে। এখন গিয়ে তাকে খুঁজলে হয়তো পাবো।'

'কিন্তু এখন তুমি এখানে কি খুঁজছ?'

'হে-হে।' বুড়ো হাসল। আমাকে একজন হিন্দু দেখে সে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। বলল, 'বাবা, আমার একটাই মেয়ে আছে। আর কিছুই নেই। যদি ও বেঁচেবর্তেই থাকে, সোমত্ত মেয়ে, বিয়ে-টিয়ে কি করে দেবো? এই ভেবে···।' সে আর কিছু না বলে মাটিতে পড়ে থাকা থলেটার দিকে ইশারা করল।

আমি থলেটা কুড়িয়ে নিয়ে দেখলাম, তাতে এক টাকা, দু টাকা, পাঁচ টাকা, দশ টাকা আর একশো টাকার নোট রয়েছে। ঘড়ি রয়েছে। ছ-সাতটি সোনার আংটি রয়েছে।

বুড়ো বলল, 'ভাবলাম, এরা তো মরেই গেছে, এই টাকা পয়সা এদের আর কি কাজে লাগবে? মুসলমানরা এসে আমাদের জিনিস নিয়ে যাবে!'

'তোমাদের জিনিস?'

'হ্যাঁ, তাই ভাবলাম, আমিই নিয়ে যাই। হে-হে···এই টাকা···আমার মেয়ের বিয়েতে কাজে লাগবে···'

'আচ্ছা? তাহলে তুমি এই লাশগুলোর মধ্যে তোমার মেয়ের যৌতুক খুঁজছিলে?' আমি খুব অবজ্ঞা ও ঘৃণার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম ওকে। কারণ বুড়োর কথায় আমার আদৌ বিশ্বাস ছিল না।

ও গড়গড় করে বলে গেলো, 'হ্যাঁ বাবু। তাছাড়া এখানে আর কি খুঁজব?' উলটে আমাকেই জিজ্ঞেস করল ও।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম ওকে। তারপর বড় উদাস গলায় বললাম, 'আর তোদের এই লোভ-লালসায় যে-জন্মভূমি হারাতে হয়েছে, সেই জন্মভূমি খুঁজছি আমি।' বুলাকী শাহের ঘাড় থেকে হাত সরিয়ে নিলাম। কারণ আমার মনে হচ্ছিল, আমি কোনো মানুষের গায়ে নয়, সাপের খোলসে হাত রেখেছি। জোরে এক ধাক্কা মেরে ওকে লাশ-গুলোর ওপর ফেলে দিলাম। তারপর স্টেশনের বাইরে চলে গেলাম আমি।

স্টেশন থেকে অনেক দূর এসে একবার পেছন ফিরে দেখলাম, সেই অন্ধকার ছায়াটা চোখে পড়ছে। লাল বাতি নিয়ে লাশগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে।

বুলাকী শাহ্!

পাঁচ

স্টেশন থেকে বেরিয়ে আমি একটা কাঁচা রাস্তা ধরলাম। রাস্তার দুপাশে আখের খেত। রাতের অন্ধকারে এক বিশাল শক্ত দুর্গের মতো দেখাচ্ছে। লজ্জায় ভয়ে ভীত হয়ে রাত্রি নেমে এসেছে আখের খেতগুলোয়। চারদিকে এক ভয়ংকর

স্তব্ধতা। কেবল আমার কুকুরটা পেছনে আসতে আসতে আকাশের দিকে মুখ তুলে মাঝে মাঝে কেঁদে উঠছে। এই রুমী এক আশ্চর্য কুকুর। দিনের বেলা একবারও কাঁদে না। আখের খেতে পা টিপে টিপে আমার সঙ্গে চলে। আমি হাঁটলে সে হাঁটে, আমি থামলে সে-ও থামে। কিন্তু আমার কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে দূরে। কারণ একবার রেগে গিয়ে আমি ওকে একটা লাথি মেরেছিলাম। লাথি খেয়ে একটু দূরে সরে গিয়েছিল সে। আমার আঘাতটা সহ্য করেছিল চুপচাপ।

তারপর থেকে রুমী বড় সতর্ক। কারণ রুমীর পেটে বাচ্ছা রয়েছে। সে তাদের সাবধানে আগলায়। আর তার ধারণা, আমাকেও আগলাচ্ছে সে। তাই রুমী আমার পেছনে বেশ খানিকটা দূরে দূরে হেঁটে আসছে। দিনে একদম চুপ করে থাকে, কারণ দিনে আক্রান্ত হওয়ার ভয় রয়েছে। কে জানে, একটা কুকুরের এতো বুদ্ধিশুদ্ধি হলো কি করে!

ও শুধু রাত্রিতে কাঁদে। আকাশের দিকে মুখ তুলে শোক প্রকাশ করে। ওই আকাশে এমন কে আছে, যার দিকে চেয়ে রুমী অভিযোগ জানায়? আজ আকাশের রঙ কালো। একটা তারাও ঝিকমিক করছে না কোথাও। পৃথিবী একেবারে স্তব্ধ, চারদিকে যেন ভয় জড়ানো। দিগন্ত নিবিড় স্তব্ধতায় আচ্ছন্ন। হাওয়ার শব্দটুকু পর্যন্ত নেই। আর দুপাশে দুর্গের মতো শক্ত মজবুত প্রাচীর। রুমী, তোর অভিযোগ-বার্তা এই জমাট অন্ধকার ভেদ করে কোথায় পৌঁছতে পারে! কারণ অন্ধকারের হৃদয় নেই, শুধু উদর-গহ্বর। অভিযোগ শোনার ক্ষমতা তো শুধু হৃদয়েরই থাকে। উদর-গহ্বর শুধু রক্ত পান করতেই জানে।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে এভাবে কেবল হাঁটছি আর হাঁটছি। মনের মধ্যে ইচ্ছে, এভাবেই হাঁটতে হাঁটতে নদী পর্যন্ত নির্বিঘ্নে পৌঁছনোর রাস্তাটা খুঁজে বার করতে পারব ঠিক। কিন্তু কয়েক মাইল হাঁটার পর মনে হলো, এ-পথটা ভুল। যে পথ ভেবেছিলাম, একটা সে-পথ নয়। অন্য পথ। শেষ আর হয় না। কে জানে শেষ পর্যন্ত পথটা কোথায় গেছে! ধীরে ধীরে রাস্তাটার ওপর দল বেঁধে লোক যাওয়ার চিহ্ন চোখে পড়ল। হাজার হাজার পায়ের ছাপ, রাস্তার এতোটুকু জায়গা খালি নেই কোথাও।

রাস্তায় এক বুড়ো জাঠকে আর্তনাদ করতে দেখলাম। আমাকে দেখেই সে ভয়ে একদম চুপ করে গেলো। তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সে এমনভাবে আমার দিকে চাইল, যেন মৃত্যু দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে।

বললাম, 'ভয় নেই। আমিও এক রিফিউজি।'

ধড়ে যেন প্রাণ এলো তার। ঠেলে আসা কণ্ঠনালী দু-তিনবার ওপরে নীচে ওঠা-নামা করল। তারপর তার গলা থেকে বড় কষ্টে একটা ফ্যাসফেঁসে শব্দ বেরিয়ে এলো, 'ওয়াহ্ গুরু...ওয়াহ্ গুরু...আমি তো ভেবেছিলাম...'

'তুমি ভুল বুঝেছিলে বাবা। এখানে পড়ে রয়েছ কেন?'

'আমার ছেলেরা আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যায়নি।'

'কেন নিয়ে যায়নি ?'

'আমি যে হাঁটতে পারিনে বাবা। খুব বুড়ো হয়ে পড়েছি যে।'

'তোমার ক-টি ছেলে ?'

'তিনটি। তিনটেই তাগড়া জোয়ান। আমাকে এখানে ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে।'

সমবেদনায় আমার মুখ থেকে 'চুকচুক' শব্দ বেরলো।

বুড়ো আমার সমবেদনাকে ভুল বুঝলো। গড়গড় করে বলল, 'আমাকে এখান থেকে সাঁকো পর্যন্ত নিয়ে চলো বাছা। শুনেছি রাবীর সাঁকোটা খুব কাছেই। সাঁকো পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারলে তোমাকে জীবনভর আশীর্বাদ করব। আমাকে শুধু সাঁকো পর্যন্ত পৌঁছে দাও।'

'আমারই সাঁকো পর্যন্ত যাওয়ার ইচ্ছে। নিজের পৌঁছনোটাই এখন বড় কথা। তোমাকে কাঁধে নিয়ে আমি কোথায় ঘুরে বেড়াবো !'

'আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলো বাবা। সঙ্গে নিয়ে চলো।'

আমি সামনে পা বাড়ালাম।

বুড়ো কয়েক পা হাচড-পাঁচড় করে হামাগুড়ি দিয়ে এলো, 'পৌঁছে দাও বাবা···বাবা !'

বুড়ো আমার পা ধরে ফেলল। আমি জোরে পা ঝাড়তেই সে একটা পাক খেয়ে গড়াতে গড়াতে রাস্তার ধারে খানায় পড়ে গেলো।

কুকুরটা আচমকা জোরে চেঁচিয়ে উঠল। তারপর চোখ বড় বড় করে আমাকে দেখতে লাগল সে।

অনেকদিন আগে জ্যাক লণ্ডনের একটা গল্প পড়েছিলাম। তাতে তিনি বলেছেন, আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যে একটা প্রথা আছে। বাবা খুব বৃদ্ধ হয়ে পড়লে তাকে একটা থলেতে সাতদিনের খাবার, সাতদিনের তামাক আর সাতদিনের জল দিয়ে শীতকালে এক নির্জন বরফাচ্ছন্ন প্রান্তরে রেখে আসে।

যখন মানুষ আরণ্যক জীবনযাপন করত, এক-একটা পরিবার গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে বসবাস করত, এটা ছিল তখনকার নিয়ম। হিংস্রতা ও বর্বরতাই ছিল তখন জীবিকার একমাত্র উপায়। যখন খাদ্যদ্রব্যের অভাব ঘটত, গ্রীষ্মের দাবদাহে তৃণভূমি শুকিয়ে যেতো একেবারে, তখন মানুষ প্রকৃতির নিষ্ঠুর হাতের চড় খেতে খেতে রুটি-রোজগারের ধান্দায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াতো।

কিন্তু এখন তো সভ্যতার জয়জয়কার। দুপাশে আখের খেত। দূরে কোথায় এক রাবীর সাঁকো। আর কাছে কোথাও রেললাইনে গাড়ি সিটি মারতে মারতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে চলেছে। কিন্তু খানায় পড়ে যাওয়া ওই বৃদ্ধ নির্বাক দৃষ্টিতে কি জিজ্ঞেস করছে আমাকে ?

মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এই অন্ধকার খানা-খন্দ থেকে বেরিয়ে আসবে কবে?

হুম্! মাথা হেঁট করলাম আমি। আমি কি একা মানুষের সভ্যতার ঠিকেদারি নিয়েছি? বুড়োর ছেলেরাই যখন তাকে ফেলে পালিয়েছে, তখন তাকে বাঁচানোর দায়-দায়িত্ব আমার ওপর এসে বর্তায় কি করে? জাহান্নমে যাক বুড়ো। হতচ্ছাড়া কুকুর, তুই ফের যদি কখনো আমায় ওরকম ভর্ৎসনা করিস, শাপ-শাপান্ত করিস, লাথি মেরে তোর হাড্ডি চুরচুর করে দেবো।

আমি কুকুরটাকে মারার জন্যে লাথি তুললাম। রুমী তৎক্ষণাৎ পেছনে দৌড় দিলো। আমি সামনে পা বাড়ালাম।

কিছুদূর যেতেই পথ আরো প্রশস্ত হলো। একটা বড় পাকা সড়কে গিয়ে মিশেছে সেটা। এখান দিয়েও সম্ভবত কোন দল গেছে। কারণ এক জায়গায় একটা কাটা হাত পড়ে আছে। শুধু একটা হাত। বাকী দেহটা উধাও। না ধড় না মুণ্ডু। না পা না পায়ের পাতা। না মুখ। না কোমর। শুধু একটা হাত পড়ে রয়েছে রাস্তায়, আমার যাওয়ার পথ আগলে। আমার পথের ওপরেই পড়ে রয়েছে সেটা। আর সেই হাতের চেটো আকাশের দিকে উন্মুক্ত।

শুধু একটা হাত। একটা বাহু···হাতটা খোলা। আকাশের দিকে চেয়ে আছে যেন। এই হাত কখনো লাঙল চালিয়েছে, কখনো ডাংগুলি খেলেছে। এই হাত কখনো কারোর কোমর আলিঙ্গন করেছে, কখনো আদর করে নিজের ছেলেমেয়েকে কোলে তুলে নিয়েছে, কখনো ফুলের ঘ্রাণ নিয়েছে, কখনো কোন মেয়ের মাথার চুল পরিপাটি করে দিয়েছে। এই হাত সাঁকো বানিয়েছে, শহর গড়েছে, ফুল ফুটিয়েছে। এই হাত নিজের প্রেমিকার মুখ-চোখে হাত বোলাতে বোলাতে নিজের ভবিষ্যৎ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার ছবি খুঁজেছে। আজ সেই হাত আকাশের দিকে চেয়ে মাটিতে পড়ে আছে। হাতটা কি কোনো হিন্দুর, না মুসলমানের? না কোনো শিখের, না খ্রীষ্টানের? কিছুই বলে না হাতটা। শুধু নিজের পাঁচটি আঙুল তুলে আকাশের দিকে নীরবে চেয়ে আছে। এটা কার হাত? যদি এটা কোনো মানুষের হাত হয়, সেই মানুষটা আজ কোথায়?

হা-হা-হা···নির্বোধের মতো প্রশ্ন! কতো না অভিযোগ! ওদিকে দলটা ক্রমশ চলে যাচ্ছে···

আমি লাফ মেরে হাতটা পেরিয়ে সামনে দ্রুত হাঁটতে লাগলাম।

কিছুদূর গিয়ে একটা শব্দ কানে এলো। মানুষের গলার আওয়াজ—আর্তনাদ। আমি ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়ালাম।

রাস্তার একদিকে তিনটি ছেলে মরে পড়ে আছে। তাদের কাছেই একটি মেয়ে আহত অবস্থায় পড়ে পড়ে কাতরাচ্ছে। আমাকে দেখতে পেয়েই বলল, 'আমাকে মেরে দে ভাই। আমার প্রাণটুকু বার করে দে।'

মেয়েটির কোমরের কাছে অনেক রক্ত পড়ে জমে গেছে। তারই কিছুটা ধীরে ধীরে গড়িয়ে যাচ্ছে তখনো।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাকে কি মুসলমানরা মেরেছে ?'

ও বলল, 'না। আমার স্বামীই ছেলে তিনটিকে খুন করেছে। আমাকেও মারতে চেয়েছিল। কিন্তু কি জানি কেন, আমি এখনো বেঁচে আছি। প্রাণ বেরোচ্ছে না।'

'তোমার স্বামী তোমায় মারল কেন ?'

ও যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে বলল, 'আমাদের দলের ওপর হামলা হতেই ও আমাকে ফেলে লড়তে যাচ্ছিল ওদের সঙ্গে। আমি ওর হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলাম, তুমি যাচ্ছো, কিন্তু কোথায় যাচ্ছো ? আমাকে, আমার ছেলেপিলেকে কার আশ্রয়ে ছেড়ে যাচ্ছো ? তাতে ও রাগে কটমট করে তাকালো আমার দিকে। তারপর ছুরি বার করে তিনটি ছেলেকেই কেটে ফেলল। আমি ভয়ে ছুটে পালাচ্ছিলাম, ও আমার দিকে ছুরি ছুঁড়ে মারল। ছুরি এসে আমার কোমরে লেগেছে। দলটা চলে গেছে। আমি এখানে পড়ে পড়ে কাতরাচ্ছি। কিন্তু প্রাণটা বেরোচ্ছে না। কিছুতেই প্রাণ যাচ্ছে না আমার। প্রাণটা বার করে দাও ভাই, তোমার মঙ্গল হবে। আমাকে শেষ করে দাও।'

'সকাল হতে না হতে আপনা থেকেই তোমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। আমায় কেন আর পাপ কাজটা করতে বলছ !' এই বলেই আমি হাঁটতে শুরু করলাম। অনেকক্ষণ মেয়েটির গালাগালি আমার কানে এলো, 'ঈশ্বর করুক তোর কিছু না থাকে ! তোর ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হোক (সেটা তো আগেই হয়েছে)। তোর মা মরুক (সে-ও হয়তো আগেই মরেছে)। তোর ছেলেপিলে না খেয়ে মরুক (হয়তো মরেই গেছে)। হ্যাঁ রে অলপ্পেয়ে, তোকে দিয়ে আমার কি এটুকুও হলো না ?'

চলতে চলতে হঠাৎ আমার মনে হলো, হাজার মাইল পথ হেঁটে আমি ক্লান্ত। আমার পা টলমল করছে। লোটাতে লোটাতে আমি আখের খেতের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। আখের শুকনো পাতায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

যখন ঘুম ভাঙলো, তখন সকাল হয়েছে। সূর্য উঠেছে। রুমী আমার পায়ের কাছে ঘুমিয়ে। কাছেই সড়কে একটা নতুন দল চলেছে। আখ-খেত থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। এক লাফ দিয়ে দলটার মধ্যে মিশে গেলাম। দেহমন এমন এক জড়তায় আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিল যে, চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতাটুকুও লোপ পেয়েছিল। দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে লোকগুলো যে ভাবে প্রাণপণে ছুটছিল, আমিও সেইভাবে তাদের সঙ্গে ছুটতে শুরু করলাম। কোথাও না কোথাও তো যাচ্ছি ! কোনো এক জায়গায় গিয়ে পৌছবই।...লাগাম-ছাড়া দলটা কোথাও গিয়ে পৌছবে তো !

যা হবার হোক !

ছয়

ভিড়ের মধ্যে যেখানটায় আমি ছিলাম, বলতে গেলে গোটা দলটার বৈশিষ্ট্য সেখানে কেন্দ্রীভূত। আমার সামনে চারজন হিন্দু যুবক তাদের বাবাকে খাটে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে লাশের মতো। খাটের ওপর নানা আকারের গাঁটরি রয়েছে বুড়োর চারপাশে। আমার ঠিক সামনে এক শিখ জাঠ, মুখে ঢাটা-বাঁধা, হাতে ছুরি, নিজের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে চলেছে। দুজনের মাথাতেই বড় বড় বোঁচকা। আমার পেছনে পেছনে আসছে একটা গরুর গাড়ি। দুটো বলদ টেনে আনছে গাড়িটা। গাড়ির ওপর একটা গোটা পরিবারের লোকজন তাদের সমস্ত আসবাবপত্তর নিয়ে বসে আছে। কোনো জমিদারবাড়ির লোকজন বলে মনে হচ্ছে তাদের। আমার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চলেছে এক বুড়ো বেনে। গায়ের রঙ কালো। সাদা গোঁফ। নিজের ধুতিতে কি যেন আঁটসাঁট করে বেঁধে রেখেছে।

বুড়োর এক হাত বোঁচকার ওপর, অন্য হাতে সে নিজের মেয়ের একটা হাত শক্ত করে ধরে আছে। মেয়েটি খুব সুন্দরী। যখন সে তার বড় বড় চোখের ভারী পাতা বড় কষ্টে তুলে কারোর দিকে তাকাচ্ছে, তখন তার বুক ঢিপঢিপ করে উঠছে। মেয়েটির লাজনম্র সকরুণ সৌন্দর্যের মধ্যে এক আশ্চর্য আকর্ষণ। ভরা যৌবনের ছন্দোময় গতিভঙ্গিতে এমন এক মাধুর্য, যেন সে কোথাও ছুটে যাচ্ছে না, তার পেছনেই ছুটে আসছে লোকজন। আমাদের মধ্যে সে এক প্রদীপের শিখার মতো জ্বলছে, যার ফলে এই ভিড়ের মধ্যেও জীবন প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকেই আড়চোখে দেখে নিচ্ছে তাকে, তারপর আবার সামনে হাঁটছে। মৃত্যু মাথার ওপর। কিন্তু এই সৌন্দর্যের আকর্ষণ অস্বীকার করার ক্ষমতা কারোর নেই। সবাই এক মুহূর্ত থেমে তাকে দেখতে বাধ্য হচ্ছে।

বেনের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগলাম আমি।

কিছুদূর গিয়ে বেনেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোত্থেকে আসছ?'

'যেখান থেকেই আসি আমি, তোমার কি তাতে?' তিরিক্ষে মেজাজে জবাব দিলো বেনে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ একসঙ্গে হাঁটতে থাকলাম দুজনে। অবশেষে আবার সাহস করে জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা তোমার মেয়ে?'

'নইলে কি তোমার?' বেনে আমার দিকে কটমট করে চেয়ে বলল। আরো জোরে মেয়ের হাত চেপে ধরল সে।

মেয়েটিও তাকাল আমার দিকে। সরোবরে যেন দুটি পদ্ম ফুটল। সরসীর জলের মৃদুমন্দ আন্দোলনে আন্দোলিত হচ্ছে পদ্ম দুটি। আর সরোবরে আমি

যেন ডুবে যাচ্ছি। নির্মল বিকশিত ফুল, মদিরাচ্ছন্ন আঁখি, শ্যাম্পেনের পাত্র থেকে ছলকে পড়ছে যেন।

আঃ···আঃ···আমি ভয় পেয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। আসলে এসব ব্যাপারে আমি বেজায় আনাড়ি। হাজি, বরক, মিয়াঁ—ওরা এসব বোঝে-সোঝে। নিজের মনটাকেও চেনে। এসব ব্যাপারে আমার মতোই ঠিক দুর্বল ওরা। কিন্তু ওরা ভীষণ জটিল, রহস্যময়। প্রায়ই নিজেদের দুর্বলতা লুকিয়ে রাখে। আমি তো একটা বোকা, গাধা। আমার দ্বারা কিছু লুকোনোই যায় না···আর তাই পড়ে পড়ে মার খাচ্ছি।

বেনেকে খাপ্পা দেখে বেশি কথাবার্তা না বলাই উচিত বলে মনে হলো আমার। মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গে এক শিখ যুবককে হাঁটতে দেখে আমার গা-পিত্তি জ্বলে যাচ্ছিল। যুবকটি ছ-ফুটের ওপর লম্বা। মুখে চমৎকার ফুরফুরে পাতলা, দাড়ি, তাতে তার চেহারাটা আরো খুলছে। বেনের মেয়ে ও যুবকটি পরস্পরের পরিচিত নয়। তবু একসঙ্গেই হাঁটছে তারা। অথচ একজন আরেকজনের সঙ্গে কথা বলারও সাহস পাচ্ছে না। একজন আরেকজনকে মিটমিটে আড় চোখে দেখছে শুধু। অনেকক্ষণ আমি তো ভেতরে ভেতরে জ্বলতেই থাকলাম। ভীষণ রাগ হচ্ছিল। কিন্তু মনে মনে যখন আমি সেই শিখ চাষীটার সঙ্গে নিজেকে ওজন করলাম, তখন নিজের দিকটার ওজন বড় কম বলে মনে হলো। ফলে আমি অস্ত্র-শস্ত্র ফেলে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে শেষবারের মতো চেয়ে দেখলাম মেয়েটিকে, তারপর সামনে এগিয়ে গেলাম। দলের সামনে এসে চেষ্টা করতে লাগলাম, যাতে কোনো জানাশোনা লোক, অন্তত গাঁয়ের কোনো লোকজনের সঙ্গে দেখা হয়। সেরকম দেখা হলে নিজের আত্মীয়-স্বজনের কিংবা স্ত্রী-ছেলে-মেয়ের খবরটা নিতে পারব। খিদেও পেয়েছিল জোর। কারোর কাছে খাবার-টাবার থাকলে এক আধটু চেয়েও নেবো না হয়। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সেরকম লোকজনের দেখা পেলাম না। শেষ পর্যন্ত হতাশ হতে হলো আমাকে।

দুপুরবেলা এক উন্মুক্ত প্রান্তরে দলটা বিশ্রাম করে নিলো। এখানে আখের খেত শেষ হয়েছে, নদীর ধারের জলজ ঘাস শুরু হয়েছে। কয়েকটি ঢিবির ওপর কিছু ঝোপ-ঝাড় মেটে রঙের পাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দূরে রাবী নদীর কিনারা চোখে পড়ছে—অস্পষ্ট, দিগন্তে বিলীন। আকাশে ধূসর মেঘ। শুকনো খটখটে মাটি। ধুলো-ময়লায় লোকগুলোর চেহারা কিম্ভূতকিমাকার। কপালে হাত রেখে তারা ডেরা বাবা নানকের সাঁকো খুঁজছে। কিন্তু সাঁকোটা পাতালেই তলিয়ে গেছে, না আকাশেই উঠে গেছে, চোখেই পড়ে না। সাঁকোটার কথা ভেবেই তো তারা এসেছে। দলের মাতব্বররা দেখল দারুণ বিপত্তি। রাস্তা গোলমাল হয়ে গেছে। সাঁকোয় পৌছতে হলে এখনো তিন মাইল পশ্চিম দিকে যেতে হবে, তারপর বাঁয়ে ঘুরে আরো পাঁচ মাইল হাঁটতে হবে। তবেই সেই

সাঁকোর দেখা পাওয়া যেতে পারে। এখন খাওয়া-দাওয়াটা সেরে নেওয়া দরকার।

দুজন চারজন দশজন বিশজন করে এক-একটা দল পাকিয়ে লোকজন বসে গেলো খাওয়া-দাওয়া সারতে দলের হিন্দু ও শিখ যুবকরা এদিকে ওদিকে পাহারা দিতে শুরু করল। তাদের হাতে লাঠি ছুরি, কৃপাণ, কুড়ুল, দেশী বন্দুক। কেউ কেউ সাঁজোয়া পরা। তাদের কাছে পিস্তল। অনেকে রাগে কটমট করে চারদিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু ওপরে বাহাদুরি ও রাগ দেখালেও প্রত্যেকের বুক ভয়ে দুরদুর করে কাঁপছে। নিজের অজান্তেই কারোর কারোর চোখে ভয়-ভাবনার ছায়া পড়ছে, অমনি তার সারা মনের ছবি ভেসে উঠছে সেখানে।

আমি নিজেকে শেষ পর্যন্ত সামলাতে পারলাম না। বেনে আর তার মেয়ে আছে যেখানে, সেখানে আবার গেলাম। মেয়েটি চুপচাপ তার বাবার সঙ্গে বসে বসে খাচ্ছিল। মেয়েটির দিকে পেছন ফিরে বসে সেই সুদর্শন চেহারার শিখ যুবকটি নিশ্চিন্ত মনে খাবার খেতে ব্যস্ত। খুব ভিড় সেখানে। জায়গা খুব কম। সেজন্যে সুন্দরী মেয়েটির পিঠ যুবকটির পিঠে লেগে রয়েছে। না-জানি এখন কতো বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে ওদের সারা শরীরে। রাগে জ্বলতে জ্বলতে ভাবছিলাম আমি।

আমার দারুণ খিদে পেয়েছিল। এতোক্ষণ যা ভাববার ভেবেছি, এখন খিদে ছাড়া অন্যকিছু ভাবতেই পারছি নে। খিদে আমাকে অস্থির করে তুলল। দু-তিন জনের কাছে খাবার চাইলাম, কিন্তু কেউ দিলো না। অবশেষে সর্দার লহনা সিং এবং তার স্ত্রী নীতু আমাকে খাওয়ার জন্যে ডেকে নিলো। গোরুগাড়িতে চেপে এসেছে যে জমিদার পরিবারটি, তারা সবচেয়ে বেশি নিজেদের জাঁকজমক দেখাচ্ছিল। তাদের ছেলেপিলেদের এমন ভাবভঙ্গি, যেন তারা গোরুগাড়িতে নয়, বিউকে চড়ে বেড়াচ্ছে।

আমাদের খাওয়া-দাওয়াই চলছে তখন, এমন সময় ঢিবিগুলোর পেছন থেকে ধুলো-বালির ঝড় উঠল যেন। পাহারাদাররা চীৎকার করে উঠল। সবাই নিজের নিজের খাবার ফেলে দৌড় দিলো। জমিদার পরিবারের ছেলেগুলো গোরু গাড়িতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কাঁদছে। ওদের মায়েরা দুহাতে বুক চাপড়াচ্ছে।

লহনা সিং নীতুর হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'হাতের চুড়ি ভেঙে দে।'

নীতু জোরে জোরে কব্জির ওপর কব্জি ঠুকে কাঁচের চুড়িগুলো ভেঙে ফেলল। লহনা সিং ঠোঁট কামড়ে বলল, 'ধরে নে, আজ থেকে তোর স্বামী মরে গেছে।'

নীতুর চোখ থেকে ঝরঝর করে জল ঝরতে লাগল। কিন্তু মুখে একটা কথাও বলল না।

লহনা সিং ছুরি বাগিয়ে পাহারাদারদের সঙ্গে মুসলমানদের মোকাবিলা করতে চলে গেলো। নীতু মাথায় বোঁচকা তুলে নিয়ে চেয়ে রইল তার দিকে।

বেনে ভয় পেয়ে নিজের মালপত্তর সামলাতে সামলাতে চীৎকার করে উঠল, 'হায় হায়, লক্ষ্মী সোনা মেয়ে আমার! যমুনা…যমুনা…'

কিন্তু যমুনাকে সেই শিখ যুবকটি দুহাতে আলগোছে তুলে নিয়ে আখ-খেতের দিকে পালিয়ে গেছে। বেনে চীৎকার করে করে নিজের ,তীব্র খেদ জানাতে লাগল। কিন্তু তখন অদ্ভুত বাসনা চরিতার্থের সময়। মুসলমান হামলাকারীরা দলের মধ্যে হামলা শুরু করেছে। লোকজন নিজের নিজের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে এদিকে-সেদিকে ছোটাছুটি করছে। নিজের প্রাণ বাঁচানোর বদলে বেনের মেয়ের ইজ্জত বাঁচানোর জন্যে কে আর পড়ে আছে তখন!

আমিও একদিকে দৌড়লাম। প্রথমে তো অনর্থক নদীর দিকে। কারণ টিবিগুলোর ঝোপঝাড়ের পেছনে মুসলমান হামলাকারীরা রয়েছে। সেজন্যে তাদের উল্টোদিকেই দৌড় দিলাম। কিন্তু যখন হামলাকারীরা নদীর দিকের পথ বন্ধ করার জন্যে ঘোড়া ছোটালো, তখন সে-পথ ছেড়ে দিয়ে হাঁসফাঁস করতে করতে আখ-খেতের রাস্তা ধরলাম। আখ-খেতে তখনো পৌছোই নি, এমন সময় খেতের মধ্যে থেকে একদল হামলাকারী বেরিয়ে এলো। একজন মুসলমান এসে আমার বুকের ওপর বল্লম ধরল।

সেই মুহূর্তটি আমার এখনো মনে আছে। কখনো ভুলিনি, ভুলবও না কোনোদিন। বল্লম আমার বুকের ওপর। আমার চারদিকে মুসলমান হামলাকারীদের লোক। তাদের পেছনে একজন ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। দুপাশের রেকাবে তার পা। কারুখচিত পাগড়িতে আধখানা মুখ ঢাকা।

হঠাৎ তাদের থামানোর জন্যে হাত তুললাম আমি। অশ্বারোহীর চোখে চোখ রেখে হেসে বললাম, 'কি আমার ভাগ্য! সারা জীবন কম্যুনিস্ট হয়ে পাকিস্তানের জন্যে প্রপাগাণ্ডা করে বেড়ালাম, মুসলমানদের ন্যায্য স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করে এলাম, আর আজ যখন পাকিস্তান তৈরি হলো, তখন বর্শা চালানো হচ্ছে আমার বুকেই!'

জানিনে কি করে এ-ধরনের কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল সেদিন। সে কোন্ শক্তি, যে আমাকে এ ধরনের কথা বলতে সাহায্য করেছিল! নইলে আমি কখনো কম্যুনিস্ট ছিলাম না, আজ পর্যন্ত কখনো কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিইনি। আমোদ-প্রমোদে কাটানো ফুলবাবু গোছের লোক আমি। আমার হিন্দু-মুসলমান-শিখ বন্ধুরাও সবাই আমারই মতো। লাহোরে নিজের নিজের বিজনেস করি। সন্ধ্যেয় একসঙ্গে টেবিলে জমা হয়ে ফুর্তি ওড়াই। রাজনীতির সঙ্গে কি সম্পর্ক আমাদের? আমাদের তর্ক-বির্তক তো খবরের কাগজের বাদ-বিসম্বাদ আর পুঁথিগত বিদ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ওসব তো হা-ভাতে লোকদের ব্যাপার, অথচ যেমন করেই হোক, প্রাণ বাঁচানোর চরম মুহূর্তে অজুহাতই বলো আর অস্ত্রশস্ত্রই বলো, আমার মাথা থেকে বুদ্ধিটা বেরিয়ে এলো। এটা নিয়ে আজও ভাবি, কিছু ভেবে বলার মতো এখনো

কিছুই পাইনি।

মনে আছে, আমার সেই কথা অশ্বারোহী সর্দারের ওপর বিদ্যুতের মতো কাজ করল। সে তীব্র দৃষ্টিতে আমার নীরব, প্রশান্ত, হাসি-হাসি মুখের দিকে চাইল, তারপর হাত তুলে ইশারা করল, 'ছেড়ে দাও ওকে।'

মুসলমানটা আমার বুক থেকে বর্শা সরিয়ে নিলো। তারপর 'আল্লাহো আকবর' আওয়াজ তুলে ওরা দলের মধ্যে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

যেই ওরা চলে গেলো, অমনি আমি চোঁচা দৌড় লাগালাম। কোনদিকে গেলাম, কিভাবে গেলাম সেটা আজও জানিনে। শুধু মনে আছে, আমি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছি, আখ-খেতের ভেতর দিয়ে, খেতের আলের ওপর দিয়ে, খানা-খন্দে, খেতে জল দেওয়া নালায় নালায়, শুধু ছুটছি। কখনো ঢিবিতে চড়ছি, কখনো দৌড়চ্ছি শুধু বালির মাঠে মাঠে কিংবা রেলের লাইনে লাইনে। একটা শিকারের জন্তুর মতো প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে মন-প্রাণের সমস্ত শক্তি দিয়ে শুধু দৌড়চ্ছি। কোন দিকে দৌড়েছি, কেন দৌড়েছি, কতোক্ষণ দৌড়েছি, সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলতে পারব না আজ।

শুধু মনে আছে, যখন সন্ধ্যে হলো, তখন নিজেকে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম দরবার সাহেব কর্তারপুরের গুরুদ্বারের সামনে। গুরুদ্বারের মজবুত দরজায় একটা লোহার তালা। দরজার একপাশে একটা বড় পুরনো কাঠের আসনে এক বুড়ো শিখ আর তার বুড়ো স্ত্রী বসে। বেশ জোরে জোরে তাঁরা গুরু গ্রন্থসাহেব পড়ছেন।

আমাকে দেখে এক মুহূর্তের জন্যে থামলেন তাঁরা। ওঁদের দেখে আমার কিছুটা ভয় হলো। আমি বুড়ো শিখকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বাবাজী, আপনারা এখানে বসে আছেন কেন? আপনারা কি কিছুই জানেন না?'

বুড়ো শিখ প্রশান্ত মুখে জবাব দিলো, 'সবই জানি বাছা। সব জেনেও আমরা বসে রয়েছি এখানে। গেলে কোথায়ই বা যাবো? আপনার বলতে তো কেউ নেই। না আছে কাচ্চাবাচ্চা, না আছে দূর-সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন। কোনো সম্পত্তিও নেই, ঘরবাড়িও নেই। আমরা দুজন সারাটা জীবন গুরুর এই চরণে বসেই কাটিয়েছি। এখানেই থাকব, এখানেই মরব।' এই বলে ওঁরা আবার গুরু নানকের বাণী পড়তে শুরু করলেন।

আমি প্রণাম সেরে ওখান থেকে চলে এলাম। গুরুদ্বারের চারদিকে ঘুরলাম, কোনো জনপ্রাণী চোখে পড়ল না। আর তখন তো রাতের অন্ধকার ক্রমেই গাঢ় হচ্ছে। কোন দিকে কোন রাস্তা, কিছুই নজরে আসছে না।

গুরুদ্বারের কাছেই একটা বড় কুয়ো ছিল। কুয়োর পাড়ে উঠলাম। তারপর কপিকলের দড়ি ধরে নীচে নেমে গেলাম। জোরে দড়িটা ধরে ঠাণ্ডার মধ্যে শরীরটাকে এলিয়ে দিলাম। ঠাণ্ডায় আমার ক্লান্ত শরীরটা জুড়িয়ে গেলো। আমি সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লাম। কি করে ঘুমোলাম, কতোক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম,

কিছুই জানিনে। যখন ঘুম ভাঙলো, দেখি, সকাল হয়েছে। সূর্যের আলো কুয়োর মধ্যে উঁকি মারছে। কুয়োর পাড়ে একটা কুকুর আকাশের দিকে মুখ তুলে কাঁদছে। আমি কুয়ো থেকে উঠে এলাম এবং গুরুদ্বারের দরজার দিকে এগোলাম।

বাইরে কাঠের আসনে সেই বুড়ো-বুড়ি দুজনেরই মৃতদেহ। জানতেই পারিনি, রাতের বেলা কখন হামলাকারীরা এসে খুন করে গেছে ওঁদের।

সাত

গুরুদ্বার থেকে কয়েক ফার্লং গিয়ে একদম পরিষ্কার রাস্তা। এখন রাবী নদীর তীর স্পষ্ট নজরে পড়ছে। নদীর সাঁকোটাও। দু-একজন রিফিউজীকে দেখা যাচ্ছে নদীর দিকে ছুটে পালাতে। তাদের মধ্যে যমুনাকেও দেখতে পেলাম। কিন্তু তার সঙ্গে এখন সেই শিখ যুবকটি নেই; রয়েছে বদমেজাজী লালচে গাল এক পেশোয়ারী যুবক। যমুনার হাত বেশ শক্ত করে ধরে আছে সে। যমুনা হঠাৎ আমার দিকে তাকালো, তারপর চোখ নামিয়ে নিলো। তার চোখ ছলছল করছে।

যমুনাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার বাবার কি হলো?'

'মারা গেছে।'

'আর—আর—সেই—?'

'সেও মারা গেছে।'

যমুনার মাথাটা আরো ঝুঁকে পড়ল নীচে। পেশোয়ারী যুবকটি কটিবন্ধের পিস্তলে হাত রেখে আমার দিকে চেয়ে বলল, 'যাও যাও, কেটে পড়ো। আজে-বাজে কথা বলতে এসো না।'

আমি তৎক্ষণাৎ ওদের সঙ্গ ছেড়ে এগিয়ে গেলাম। পেছনে পেছনে রূমী। দু-তিনবার তাড়িয়েছি ওকে। কিন্তু তবু সে আশ্চর্য চোখ তুলে, আদরে লেজ নাড়াতে নাড়াতে আমার পিছে পিছে আসছে।

নদী ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে। রাবীর সাঁকোটাও এখন খুব পরিষ্কার চোখে পড়ছে। কিন্তু সাঁকো দিয়ে নদী পার হওয়াটা নিরাপদ মনে হলো না আমার। সাঁকোটার পাকিস্তানের দিকের তীরে মুসলমান হামলাকারীদের আস্তানা। নদীর দুই তীরেই হিন্দু-মুসলমান উভয় দলেরই লুটপাট হচ্ছে, লোক খুন হচ্ছে। কেবল সাঁকোর ওপরেই মিলিটারী পাহারা। তাদের ভার একজন ইংরেজ অফিসারের হাতে। কিন্তু তার কেবল দায়িত্ব, সাঁকো পারাপারের সময় হিন্দু ও মুসলমান দলের প্রাণ ও মালপত্তর যাতে খোয়া না যায়। পাকিস্তানে কি হচ্ছে, হিন্দুস্তানে কি ঘটছে, সেসব দেখার দায়িত্ব তার নয়।

এখন আমি নদীর পারে দাঁড়িয়ে। নদীর ওপারে নির্বিঘ্ন জীবন। ওপারের

কমল বলল, 'সমস্ত ঝগড়াটাই বাধিয়েছিল উমেশ সাকসেনা।'

'তার মানে তোমার ভাই?'

'হ্যাঁ, আমার ভাই। সে এখানে-ওখানে উত্তেজনাকর বক্তৃতা দিয়ে হিন্দুদের উত্তেজিত করে তুলেছিল। সে প্রচার করে দিয়েছিল যে একজন হিন্দু রাজকুমারী একজন মুসলমানকে বিয়ে করতে চলেছে। ফলে লোকগুলো খেপে উঠেছিল।'

'বিয়ে তো একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাতে তোমাদের ধর্মের লোকজনের আপত্তি কেন?'

'ধর্মীয় কুসংস্কার তো সহজে দূর করা যায় না। বিংশ শতাব্দীর মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দী বেঁচে রয়েছে এখনো। বলতে কি, সুদূর পল্লীগ্রামে গেলে খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীও চোখে পড়বে তোমার।'

'কিন্তু এটা নৈনিতাল। আমি মনে করি, এখানে উন্নত মানসিকতা-সম্পন্ন লোকজনই বাস করে।'

'এইসব তথাকথিত উন্নত মানসিকতার লোকজনের ভেতরে কী ধরনের আবর্জনা লুকিয়ে থাকে, এইরকম অবস্থাতেই তার খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যায়।'

'তারপর বল!' শায়েস্তা কথার মোড় ঘুরিয়ে আবার পূর্ব-প্রসঙ্গে ফিরে আসতে চাইল।

কমল বলল, 'রাজা হিম্মত রায় ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে সুধাকে কাশীপুর পাঠিয়ে দিল। নিজের আত্মীয় এক রাজার কাছে। সেখানে সুধাকে প্রায় কয়েদ করে রাখা হয়েছে।'

'কাফেরদের সেপাই!' শায়েস্তার কণ্ঠস্বরে তলোয়ারের তীক্ষ্ণধার।

'এ-ধরনের দাঙ্গায় ধর্মের গোঁড়ামি তো কাজ করেই থাকে, কিন্তু শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই এগুলোকে দেখা ঠিক হবে না।'

'কেন সেটা? দাঙ্গা তো হিন্দুরাই শুরু করেছিল।'

'আমি বলব, আসলে এই দাঙ্গার পেছনে ছিল উত্তেজনাসৃষ্টিকারী এক ব্যক্তি —আমার ভাই উমেশ সাকসেনা। সে-ই দাঙ্গার আগুন জ্বালিয়েছিল। কারণ, সে ইলেকশনে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু তার পায়ের তলায় শক্ত মাটি ছিল না। এই দাঙ্গার পরে এটা সুনিশ্চিত হয়েছে যে ইলেকশনে সে প্রচুর হিন্দু-ভোট পাবে।'

'এই দাঙ্গায় কজন হিন্দু মরেছে?'

'দুজন।'

'আর মুসলমান?'

'হিন্দু আর মুসলমানকে এরকম মৃত্যুর তুলাদণ্ডে বিচার করা আমার কাছে উচিত বলে মনে হচ্ছে না। বরং এটা জিজ্ঞেস করছ না কেন যে কত নিরপরাধ লোকের প্রাণ গেল এতে!'

শায়েস্তা দৃঢ়কণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করল, 'কজন মুসলমান মরেছে বল।'

'সরকারী মতে সাত। আমার বিশ্বাস, সংখ্যাটা কুড়ি ছাড়িয়ে যাবে।'

'আর নীচের বাজারের মসজিদটাও পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে ?'

'এ-খবর কিছু মুসলিম কাগজে অতিরঞ্জিত করে পরিবেশন করা হয়েছে। মসজিদের ওপর আক্রমণ হয়েছিল ঠিকই, পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টাও হয়েছিল, কিন্তু সে কাজে সফল হয়নি তারা।'

'মিথ্যে বলছ তুমি !'

'তুমি নীচের বাজারে গিয়ে নিজের চোখে দেখে আসতে পার, মসজিদ অক্ষত অবস্থায় রয়েছে।'

'এই দাঙ্গায় কতজন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ?'

'পনেরো জন।'

'আর কতজন মুসলমানকে ?'

'ষাটের ওপর।'

'ঠিকই তো, মুসলমানরা গুণ্ডা, বদমাশ, দাঙ্গাবাজ ! আর তোমাদের জাতটা তো নির্ভেজাল অহিংসার পূজারী !' শায়েস্তা দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'সেজন্যেই হিন্দুদের বলপ্রয়োগ সত্ত্বেও মুসলমানদেরই বেশি গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

কমল বলল, 'স্বীকার করছি, সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ধর্মের গোঁড়ামি রয়েছে, প্রশাসনের মধ্যেও সেটা না থেকে পারে না। এ বিষ অনেক পুরনো। মানুষকে এই বিষ থেকে মুক্ত করতে অনেক সময় লাগবে।'

'তোমায় ঘেন্না করি আমি।' শায়েস্তা চিৎকার করে বলে উঠল, 'তোমাদের সমস্ত হিন্দুকেই ঘেন্না করি। তোমাদের পুরো জাতটাকেই ঘেন্না করি। জানিনে তোমার প্রতারণার ফাঁদে কী করে পা দিয়েছিলুম আমি! ভালোই হয়েছে, পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে। নইলে তোমরা সমস্ত মুসলমানকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে। এখন আমার চোখ থেকে পর্দা সরে গেছে। আমি এখন আর তোমায় কিছুতেই বিয়ে করব না।'

কমল জিজ্ঞেস করল, 'পাপ করল অন্যরা, আমি তার শাস্তি ভোগ করব ?'

'তুমিই হচ্ছ সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক। ওপরে একজন খাঁটি উন্নত মানসিকতার পোশাক পরে আছ, নইলে ভেতরে ভেতরে তুমিও সেই একই—তোমার অন্যান্য ভাই-বন্ধুদের মতোই। তোমার আর উমেশ সাকসেনার মধ্যে ওপরের ওই আবরণটুকুই পার্থক্য শুধু।'

'আমি সেই ঘটনার পরই উমেশ সাকসেনাকে আমার বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছি।'

'আসলে সেটা আমার কাছে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যেই। এসবই চালবাজি ছাড়া আর কিছু না। নইলে ভেতরে ভেতরে তুমিও তো এক ধরনের উমেশ সাকসেনা।'

'কিভাবে ?'

'ইলেকশনের জন্যে তুমি নিজে উমেশ সাকসেনাকে টাকা দাওনি ? কথাটা

'অস্বীকার করতে পারবে তুমি ?'

'প্রথম দিকে দিয়েছিলাম।'

'তাহলে প্রথম দিকে তুমি তার মন-মেজাজ সম্বন্ধে জানতে না কিছু—বল ?'

'কিছু কিছু সন্দেহ যে ছিল না, তা নয়। কিন্তু আমি তাকে এতখানি সংকীর্ণ এবং দুষ্কৃতকারী বলে ভাবিনি। তা ছাড়া সে ছিল আমার ভাই।'

'গল্প ফেঁদো না।' শায়েস্তা ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠল, 'এই দাঙ্গা আমার চোখ খুলে দিয়েছে। তোমরা হিন্দুরা তো নিজেদের মেয়েটাকে কাশীপুর পাঠিয়ে দিলে, যাতে কুমার মরাতব আলির সঙ্গে তার বিয়ে না হয়। কিন্তু তুমি নিজে এক উচ্চ সম্ভ্রান্ত বংশের একটি মুসলমান মেয়েকে নিজেদের সামাজিক আচার-ব্যবহারে আত্মসাৎ করতে চাও ? এই ওয়ান-ওয়ে ট্রাফিক চলতে পারে না। এখন মুসলমানদের চোখ খুলে গেছে।'

কমল গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'প্রথমত, আমি সারা পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানকে এক জাতি বলে মনে করি না। মুসলমানদের মধ্যে নানা সম্প্রদায় রয়েছে। একই অবস্থা হিন্দুদেরও। ফিজি দ্বীপপুঞ্জের হিন্দু সম্প্রদায়ের মতাবলম্বী ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসীরা, নেপালের হিন্দু সম্প্রদায়ের মতাবলম্বী নেপালীরা। ভারতীয়রা নয়। পাকিস্তানেও এক সম্প্রদায়ের লোকই বাস করে না। সেখানে পাঠান, বালুচী, সিন্ধী, পাঞ্জাবী, বাঙালী রয়েছে। পাকিস্তান তৈরি হলেও এই সব ছোটখাটো ধর্মীয় রীতিনীতির একটি প্রশ্নেরও মীমাংসা হয়নি। বলতে গেলে, পাকিস্তান ক্ষুদ্র-বৃহৎ একটা ভারতবর্ষের মতোই। সেখানে নানা বর্ণ-সম্প্রদায়ের বসবাস। তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা, ভৌগলিক সীমারেখা রয়েছে। তাদের জীবনযাপনের মানও বিভিন্ন রকমের। ভবিষ্যতের নবচেতনার বিশ্বাসে তাদের সবাইকে একলাঠি দিয়ে তাড়ানো ঠিক নয়।'

'আমি ভবিষ্যতের কথা বলছিনে।' শায়েস্তা চিৎকার করে বলে উঠল, 'আমি আজকের কথা বলছি। তোমার লেকচার শুনতে চাইনে। তোমার কথা আমার অনুভূতির সঙ্গে মেলে না। যাও, সব শেষ হয়ে গেছে। গেট আউট।'

কমল অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। মেঝের দিকে দৃষ্টি-নিবদ্ধ করে বসে রইল সে। পিঁপড়ের এক লম্বা সারি ইজেল থেকে মোড় নিয়ে তার জুতোর দিকে আসছিল। জুতো-জোড়াকে চারদিক দিয়ে ঘিরে নেওয়ার পর পিঁপড়ের একটা সারি তার পাতলুন শুঁকল, তারপর পাতলুনের ওপর উঠতে শুরু করল। কমল পাথরের মতো নিশ্চল বসে পিঁপড়েগুলোকে দেখতে থাকল। আহ্, যদি এখন একলক্ষ পিঁপড়ে তাকে চারদিকে ঘিরে নিয়ে দংশন করত! কিন্তু এই একলক্ষ পিঁপড়ের দংশনের চেয়েও কমলকে অধিকতর পীড়া দিচ্ছিল সেই দংশন, যা ছিল শায়েস্তার কণ্ঠস্বরে প্রচ্ছন্ন।

হঠাৎ শায়েস্তা চিৎকার করে উঠল, 'তোমার পাতলুনের মধ্যে পিঁপড়ে ঢুকছে। ঝেড়ে ফেল, ঝেড়ে ফেল।'

কমল চমকে উঠল। সে পাতলুন ওপরে তুলে পিঁপড়ে ঝাড়তে শুরু করল শায়েস্তা লক্ষ্য করল তার গোড়ালির ওপরে পায়ের গোছার অর্ধেকটায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। বিহ্বলকণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে ওখানে?'

কমল নিরুত্তাপ গলায় বলল, 'কিছু বন্ধু-বান্ধবকে সঙ্গে নিয়ে মসজিদটাকে রক্ষা করতে গিয়েছিলাম। দাঙ্গাবাজদের একজন আমার মাথায় লাঠির বাড়ি মারতে এসেছিল। প্রথম আঘাতটা সামলে নিয়েছিলাম, দ্বিতীয় আঘাতটা কিন্তু পায়ে এসে পড়েছিল। তবে চোট খুব বেশি নয়।'

শায়েস্তা তক্ষুণি উঠে এসে কমলের কাছে মেঝেয় বসে পড়ল। ব্যাণ্ডেজে আঙুল দিয়ে বলল, 'দেখি, তোমার ঘা।'

'এখন আমার আর কোন্ কোন্ ঘা দেখবে শায়েস্তা?' কমলের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এল।

অভিভূতের মতো শায়েস্তা তার গাল রাখল কমলের পাতলুনের ওপর। চুপচাপ কাঁদতে থাকল সে। ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে বলল, 'আমায় ক্ষমা করো।'

কমলের চোখের পাতা ভিজে। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'এতে তোমার কী দোষ শায়েস্তা? এক ভ্রান্ত পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছি আমরা। এক ভ্রান্ত সমাজব্যবস্থায় জন্ম আমাদের।'

সে শায়েস্তাকে মেঝে থেকে উঠিয়ে নিজের কাছে বসাল।

পনের

পেছনের ডুলিতে আসবাবপত্র বোঝাই। আর সেই ইংরেজ মহিলাটি গঙ্গারামের ঘোড়ার ওপর চড়ে। চারদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করেই চলেছে সে। চিন্তামগ্ন চেহারা। ঘাড় থেকে ছাঁটা চুল হাওয়ায় উড়ছে। চোখের ওপর চুল এসে পড়লে হাত দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে মাঝে মাঝে। গঙ্গারাম আড়চোখে বারবার তাকিয়ে দেখছে ওকে। তার মনে হচ্ছিল, মেয়েটি ভেতরে ভেতরে নিজের সঙ্গে লড়াই করছে। সৌন্দর্য ছাড়াও তার চেহারায় রয়েছে বিরক্তি আর ভয়। কে জানে মেয়েটি কে! কোথা থেকে আসছে! মাঝে মাঝে আপনার মনেই কী রকম রাগে বিড়বিড় করছে! তার ঠোঁট-কামড়ানো শক্ত মুখ দেখে গঙ্গারামের ভয় করছিল। নিজের মনে মেয়েটিকে একেবারেই পছন্দ করছিল না সে। বলতে কী, পরিষ্কার ঝকঝকে চেহারা, প্রশস্ত ললাট, গোল মুখের গড়ন, বড় বড় চোখ, দীর্ঘ চক্ষুপল্লব, তা সত্ত্বেও কী জানি কেন, তার চেহারার মধ্যে এমন কিছু ছিল, যেজন্যে তার ওপর বিতৃষ্ণা বোধ করছিল গঙ্গারাম।

'রাজদূত হোটেলটা এখান থেকে কত দূর?' ইংরেজ মহিলাটি হঠাৎ প্রশ্ন করল।

গঙ্গারাম চমকে উঠল। মেয়েটি কিন্তু চমকে ওঠার মতো কোন কথা বলেনি,

তবু গঙ্গারাম চমকে উঠল। কারণ সারাটা পথ মেয়েটি গঙ্গারামের সঙ্গে কোন কথাই বলেনি। মেয়েটি ইংরেজ হওয়া সত্ত্বেও তার কথা খুব পরিষ্কার। আজ পর্যন্ত গঙ্গারাম কোন বিদেশী মেয়েকে এমন পরিষ্কার হিন্দুস্তানী বলতে শোনেনি। মনে হচ্ছে, অনেক বছর ধরেই এদেশে বাস করছে সে।

গঙ্গারাম বলল, 'তিনটে চড়াই ভাঙলে সেই হোটেলে পৌছনো যাবে। মানে, প্রথমে নৈনিতাল ক্লাব পড়বে, তারপর সুইস হোটেল, তারপর এক দীর্ঘ চড়াই ভেঙে উঠলে সেণ্ট ক্যাসল, তার ওপরে আর-একটা দীর্ঘ চড়াই পেরিয়ে রাজদূত পড়বে।'

রাজদূত হোটেল নৈনিতালের মধ্যে সবচেয়ে নতুন হোটেল। চারদিক দেবদারুর জঙ্গলে ঘেরা। নীচে নৈনিতালের সমতলভূমি থেকে সেটা নজরে পড়ে না। সাধারণত অভিজাত বিদেশী ট্যুরিস্ট কিংবা এদেশের ধনী অভিজাতরাই সেখানে ঠাঁই নেয়। হোটেলটায় যেমন যথেষ্ট আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা রয়েছে, তেমনি তা যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য। তার এমনি মর্যাদা ও আভিজাত্য রয়েছে যে, আমি-তুমি তো দূরের কথা, অনেক উঁচু থেকে উঁচুদরের লোককেও সে যখন 'আসুন' বলে অভ্যর্থনা জানায়, তখন তাকে নিজের দিকে একটু চেয়ে, নিজের পকেটের দিকে একটু লক্ষ্য রেখে হোটেলে পা রাখতে হয়।

নৈনিতাল ক্লাব পার হল। সেক্রেটারিয়েটের চড়াই ভেঙে গঙ্গারামের শ্বাসপ্রশ্বাস যখন তার ঘোড়ার শ্বাসপ্রশ্বাসের মতোই হাপরের মতো উঠছিল পড়ছিল, তখন ইংরেজ মেয়েটি আবার জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি জান কমল সাকসেনা সাহেব কোন্ বাংলোয় থাকে?'

গঙ্গারাম আবার চমকে উঠল। প্রথমবারের চেয়ে বেশিই চমকাতে হল তাকে। অবশ্যি দেখতে গেলে প্রশ্নটা নেহাতই সাধারণ। কিন্তু প্রশ্নটা করার সময় মেয়েটির কণ্ঠস্বর এমন তিক্ত শোনাল যে, গঙ্গারাম চুপচাপ মেয়েটিকে দেখতে লাগল। সে-সময় মেয়েটির চেহারায় যেন তার সমস্ত সৌন্দর্য উবে গেছে।

হতবুদ্ধি হয়ে তাকে নিজের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে মেয়েটি আবার জিজ্ঞেস করল, 'আমার কথাটার জবাব দিচ্ছ না যে?'

মেয়েটির এই দ্বিতীয় প্রশ্নে গঙ্গারামের হুঁশ হল। আচমকা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'আমি জানিনে মেম সাব।'

মেয়েটি আর কোন প্রশ্ন করল না। রাজদূত হোটেলের নিকটে পৌছে মেয়েটি ডুলি আর ঘোড়ার পয়সা মিটিয়ে দিল। তারপর সে হোটেলের দিকে পা বাড়াতেই ভেতরের লাউঞ্জ থেকে একটি লোক সহাস্য-মুখে হাত নাড়তে নাড়তে তার দিকে এগিয়ে এল। গঙ্গারাম চিনতে পারল তাকে। লোকটি কমলবাবুর সেই আত্মীয়—উমেশ সাকসেনা। গভীর আনন্দে উমেশ ইংরেজ মেয়েটির সঙ্গে করমর্দন করল। তারপর তারা কথা বলতে বলতে লাউঞ্জের মধ্যে চলে গেল।

উমেশবাবু এখানে কেন এসেছেন? এই ইংরেজ মেয়েটিই বা কে? কমলবাবুর

বাসার খোঁজ-খবরও করছিল সে! গঙ্গারামের মনে অনেক প্রশ্নই দেখা দিল। উমেশবাবুর সঙ্গে এই ইংরেজ মেয়েটির সম্পর্কই বা কী? দেখে মনে হল, মেয়েটির জন্যে উমেশবাবু আগে থেকেই প্রতীক্ষা করছিল। তাকে আসতে দেখেই সে বাইরে বেরিয়ে এল। এসবের রহস্য কী?

রাজদূত হোটেল একতলা। তার কারুকার্যখচিত লাউঞ্জে দুটি বড় বড় জানালা। জানালা দিয়ে বিস্তীর্ণ দিক্‌চক্রবাল নজরে পড়ে। দুটি জানালার বাইরেই ছাদ-ঢাকা বারান্দা। সামনে বাগান। হোটেলের পেছনে সুইমিং পুল। সুইমিং পুলের পেছনে উঁচু পাহাড় থেকে বয়ে-আসা একটি নালা। সেই নালার জলই সুইমিং পুলে ব্যবহার করা হয়। পাহাড়ের ওপর ঘন দেবদারুর জঙ্গল। নৈনি-তালের সমভূমি থেকে যে রাস্তাটা পিচ-ঢালা রাস্তাগুলোর ওপর দিয়ে রাজদূত হোটেল পর্যন্ত এসেছে, সেটা হোটেলের কাছে পৌঁছেই ভীষণ বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। গভীর খাদ আর নালার ওপর দিয়ে চলে গেছে। গভীর নালাগুলোর মাঝখান দিয়ে সেই নালাটি একটি সাদা ফিতের মত ঘুরতে ঘুরতে চলে গেছে বলে মনে হয়।

পয়সা নিয়ে গঙ্গারাম তখনো হোটেলের পোর্চের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। সে দেখল উমেশ সাকসেনা এবং মেয়েটি লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে ডানদিকের করিডর হয়ে একটি কামরার দিকে চলেছে। যখন দুজনেই কামরার মধ্যে ঢুকল, তখন সে ঘোড়ার লাগামটা ধরে এগিয়ে গেল কামরাটার দিকে। কামরার নম্বর পড়ল—একশো এগারো। তারপর সে যেন কিছু ভাবতে ভাবতে ঘোড়াটাকে নিয়ে হোটে-লের পেছনে গেল। একটি খুবানি গাছের গোড়ায় ঘোড়াটাকে বেঁধে দিয়ে সে গেল একশো এগারো নম্বর কামরার জানালার কাছে। কিন্তু বড় সাবধানে।

জানালা বন্ধ। তার ওপর ভেতর দিকে পর্দা টাঙানো। কিন্তু পর্দাটা ঠিকমত টাঙানো নয়। সে বন্ধ জানালার একটি ফাঁক দিয়ে ভেতরে তাকাল। একটি সোফায় মেয়েটি গা এলিয়ে দিয়েছে। বড় পরিশ্রান্ত মনে হল তাকে। উমেশ একটি সিগারেট দিল ওকে। একটি নিজে ধরাল। তারপর পায়চারি করতে করতে কী যেন বলতে শুরু করল। তার কথাবার্তা শুনতে শুনতে মেয়েটির মুখের ক্লান্তি রুক্ষতা কেটে গেল, দেখা দিল একটা খুশির ভাব।

কিন্তু উমেশের মুখ চোখের ভাব ভয়ংকর ও বিপজ্জনক বলে মনে হল গঙ্গা-রামের। ভয়ে শিউরে উঠল তার মন। যদিও সে তাদের কথাবার্তা কিছু শুনতে পাচ্ছিল না, তবু তার মনে হচ্ছিল, কামরার মধ্যে যেসব কথাবার্তা চলছে, তা আদৌ মঙ্গলজনক নয়। তার ওপর সেসব কথাবার্তা কমলবাবু সম্পর্কেই, তা সে যাই হোক না কেন।

সেখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা উচিত বলে মনে করল না সে। মনের মধ্যে একটা সন্দেহ নিয়েই সে ফিরে গেল।

কামরার মধ্যে উমেশ সাকসেনা বলছিল, 'অনেক কষ্টেই আমি তোমার লণ্ডনের ঠিকানা যোগাড় করে চিঠি দিয়েছিলাম।'

মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, 'আমার নৈনিতাল আসার কথাটা কমলবাবু জানে?'

'সেটা জানার তার ফুরসত কোথায়!'

'আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'এখন না। তুমি ওর সঙ্গে দেখা করবে, কিন্তু যেভাবে বলব, সেইভাবে।'

'আজ তো আমি খুবই ক্লান্ত। লণ্ডন থেকে এ-পর্যন্ত যাত্রাটা ভীষণ ক্লান্তিকর।'

এমন সময় বেয়ারা ট্রে-তে করে দু গেলাস হুইস্কি এনে টিপয়ে রেখে চলে গেল।

উমেশ হুইস্কিতে সোডা মিশিয়ে একটি গেলাস তুলে দিল মেয়েটির হাতে। অন্যটি নিজের হাতে তুলে নিয়ে মেয়েটির পাত্রের সঙ্গে নিজের পাত্র ছোঁয়াল। বলল, 'তোমার সাফল্যকামনায়।'

মেয়েটিও বলল, 'আমাদের সাফল্যকামনায়।' তারপর সে একচুমুকেই আধ গেলাস সাবাড় করে ফেলল।

এখন তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, ঠোঁটে এক অদ্ভুত হাসি ফুটছে। সে হাসির সঙ্গে উমেশের হাসির সাদৃশ্য ছিল।

'আমার ধারণা ছিল না যে কমল এত বড়লোক।'

'ও বেশ বড়লোক।'

'তোমার কি মনে হয়, আমাদের প্ল্যান সফল হবে?'

'সফল হওয়া সম্পর্কে আমার ষোল আনা বিশ্বাস আছে? কিন্তু আমি যে রকম ভেবেছি, সেইরকমই করতে হবে তোমায়।'

'কিচ্ছু ভেবো না তুমি। যা ভেবেছ, তাই হবে। তুমি যা বলবে, ঠিক সেই-ভাবেই কাজ করব আমি।'

'যখন সে তোমার সামনা-সামনি হবে, তখন তার চেহারাটা যা হবে না, দেখার মতো।' সে দৃশ্যটা কল্পনা করতে করতে উমেশের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

মেয়েটি জোরে হাসতে হাসতে বলল, 'আরও এক পেগ আনাও। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি।'

'দুদিন বিশ্রাম করে নাও। সম্পূর্ণ বিশ্রাম। বাইরে বেরনোর দরকার নেই। আজ আঠাশ তারিখ। একত্রিশ তারিখের সন্ধ্যেয় দেখা হবে।'

'দুদিন ধরে এই কামরায় পড়ে থাকতে থাকতে তো একঘেয়েমি ধরে যাবে আমার।' দুর্ভাবনায় মেয়েটির মুখ হাঁ হয়ে গেল।

উমেশ আশ্বাস দিয়ে বলল, 'ভেবো না। আমি রোজই আসব। তা ছাড়া সন্ধ্যের পর ওপরের জঙ্গল থেকে বেড়িয়ে আসতে পার। বাস, মাত্র দুদিনের ব্যাপার। একত্রিশ তারিখে ক্লাবে বেশ বড় পার্টি রয়েছে। নাচও হবে। অতএব সুযোগটা চমৎকার।'

একত্রিশ তারিখের সন্ধ্যে।

ক্লাবের হলঘর থেকে চেয়ারগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কাঠের মেঝের ওপর নাচ চলছে। ষাট-সত্তরটি যুগলমূর্তি একসঙ্গে নাচছে। নতুন নতুন সাজসজ্জায় সেজেগুজে এখনো অনেকে এসে নাচে যোগদান করছে। এটা হচ্ছে ক্লাবের অ্যানুয়াল বল। আজ রাত যেমন ক্রমশ গভীর হবে, তেমনি ভিড় বাড়তে থাকবে। আলোর বন্যা বইতে থাকবে। ঘরের পরিসর সংকীর্ণ হয়ে আসবে। চোখের উজ্জ্বলতা বাড়বে। শ্বাসপ্রশ্বাস তীব্র হয়ে উঠবে। আজকের রাতে কিছু নতুন রোমান্সের জন্ম হবে, কিছু পুরনো প্রেমের মৃত্যু ঘটবে।

শায়েস্তা আজ খুব যত্ন করে কেশবিন্যাস করেছে। চুনির হায়দ্রাবাদী কানের দুল কাঁধ পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। পরনে হালকা বেগুনী রঙের লেসের জামা আর ওই রঙেরই ব্রোকেডের পায়জামা। তার ওপর জরির চুমকি বসানো। কমল আর শায়েস্তা যখন নাচছিল, তখন শায়েস্তার ঢিলে পায়জামা তার পায়ের চারদিকে গোল হয়ে ঘুরে-ঘুরে কমলের পা-কে ঘিরে ধরছিল। পরস্পরের চোখের মধ্যে তারা যেন ডুবে যাচ্ছিল। ভালোবাসার মাদকতায় নিজেদের হারিয়ে ফেলে মেঝে ছাড়িয়ে ওপরে শূন্যে যেন নাচছিল তারা। একজন অন্যের ভারটুকুও অনুভব করছিল না। ওদের দুজনের জন্যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তিও যেন লুপ্ত হয়েছে। দীর্ঘায়ত ভালোবাসায় কয়েকটি মুহূর্ত ঠিক এমনিই এসে থাকে। কমল ভাবছিল, যারা ভালোবাসে, তারা পরস্পরের আকর্ষণে হারিয়ে যেতে যেতে মাটির আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। নাচের ভিড়ের মধ্যে কেবল নিজেকে আর তাকে ছাড়া আর কাউকে চোখে পড়ে না।

হঠাৎ ব্যাণ্ড এক জোর ঝংকার তুলে নীরব হয়ে গেল। যুগল মূর্তিদের একজন আরেকজন থেকে পৃথক হয়ে ব্যাণ্ডের জন্যে হাততালি দিতে শুরু করল। কমল শায়েস্তাকে ভিড় থেকে বার করে দেওয়াল-সংলগ্ন চেয়ারগুলোর দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় সবাই দেখল যে এক অপূর্ব সুন্দরী ইংরেজ মহিলা চমৎকার গাউন পরে উমেশ সাকসেনার সঙ্গে দরজা দিয়ে ঢুকছে। মেয়েটি এগিয়ে গিয়ে দুহাত বাড়িয়ে কমলের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'হ্যালো মাই ডার্লিং, শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেয়েছি তোমায়।'

কথাটা বলেই মেয়েটি কমলের গালে আদর করল।

শায়েস্তা একেবারে হতভম্ব। কমলের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে সে জিজ্ঞেস করল, 'ও কে?'

কমল হয়তো কোন জবাব দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই মেয়েটি বলল, 'আমি জুলি সাকসেনা। কমল সাকসেনার স্ত্রী।'

জুলি তখন কমলের গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে। ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমানের গলায় সে কমলকে বলল, 'কেন ডার্লিং, তুমি আমায় চিঠি লিখেও জানাওনি যে

তুমি নৈনিতালে রয়েছ!'

শায়েস্তা অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে কমলের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল 'ও কি তোমার স্ত্রী?'

'হ্যাঁ, ছিল একসময়।' কমলের কণ্ঠ থেকে কথাটা উচ্চারিত হল।

'ছিলাম কী! এখনো জলজ্যান্ত রয়েছি। কোন সন্দেহ নেই। তুমি আমার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ করনি। —ইনি আমায় কিছু না জানিয়ে লণ্ডন থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু আমি আমার প্রিয় স্বামীকে ছেড়ে থাকব কী করে!' জুলি কমলের ঘাড়ে আঙুল বোলাতে লাগল।

শায়েস্তা বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে কখনো জুলির দিকে, কখনো বা কমলের দিকে চেয়ে দেখছিল। কমল তার হাত ধরে বলল 'এখানে নয়। আমার সঙ্গে চল তুমি। একা তোমায় আমি সবকিছু খুলে বলব।'

শায়েস্তা রাগে এক ঝটকায় নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'কিছুই বলার দরকার নেই। সব বুঝেছি আমি।'

ইতিমধ্যে অনেক লোক তাদের চারপাশে জড়ো হয়েছে। অনেক যুগলমূর্তি নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে এই নাটক দেখছে। শায়েস্তা তার ঢিলে পায়জামা সামলাতে সামলাতে জোরে জোরে পা ফেলে ভিড় পার হয়ে, চোখের জল চাপতে চাপতে হলঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। ক্লাবের বাইরে গিয়ে একটা ডুলিতে চেপে কয়েক মিনিটের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

কমল তার পেছনে সমানে চিৎকার করতেই থাকল, 'শায়েস্তা, শোন। শোন শায়েস্তা। শায়েস্তা—'

কিন্তু তখন শায়েস্তার চোখে এতই অশ্রু ছাপিয়ে উঠেছে এবং তার কানের মধ্যে এমন কোলাহল শুরু হয়েছে যে সে কিছু শুনতেও পাচ্ছিল না, দেখতেও পাচ্ছিল না। তার বুক তখন অবরুদ্ধ কান্নায় পরিপূর্ণ।

ক্লাবের হলঘরে সবার থেকে দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উমেশ দৃশ্যটি উপভোগ করছিল।

কমল ক্লাবের দরজা থেকে ফিরে এল। মাথা নীচু করে জোরে জোরে পা ফেলে হলের মধ্যে যেতে যেতে সে ভাবছিল, 'দু মিনিটের মধ্যে এসব কী ঘটে গেল!' তার মাথা কোন কাজ করছিল না।

ভেতরে আসতেই জুলি কমলকে জড়িয়ে ধরল। ব্যাণ্ডে তখন নাচের বাজনা আবার শুরু হয়েছে। কমল বলল, 'আমার ইচ্ছে করছে না।'

'কিন্তু আমার ইচ্ছে করছে।' জুলি বলল, 'কত বছর পরে আজ কমলের সঙ্গে নাচব!'

কমল তার সঙ্গে নাচতে শুরু করল। সে চাইছিল না যাতে জুলি সকলের সামনে বড় রকমের কোন একটা গোলমাল বাধায়। ইতিমধ্যেই যা ঘটে গেছে, সেটা যথেষ্ট বিপদসীমা লঙ্ঘন করেছে। তাই সে ব্যাণ্ডের বাজনার তালে তালে জুলির

সঙ্গে নাচতে লাগল। তার পা ব্যাণ্ডের বাজনার গৎ-তাল-সমে ঠিক ঠিক পড়ছিল। পোশাক-আশাক ঠিক রাখল, চেহারাতেও মনের চিন্তা-ভাবনার কোন প্রকাশ ঘটতে দিল না, জুলিকেও ঠিকমতো আলিঙ্গনাবদ্ধ করে রাখল।

সব ঠিক রয়েছে। কিন্তু তার মনে হতে লাগল, যেন একটা পাথর—একটা পাথরের সঙ্গেই নাচছে সে।

'যেন একটা পাথর—একটা পাথরের সঙ্গেই নাচছি।' মনে মনে বার বার কথাটার পুনরাবৃত্তি করল সে। পুনরাবৃত্তি করতেই থাকল, যাতে অন্য কোন চিন্তা তার মনের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে। এখন সবচেয়ে জরুরী, সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ, শায়েস্তার সঙ্গে কথা বলা। কিন্তু শায়েস্তার সঙ্গে কথা বলার আগেও জরুরী হয়ে পড়েছে, জুলির মনের কথা জেনে নেওয়া। জানা দরকার এখানে সে কেন এসেছে। এত বছর পরে সে কমলের পেছনে ধাওয়া করছে কেন? তার মনে কী উদ্দেশ্য রয়েছে? এখানকার ঠিকানাই-বা সে পেল কী করে?

নাচতে নাচতে সে জুলিকে হলের বাইরে নিয়ে গেল। কার্ড-রুমের সামনে দিয়ে গিয়ে ডাইনিং হলের কেবিনগুলোকে পেছনে রেখে সে জুলিকে লোহার রেলিং-টার কাছে নিয়ে এল। সেখান থেকে ঝিলের খোলামেলা পরিষ্কার দৃশ্য চোখে পড়ে।

যাত্রী-বোঝাই নৌকোগুলি মল্লিতাল ও তল্লিতালের মধ্যে যাওয়া-আসা করছে। ক্যামেরা, খলখল হাসি, চুম্বন, বর্ণাঢ্য পোশাক-পরিচ্ছদ, চোখের বিদ্যুৎ-চমক, আলিঙ্গন। দাঁড়ের ছপছপ শব্দ, জলের ওপর পাকসাট-খেয়ে-যাওয়া সাদা মেঘের মতো পাল-তোলা নৌকো। ঝিলের ওপর ঝুঁকে-পড়া বেদমজনু গাছগুলি, জলের ঢেউয়ে আন্দোলিত তাদের কোমল শাখা-প্রশাখার পত্ররাশি, তীরে আছড়ে পড়া জলের ছলছল শব্দ। …এখন সব শেষ। সব শেষ হয়ে গেছে এখন। একটা হেঁচকি উঠে কমলের গলার কাছে এসে আটকে গেল যেন।

অনেক কষ্টে সে বলল, 'চল জুলি, তোমায় নৌকো করে বেড়িয়ে আনি।'

জুলি তার বাহুপাশে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়েই রইল।

ষোল

ওরা দুজন নৌকোয় বসেছিল। তবে পাশাপাশি নয়, সামনে-পেছনে। জুলিও এ ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখায় নি। কারণ সে জানত, এখন আসল কথাবার্তা শুরু হবে।

তাদের চারদিকে ঝিলের জল। নৌকোয় ওরা শুধু দুজন। কমল মাঝিকে বলেছিল, সে নিজেই নৌকো চালিয়ে নিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসবে।

সে ধীরে ধীরে নৌকো বাইছিল। কিছুক্ষণ পর কথাবার্তা শুরু করল। জিজ্ঞেস করল, 'এখন বল, এখানে এসেছ কেন?'

জুলি পালটা প্রশ্ন করল, 'কেন, তুমি কি আমার স্বামী নও ?'

'সেটা আইনের দিক দিয়ে দেখতে গেলে সত্যি। নইলে তুমি এবং আমি পৃথক অবস্থাতেই বেশ কয়েক বছর কাটিয়েছি।'

'তাতে আমার অপরাধ কী ? তুমি লণ্ডনের সেই ফ্ল্যাটে ঘুমন্ত অবস্থায় আমায় ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলে।'

'কারণটাও তুমি নিশ্চয়ই জান ?'

'না।'

'মিথ্যে কথা ! সেই রাত্রিতে তুমি আমার বাড়িতে ফিরে এসেছিলে সাতদিন পরে। সাতদিন ধরে তুমি প্যারিসে তোমার বন্ধুদের সঙ্গে তামাশা উড়িয়ে বেড়াচ্ছিলে। আর সেই সাতদিনের প্রতিটি দিন প্রতিটি রাত্রি আমি তোমার জন্যে প্রতীক্ষা করেছি। তোমার জন্যেই আমি আমার দিল্লীর বাড়ি ত্যাগ করেছিলাম, নিজের মা-বাবাকে ত্যাগ করেছিলাম, নিজের বন্ধু-বান্ধবকে ত্যাগ করেছিলাম। সব কিছু ত্যাগ করে তোমার জন্যেই ভারত থেকে ইংলণ্ড গিয়েছিলাম। যাতে তুমি খুশি হও। আর আজ তুমিই কি না আমায় প্রশ্ন করছ, সেই রাত্রে তোমায় ঘুমন্ত অবস্থায় ফেলে রেখে পালিয়ে এসেছিলাম কেন ? পালিয়ে এসেছিলাম তার কারণ, তোমার মুখ আর দেখতে চাইনি আমি। হঠাৎ আমি উপলব্ধি করেছিলাম, তোমার আমার মধ্যে সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। কোথাও কোন পথ আর খোলা নেই। কোথাও কোন মাধুর্য নেই, প্রীতির কণামাত্রও নেই। তোমায় দেখে শূন্যে আর সেই মধুর স্বপ্নের রঙীন আঁচল পতপত করে ওড়ে না। সুন্দরী মেয়ে তুমি। ঝকঝকে উজ্জ্বল হীরের মতো সুন্দর, হীরের মতোই কঠিন।'

'তুমি আমার প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের যে অপবাদ দিচ্ছ, তোমার কাছে তার কি কোন প্রমাণ আছে ?'

'যে রাতে তুমি আমার বিছানায় অগাধ ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছিলে, সেই রাতে আমি তোমার স্যুটকেস হাঁটকেছিলাম। স্যুটকেসের মধ্যেই সেই ছবিগুলো পেয়েছিলাম, যেগুলি তোমার বিশ্বাসভঙ্গের প্রমাণ। সতর্কতার জন্যেই ছবিগুলো নিয়ে এসেছিলাম সঙ্গে করে।'

'আমার স্যুটকেস হাঁটকানোর কোন অধিকার ছিল না তোমার...' রাগে উত্তেজিত হয়ে জুলি বলল, 'তোমার বেশ জানা আছে যে আমাদের ইউরোপীয় সভ্যতা তোমাদের সভ্যতা থেকে আলাদা। আমাদের ওখানে, বিশেষত আজকাল, মেয়েরা যথেষ্ট স্বাধীনতা লাভ করেছে। আর এই স্বাধীনতার পূর্বেও আমাদের ওখানে নারীপুরুষের চুম্বন বিশ্বাসভঙ্গের কারণ বলে মনে করা হত না। ওটা যথার্থই একটি সাধারণ সামাজিক প্রথা। তোমার কাছে সেই ছবিগুলোই রয়েছে না ?'

কমল রুক্ষকণ্ঠে বলল, 'আমি অতো সংকীর্ণ নই, তুমি জান। কিন্তু পার্টিতে কতখানি নগ্ন হওয়া যায়, ছবিগুলোই তার প্রমাণ দেবে।'

'ওই ছবিগুলোর ভিত্তিতে তুমি বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুমোদন পেতে পার না। কোন সভ্য আদালতই এই বিবাহ-বিচ্ছেদ সমর্থন করবে না।'

'তুমি কী চাও ?'

'আমি তোমার সঙ্গে থাকতে চাই।'

'ভারতে ?'

'হ্যাঁ, ভারতে।'

'কেন ? তোমার তো লণ্ডন পছন্দ ?'

জুলির চেহারায় নানা রঙের খেলা শুরু হল। শেষে বলল, 'তাছাড়া, আমি আবার খোঁড়া হয়ে গেছি।'

কমল এটা আদৌ চিন্তা করে নি। তাই জুলির উত্তরে তার মুখের ওপর এক বিস্ময়ের ঢেউ খেলে গেল।

জুলি বলল, 'তুমি হয়তো আদৌ চিন্তা করনি ব্যাপারটা। কারণ, খুব সামান্যই খোঁড়া-ভাবটা ছিল, আর সেখান থেকেই শুরু। পায়ের গোড়ালিতে, যেখানটায় তুমি নতুন পদ্ধতিতে প্লাস্টিক সার্জারি করেছিলে, সেখানে একটু একটু ব্যথা ছিল। কিন্তু ব্যথাটা কখনো কখনো এমন প্রচণ্ড হয়ে ওঠে যে বলে বোঝানো যায় না! আমি ইংলণ্ডের কয়েকজন ডাক্তারকে দেখিয়েছি। তাঁরা বলেছেন, কয়েক মাসের মধ্যেই তোমার পা সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যাবে। আমি এর একটা ব্যবস্থা করতে বলেছিলাম। উত্তরে তাঁরা বললেন, যে-ডাক্তার তোমার গোড়ালি অপারেশন করে নকল হাড় বসিয়েছিলেন, একমাত্র তাঁকে দিয়েই আবার অপারেশন করাতে হবে তোমায়। সেজন্যে খুঁজতে খুঁজতে এখানে তোমার কাছে এসে পৌঁছেছি।'

'আবার অপারেশনের জন্যে ?'

'হ্যাঁ। তাছাড়া তোমার কাছে থাকব বলেও।'

'সেটা সম্ভব নয়।'

'কী সম্ভব নয় ?'

'প্রথমত, দ্বিতীয়বার অপারেশন চলবে না তোমার পায়ে। চিকিৎসাশাস্ত্র অনুযায়ী নকল হাড় বড় জোর তিন বছর কর্মক্ষম থাকতে পারে। তুমি তো চার বছর চালিয়ে নিয়েছ। তাই নকল হাড় এখন জবাব দিচ্ছে। কয়েক মাসের মধ্যেই তুমি আগের মতোই আবার খোঁড়া হয়ে পড়বে।'

'মিথ্যে বলছ তুমি।' জুলি চিৎকার করে উঠল, 'তুমি আমার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করছ।'

'তোমার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার কথা কখনো আমার মনেও আসেনি। নইলে সেই ছবিগুলোকে ভিত্তি করেই তোমায় আমি সোজা আদালতে নিয়ে যেতাম। কারণ, ভালোবাসা যখন নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন প্রতিশোধও অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিশোধস্পৃহার প্রকাশের মধ্যেই ভালোবাসার ছিটেফোঁটা নিহিত থাকে।'

'তুমি যদি অপারেশন করে আমার পা ঠিক করে দাও, তাহলে আমি ফিরে যাব। জীবনে আর কখনো তোমার পথের বাধা হয়ে দাঁড়াব না। এটা আমার অঙ্গীকার বলে গ্রহণ কর।'

'যদি তোমার খোঁড়া পা ঠিক করে দিতে পারতাম, তাহলে তোমার অঙ্গীকারের ওপর নির্ভর না করেই ঠিক করে দিতাম। কিন্তু সেটা একেবারে অসম্ভব জুলি।'

'তাহলে আমি তোমার কাছেই থাকব।'

'সেটাও সম্ভব না।'

'কেন? আমি কি আর দেখতে সুন্দরী নই?'

'তোমার চেয়ে বেশি সুন্দরী মেয়ে সারা নৈনিতালে কোথাও নেই। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, জীবন কাটানোর জন্যে শুধু সৌন্দর্যটাই যথেষ্ট নয়। ভালোবাসাও চাই। কিন্তু তোমার জীবনে তো ভালোবাসার নামগন্ধও নেই।'

'একসময় তো আমরা পরস্পরকে ভালোবাসতাম। অন্তত সেই কথাটা মনে করে—'

কমল তার কথায় বাধা দিয়ে বলল, 'প্রেমের অঙ্কুরোদ্গম একবারই হয়। সেই গাছে মাত্র একবার একটিই ফুল ফোটে। একমাত্র সেই ফুলের গন্ধ চারদিকে সকলের কাছেই ঘোষণা করে দেয় যে কোথাও দুজন পরস্পরকে ভালোবাসে। কিন্তু যখন সেই ফুল ম্লান হয়ে যায়, পাতা শুকিয়ে যায় এবং শিকড় পচে যায়, তখন সেই গাছ দ্বিতীয়বার জন্মায় না।'

'এসবই কাব্য। আমি তোমায় আর কিছুতেই ছাড়ব না। ছায়ার মতো তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব। আমি তোমার স্ত্রী।' জুলি দাঁতে দাঁত ঘষে বলল।

'সম্পর্কটা মনের জিনিস। আদালতের তৈরি সম্পর্ক শুধু শরীরের চামড়াটাই স্পর্শ করতে পারে। আত্মার গভীরে প্রবেশ করে না। আত্মা যদি একবার কারোর ভালোবাসা অস্বীকার করে, তাহলে দ্বিতীয়বার তার ওপর সেই ভালোবাসাকে আরোপ করা সম্ভব নয়।'

জুলি কাঁদতে শুরু করল।

কমল ক্লাবের দিকে তাদের নৌকো ফিরিয়ে নিয়ে চলল।

সতেরো

এবং এখন সে শায়েস্তার স্টুডিওতে বসে রয়েছে। শায়েস্তা ক্যানভাসের ওপর একটি ফুলদানি এঁকেছে। সেই ফুলদানির ওপর সে এখন ফুল সাজাচ্ছে। ফুলদানির রঙ গাঢ় লাল, ফুলের রঙ কালো, আর ডাঁটাগুলো ঘন নীল।

কমল বলল, 'ফুল বিলাপ করছে। যেন শোকে মুহ্যমান। ডাঁটাগুলো আহত নীল। কিন্তু ফুলদানিটার রঙ গাঢ় লাল কেন? আর ফুলদানির যে-রঙ হওয়া

উচিত ছিল, সে-রঙ ফুলের কেন ?'

শায়েস্তা কোন জবাব দিল না। সে ফুলদানির ফুলের ওপরে সবুজ রঙ দিয়ে বাঁকা চাঁদ আঁকল।

কমল হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল, 'কী, আজ সমস্ত কথাবার্তা আঁকাজোকা দিয়েই চলবে না-কি ?'

শায়েস্তা কিন্তু ভীষণ গম্ভীর। মৃদুকণ্ঠে বলল, 'তুমি তোমার বিয়ের কথাটা আমার কাছে লুকিয়েছিলে কেন ?'

'তার কারণ, ও-বিয়ে আমার কাছে একেবারে শেষ হয়ে গেছে। মরা লাশ। সেই মাটি-চাপা লাশকে টেনে তুলতে ইচ্ছুক নই আমি।'

'কিন্তু সেই মাটি-চাপা লাশ-ই তো আজ বেঁচে উঠেছে ?'

'আমার কাছে নয়।'

'এ-কথা কী করে বলছ তুমি ?'

'কী করে বলছি! যেমন তোমার অতীত সম্পর্কে আমি কিছু জিজ্ঞেস করিনি, তেমনি আমার অতীত সম্পর্কেও আমি তোমায় কিছু বলিনি। কারণ অতীতে যা-ই থাকুক না কেন, আজ আর আমার কাছে তার কোন অবয়ব নেই।'

'আমার অতীতে এমন কিছু ছিল না, যা তোমার কাছে আমায় গোপন করতে হবে। অনেক পুরুষই মনে-প্রাণে চেয়েছে আমায়, কিন্তু জীবনে একমাত্র তোমাকেই ভালোবেসেছি আমি। সেটা তুমি ভালোভাবেই জান। তা সত্ত্বেও তুমি আমায় এমনি ধোঁকা দিলে! কিন্তু এ-ব্যাপারে তোমাকেই বা দোষ দেব কেন! ধোঁকাবাজিটা তো হিন্দুদের স্বভাব!'

কমল মৃদু হাসল।

শায়েস্তা বলল, 'তুমি এখন হাসছ! হাসতে পার। এ-কথা আমি কখনো ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি। এ-ব্যাপারে মা আমায় অনেক করে বুঝিয়েছেন। আকারে-ইঙ্গিতেও বোঝাতে চেয়েছেন। স্পষ্ট করেও বলেছেন। তোমাদের জাতের চাল-বাজি সম্বন্ধে সাবধান করেছেন। কিন্তু আমি কিছুই গ্রাহ্য করিনি। কখনো হিন্দু-মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ভাবতে শিখিনি। কারণ আমি শিল্পী। জীবনের উপলব্ধি দিয়েই আমি ভাবতাম সবকিছু। ধর্মের মাপকাঠি দিয়ে নয়। কিন্তু তুমি আমার সমস্ত বিশ্বাসের ভিত্তিমূল নষ্ট করে দিয়েছ। আজ এই ভালোবাসা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল, সেজন্যে আমার তত দুঃখ নয়। দুঃখটা হচ্ছে এই জন্যেই যে, মা এবং মায়ের মন্ত্রণাদাতাদের কথাই আজ সত্য বলে প্রমাণিত হল। তাঁরা বলতেন, 'হিন্দু-হিন্দু। মুসলিম, মুসলিম। আর এই দু'য়ে কখনো একটি বিন্দুতে এসে মিলিত হতে পারে না। যাতে দুটি পৃথক আত্মার মিলন ঘটে, সেই বিয়ের ব্যাপারে তো নয়ই।' নৈনিতালে যখন হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বেধেছিল, তখন আমার চোখ থেকে একটি পর্দা তো সরে গেছেই, আজ অন্য পর্দাটিও সরে গেল। আমি এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, কেন এই দেশের ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়েছিল!

আজ বুঝতে পারছি, কী জঘন্য মনোবৃত্তিতে ভরে গিয়েছিল আমাদের এই দেশ, কী অসহ্য বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল এখানে! আর তোমরা এমনি চাপ সৃষ্টি করেছিলে, যাতে বাধ্য হয়ে আমরা নিজেদের জন্যে একটি পৃথক হোমল্যাণ্ড তৈরি করেছি।'

'তুমি একটি ব্যক্তিগত ব্যাপারকে রাজনৈতিক ব্যাপারের সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে দিচ্ছ। দুটি আলাদা বিষয়।'

'না। আলাদা নয়।' শায়েস্তা রুক্ষস্বরে বলল, 'আর আমি কোন রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে তর্কও করছিনে। হিন্দুদের সেই আদি ও অকৃত্রিম মনোবৃত্তি যা প্রতারণা আর প্রবঞ্চনার ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে, আমি তার শিকার হয়েছি, যা আমার জীবনটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে, যা আমাদের, মুসলমানদের পাকিস্তান সৃষ্টি করতে বাধ্য করেছে। তুমিও সেই হিন্দু।'

'জাতি-ধর্মের দিক দিয়ে তা আমি অস্বীকার করতে পারিনে। কিন্তু একজন ব্যক্তিবিশেষের ভুল-ভ্রান্তিকে গোটা সম্প্রদায়ের অপরাধ বলে কী করে মেনে নেব?'

'তাহলে তুমি নিজের অপরাধ স্বীকার করছ?'

'না। আমি বলব, ওটা একটা ভুল মাত্র। জুলিকে ত্যাগ করেছি, সে এক যুগ। সে আমার স্মৃতি থেকেও মুছে গেছে। আমার জীবন থেকে সে-অধ্যায় চিরকালের জন্যে লুপ্ত হয়ে গেছে। ঠিক যেন আমার জীবনে সে আসেই নি কখনো। আমার অতীতের স্লেট এখন পরিষ্কার ঝকঝকে। আপনার মনে আমি একলা নিঃসঙ্গভাবেই দিন কাটাচ্ছিলাম। তাই তোমাকে ভালোবাসতে গিয়ে এতটুকু সংকোচ বোধ করিনি।'

'তুমি নিজের অতীতটাকেও তো আমায় বলতে পারতে?'

'যে-অতীতের অবশিষ্টটুকুও ছিল না আমার কাছে, যা আমি চিরকালের মতো ভুলে গিয়েছিলাম, সেটা কী করে বলতাম তোমায়?'

'এটা কবিসুলভ ব্যাখ্যা। আসল কথা এই যে, তুমি আমায় ধাপ্পা দিতে চেয়েছিলে।'

'না। আমি তোমায় বিয়ে করতে চেয়েছিলাম।'

'এ-বিয়ে কিরকম বিয়ে হত যখন তোমার আগের স্ত্রী এখনো বর্তমান, তার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদও করনি?'

'আমি তার বিছানা থেকে উঠে চলে এসেছি, তারপর তার সঙ্গে আর দেখাও করিনি। বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। তার মুখ দেখার কথাও ভাবতে পারতাম না আমি।'

'কিন্তু তোমার-আমার বিয়ে! সেটাকে বিয়ে বলা যেত কী করে?'

'আমার ধারণা ছিল, জুলি যখন আমার সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গ করেছে, তখন সে যেমন আমার কাছে আর কখনোই আসবে না, আমিও তেমনি তার কাছে যাব

না কখনো। আমি মুক্ত। স্থির-বিশ্বাসে চুপচাপ কেটে গেছে এতগুলি বছর। সুতরাং এরকম ভাববার যথেষ্ট কারণ ছিল। মাঝে মাঝে ভাবতাম, কথাটা তোমায় বলেই ফেলি, কিন্তু বলা হয়নি। শেষ পর্যন্ত ভেবে রেখেছিলাম, বিয়ের পর সব খুলে বলব তোমায়।'

'অর্থাৎ আমায় বেশ ভালোভাবে ফাঁসিয়ে নিয়ে, একটা মিথ্যে বিয়ের প্রহসন তৈরি করে, যখন একূল-ওকূল দুকূলই যাওয়ার মতো অবস্থায় পড়তাম আমি, তখন আমায় বলতে?' অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল শায়েস্তা।

'এখনো এমন কিছু হয়নি শায়েস্তা। আমার ভুল হয়েছে, এটা মেনে নাও। আমায় ক্ষমা করতে পারবে না তুমি? আমি জুলির সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ করে নেব।'

কমল তার হাতের ওপর হাত রাখল, সঙ্গে সঙ্গে হাত সরিয়ে নিল শায়েস্তা। বলল, 'কিন্তু আমি এখন আর তোমায় বিয়ে করতে চাইনে। এত বড় ধাপ্পাবাজির পরও যে মেয়ে তোমায় বিয়ে করবে, সে আকাট মুখ্যু।'

'মনের দিক দিয়ে আমি বিন্দুমাত্র অবিশ্বাসী নই শায়েস্তা।'

'আমার কথারও আর একবিন্দু নড়চড় হবে না।' শায়েস্তা খুব গম্ভীর গলায় জবাব দিল।

তার কণ্ঠস্বরে এমন কাঠিন্য ছিল যে কমল আর কিছু বলতে সাহস করল না। অনেকক্ষণ সে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর ছবিটার দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে বলল, 'এতক্ষণে বুঝলাম, ফুল বিলাপ করছে, শোকে মুহ্যমান। ডাঁটাগুলো আহত নীল। কিন্তু এই সবুজ বাঁকা চাঁদটা কেন, বুঝতে পারলাম না!'

শায়েস্তা ঋজুকণ্ঠে জবাব দিল, 'আমি পাকিস্তানে চলে যাচ্ছি।'

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল কমল। সারাক্ষণ শূন্যে শুধু আগুনের ফুলকি উড়তে থাকল। তারপর একসময় সেই আগুনের ফুলকিগুলো ছাই হয়ে ঝরে পড়তে লাগল। কমলের মনে হল, স্টুডিও-র মেঝেতে, ওপরে নীচে সব জায়গায় শুধু ছাই। ছাইয়ে ভর্তি হয়ে গেছে চারপাশ। কমল এদিক-ওদিক চেয়ে দেখতে থাকল শুধু। দেয়ালের দিকে তাকাল। দেয়ালগুলোতে সার সার শায়েস্তার ছবির ক্যানভাস টাঙানো। ছবিগুলোর অধিকাংশই তার চেনা। তার সামনেই অনেক ছবি শুরু হয়েছে, অনেক ছবি শেষ হয়েছে। প্রত্যেকটি ছবির মেজাজের সঙ্গে পরিচিত ছিল সে। অন্যমনস্কভাবে কখনো কখনো হঠাৎ তার মনে হত, ছবিগুলো টাঙানো রয়েছে তার আর শায়েস্তার ঘরেতে। কোন্ ছবিটা কোথায় টাঙানো থাকে, সেটাও মুখস্থ ছিল তার। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে যে-ছবিটি তার সামনেই আঁকা হচ্ছে, তার মেজাজ সে এতটুকু আন্দাজও করতে পারছে না।

সে ধীরে ধীরে বলতে লাগল, 'আমাদের ভালোবাসার মাঝখানে হিন্দু-মুসলমান, ভারত-পাকিস্তানকে টেনে এনো না। যতো দেরিতেই হোক না কেন,

হয়তো একদিন হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ভালোবাসায় রূপান্তরিত হবে, ভারত-পাকিস্তানের শত্রুতা সৌহার্দ্য আর বন্ধুত্বে পরিণত হবে। এই সামাজিক সম্প্রীতির তীব্রতম দাবি আজ সমগ্র পৃথিবীতে সোচ্চার হয়ে উঠছে। সেই তীক্ষ্ণধার নবচেতনায় অতীতের এই কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গল কবে পরিষ্কার হয়ে উঠবে, কবে আমরা সেই পরিচ্ছন্ন নন্দন-কাননে ঘুরে বেড়াতে পারব? যেতে চাও যাও। তুমি কোথাও যেতে চাইলে আমি বাধা দিতে পারব না। কিন্তু মনের মধ্যে এতখানি ঘৃণা নিয়ে যেও না। তাহলে কোথাও শান্ত স্বচ্ছন্দ জীবন কাটাতে পারবে না। যেতে হলে একটি মেয়ের মতোই যাও, যাকে তার প্রিয়তম ধোঁকা দিয়েছে কিংবা যে তার প্রিয়তমকে ভুল বুঝেছে। যাই হোক, এরকম একটা কিছু ভেবে নাও।'

শায়েস্তা রাগে মাটিতে পা ঠুকে বলল, 'কিন্তু আগে আমায় বললে না কেন?'

'অর্থাৎ যেদিন আমার মনে তোমার প্রতি প্রথম ভালোবাসা জন্মেছিল, সেদিন গিয়ে বলতাম—মিস শায়েস্তা জাবেদ, আমি আপনাকে ভালোবাসতে শুরু করেছি। কিন্তু আপনি জেনে রাখুন যে আমি বিবাহিত। কয়েক বছর আগে আমি এক ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে করেছিলাম। আমি তাকে ত্যাগ করেছি, সে-ও আমায় ত্যাগ করেছে। কিন্তু আইনানুগ বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়নি এখনো। এ-কথা বললে তোমার উত্তর কী হত? নিশ্চয়ই সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করতে আমায়। এতটুকু প্রশ্রয় দিতে না। কিন্তু আমি নিদারুণভাবে তোমার প্রেমে আকুল হয়ে উঠেছিলাম। আমি যদি তোমায় সে-কথা না বলেই থাকি, সেটা আমার তীব্রতম ভালোবাসারই অপরাধ। নিশ্চয়ই বলতাম তোমায়, তবে বলতাম বিশেষ সুযোগ মতো। কিন্তু সেই সুযোগ আসার আগেই জুলি এসে পড়ল। আর তার ফলেই সবকিছু ওলট পালট হয়ে গেল।'

কমল করুণ চোখে শায়েস্তার দিকে তাকাল। কিন্তু শায়েস্তা তার কোন জবাব দিল না। ক্যানভাসের ওপর ছবি আঁকতেই থাকল সে। বড় কষ্টে সেই দুঃসহ স্তব্ধ মুহূর্তগুলি কেটে গেল। অবশেষে কমল আস্তে আস্তে নিজের জায়গা থেকে উঠে দাঁড়াল। অমনি শায়েস্তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে, 'খুদা হাফিজ!'

কমল দ্রুত স্টুডিও থেকে বেরিয়ে গেল।

স্টুডিও থেকে বেরিয়ে নীচে নামতে নামতে কমল যখন রয়েল ওক লজের ড্রাইভের গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার কানে এল, 'চা খেয়ে যাও কমল।'

কমল একটু পেছন ফিরে আড় চোখে বেগম জাবেদকে দেখল। শিফনের সবুজ শাড়ি পরে ফুলের মতো ফুটিত যেন। সামনে টেবিলে চায়ের সাজ-সরঞ্জাম।

তাকে পেছন ফিরতে দেখেই বেগম জাবেদের ওষ্ঠাধরে মৃদু হাসি খেলে গেল। তার কোমল মসৃণ কণ্ঠস্বরে যেন বিদ্রূপের সহস্র কাঁটা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। বলল, 'এত

শীগগীর চলে যাচ্ছ যে কমল ! এসো, চা খেয়ে যাও।'

কিন্তু কমল কোন উত্তর না দিয়ে গেটের দিকে অগ্রসর হল। বেশ কিছুক্ষণ তার কানে শুধু বেগম জাবেদের অর্থপূর্ণ হাসিই শোনা গেল। কান পর্যন্ত তার সারা মুখ লাল হয়ে উঠল। গেট দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে দ্রুত পায়ে, বলতে গেলে, প্রায় দৌড়তে দৌড়তে ড্রাইভের বাকি পথটুকু অতিক্রম করল সে।

আঠারো

পরদিন শায়েস্তা বেগম জাবেদের সঙ্গে চলে গেল। দু সপ্তাহ ধরে কমল বাংলো থেকে বেরোল না। এমন গভীর দগদগে ক্ষত যে সে সংসারের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারছিল না। ইতিমধ্যে জুলি দুবার তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। কিন্তু কমল দেখা করতে চায়নি। জুলি যখন ব্যাপারটাকে আদালত পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়ার ভয় দেখাল, তখন কমল নিজেই তার বন্ধু ব্যারিস্টার শ্রীরামনারায়ণ শ্রীবাস্তবকে ডাকিয়ে এনে তার হাতে কেসটার পুরো দায়িত্ব ছেড়ে দিল। কিন্তু জুলি কেসের দিকে এগোতে চাইল না, অপেক্ষা করতে থাকল। কমলও বাংলো ছেড়ে বেরোল না। সে 'ল্যানসেট' কাগজের জন্য একটি বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ লিখতে শুরু করল। লেখা তরতর করে এগিয়ে চলছিল। কারণ মাঝে মাঝে এমন গণ্ডগোল পাকিয়ে ফেলছিল যার সঙ্গে বিজ্ঞানের বিন্দু-বিসর্গ সম্পর্ক নেই। কিন্তু লিখে যাচ্ছিল সে। অন্তত লেখার চেষ্টা করছিল।

তারপর একদিন তার ভৃত্য এসে নিবেদন করল, 'হুজুর, সেই গঙ্গারাম ঘোড়াওয়ালা এসেছে। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। বলছে খুব জরুরী কাজ আছে না-কি !'

কমল গঙ্গারামকে ভেতরে পাঠিয়ে দিতে বলল। গঙ্গারাম এলে কমল দেখল এই দু সপ্তাহের মধ্যেই সে ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছে। তার বড় বড় চোখ দুটো জ্বলছে যেন।

কমল জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার গঙ্গারাম ?'

গঙ্গারাম বলল, 'বাবু, আমার বোন তারার খুব অসুখ। আপনি গিয়ে দেখুন একটু।' তার চোখে জল।

'ঘোড়া এনেছিস ?'

'হ্যাঁ বাবু।'

'চল তাহলে। আমি মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই তৈরি হয়ে নিচ্ছি।'

অন্ধকার কুঁড়ে ঘরে তারাকে দেখে কমল বেরিয়ে এল। ইশারা করে গঙ্গারামকে একপাশে ডেকে নিয়ে বলল, 'ওর সিফিলিস হয়েছে।'

গঙ্গারাম ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

কমল বলল, 'খুব মারাত্মক ব্যাধি এটা। কিন্তু এখন প্রাথমিক স্টেজে রয়েছে বলে চিকিৎসা সম্ভব।'

গঙ্গারাম ওর পা দুটো চেপে ধরল।

কমল নিজের মনেই যথেষ্ট চিন্তিত স্বরে বলল, 'বোকা মেয়ে কোথাকার! ওর এতটুকু জ্ঞান-গম্যি আছে যে—।' তারপর হঠাৎ থেমে জিজ্ঞেস করল, 'লোকটা কে জানিস?'

গঙ্গারাম চোখ নামাল। আস্তে আস্তে শিশুসুলভ ক্ষীণ কণ্ঠে সে বলল, 'উমেশ সাকসেনা।'

'আমিও কিছুটা আঁচ করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত উমেশ সাকসেনাই জিতে গেল তাহলে!'

কমল মনে মনে ভাবল, যখন কুঁড়েঘরের ভেতর অন্ধকার, উপোসে উপোসে দেহ অবসন্ন, খিদের চোটে নাড়িভুঁড়ি মোচড় দিচ্ছে, মা অন্ধ, ভবিষ্যতের ক্ষীণ আশাটুকুও চোখে পড়ছে না, তখন এইরকমই হয়ে থাকে। সেইজন্যেই যেসব পার্বত্য অঞ্চলে ট্যুরিস্টদের আনাগোনা খুব বেশি সেখানেই যৌনব্যাধির এত ছড়াছড়ি। এ যেন ঈশ্বরের দৈবশক্তির মতোই মানুষের উদগ্র কামনার প্রভাব।

গঙ্গারাম কমলের পা জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমার বোনকে বাঁচান বাবু। ভীষণ বোকা মেয়ে। আমি বেশ কয়েকবার মেরেছি ওকে। কিন্তু কিছুতেই বশে আনতে পারিনি। ভগবানের নামে ওকে বাঁচিয়ে দিন বাবু।'

তারাকে হাসপাতালে ভর্তি করে এবং তার চিকিৎসার যাবতীয় বন্দোবস্ত সেরে কমল বাসায় ফিরছিল। ঘোড়ার পিঠে কমল, পাশে পাশে গঙ্গারাম। সেক্রেটারিয়েটের চড়াইয়ে উঠে গঙ্গারাম বলল, 'বাবু, আপনি এতদিন ঘর থেকে বার হননি কেন?'

কমল জবাব দিল, 'এমনি।'

কিন্তু কমলের জবাবে সন্তুষ্ট হলো না সে। কয়েক পা এগিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, 'আপনি শায়েস্তা দিদিমণিকে খুব ভালোবাসতেন, তাই না বাবু?'

তার কণ্ঠস্বরে এক আশ্চর্য জোর ছিল। কথাগুলোতে আগুনের জ্বালা বোধ করল কমল। সে বিস্মিত ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। এ-প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার কী অধিকার আছে এই ছোঁড়াটার? কিন্তু তারপরই সে ক্ষমা করল ওকে, কেননা ওদের ভদ্রতাবোধ বিচিত্র ধরনের, কমলের থেকে আলাদা।

কমল উত্তর দিল, 'হ্যাঁ।'

তারপর সে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। ঘোড়া ছুটছে। দেবদারুর গাছগুলো একটার পর একটা পেছনে চলে যাচ্ছে। বাংলোর বাগান-ঘেরা উঁচু পাথরের পাঁচিল চোখে পড়ছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গঙ্গারাম থাকতে পারল না, সে আবার জিজ্ঞেস করল, 'এর পর আপনি কি আর কাউকে ভালোবাসতে পারবেন না বাবু?'

কমল আকাশের দিকে তাকাল। মেঘেরা ভেসে যাচ্ছে অনেক ওপরে। সে

পাথরের পাঁচিলের দিকে তাকাল, কিন্তু পাঁচিল বাগানের ফুলগুলোকে আড়াল করে রেখেছে। সামনে তাকাল সে। বহুদূর পর্যন্ত দেবদারুর ঘন জঙ্গল রহস্যাবৃত। হঠাৎ একখণ্ড জমিতে দুটি সূর্যমুখী ফুল তার চোখে পড়ল। কিন্তু ফুল দুটি মুখ ফিরিয়ে রয়েছে অন্যদিকে। কারণ সূর্য এখন অস্তমিত।

হঠাৎ কমল হিংস্র ক্রোধোন্মত্ত কণ্ঠে বলে উঠল, 'না-না-না।' কমলের রুক্ষ কণ্ঠস্বরে ভয় পেল গঙ্গারাম। সারা রাস্তা আর সে কোন কথা বলল না।

বাংলোর কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামতেই ভৃত্য নাথু এসে একটা খাম দিল তার হাতে। খামের ওপর রাজদূত হোটেলের নাম আর ঠিকানা। খাম খুলে চিঠি বার করল। জুলি লিখেছে:

> আমি কোন মামলা-মোকদ্দমার মধ্যে যেতে ইচ্ছুক নই। আমি চাই, আপস আলোচনার মাধ্যমে একটা বোঝাপড়া হয়ে যাক। সেরকম হলে আমি তোমার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত। ভবিষ্যতে আর কখনো কোনরকম ঝগড়াঝাটি বাধাব না। সেজন্য তুমি যদি আগামী কাল রাত্রি আটটা-নটার সময় এসে আমার সঙ্গে দেখা করো, তাহলে আমরা কোন একটা মীমাংসায় উপনীত হতে পারব, আশা করি। এখানেই ডিনারের নিমন্ত্রণ রইল।
>
> তোমার জুলি

কমল চিন্তা করল, সমস্যাটাকে এখনই মিটিয়ে ফেলা উচিত। সে গঙ্গারামকে বলল, 'তুই এখানেই দাঁড়া একটু। আমি এক্ষুনি ভেতর থেকে আসছি।'

সে ঘরে গিয়ে জুলিকে একখানা চিঠি লিখল। চিঠিখানা খামের মধ্যে পুরে বাইরে এসে গঙ্গারামকে দিয়ে বলল, 'শোন্, রাজদূত হোটেলে চলে যা। সেখানে জুলি নামে এক মেমসাহেব আছেন। তাঁকে এই চিঠিখানা দিস।'

গঙ্গারাম বলল, 'আমি তো ওকে চিনি বাবু।' যখন সে ঘোড়ার লাগাম ধরে হাঁটতে শুরু করল, তখন কমল বলল, 'কাল রাত্রি আটটার সময় ঘোড়া নিয়ে আসবি। রাজদূত হোটেলে যেতে হবে।'

'ঠিক আছে বাবু।' সে ঘোড়ার পিঠে চড়ে পা দিয়ে ঘোড়ার পেটে এড়ি মারল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে ড্রাইভ পার হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

উনিশ

রাজদূত হোটেল। রুম নম্বর একশো এগারো। উমেশ সাকসেনা হুইস্কি পান করতে করতে জুলিকে বলছিল, 'আমি বুঝতে পারছি নে আপনি বিবাহ-বিচ্ছেদ মেনে নিতে চাইছেন কেন! বিবাহ-বিচ্ছেদের শর্তে ওর কাছ থেকে তিন-চারলাখ টাকার বেশি কিছুতেই আদায় করতে পারবেন না। সেটাও দুঃসাধ্য মনে হচ্ছে আমার কাছে। কিন্তু ওর স্ত্রী হিসেবে থাকলে আপনি ওর যাবতীয় সম্পত্তি করায়ত্ত

করতে পারবেন। সব মিলিয়ে সেটা চল্লিশ লক্ষ টাকার কম হবে না।'

জুলি জিজ্ঞেস করল, 'সেটা কী করে সম্ভব ?'

'ও মারা গেলে।'

জুলি একেবারে বোবা বনে গেল। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে সে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল উমেশের দিকে। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, 'ওর বাঁচা-মরাটা কি আমার হাতে?'

'আমাদের দুজনের হাতে।' এক গভীর দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে উমেশ বলল। জুলির স্ফটিকশুভ্র দেহ তাকে লালায়িত করে তুলছিল।

উমেশের চোখ থেকে নিজের চোখ সরিয়ে নিতে নিতে জুলি জিজ্ঞেস করল, 'কিভাবে ?'

হুইস্কিতে একটা বড় চুমুক দিল উমেশ। চাপা গলায় বলল, 'চেয়ারটা কাছে টেনে নিয়ে আসুন। বলছি।'

জুলি একেবারে তার কাছে চেয়ার টেনে নিয়ে এসে বসল।

উমেশ বলল, 'রাজদূত হোটেল পৌঁছনোর আগে রাস্তায় কুমি নালা পড়ে, দেখেছেন ?

'হ্যাঁ দেখেছি।'

'এই বর্ষায় ওর সাঁকোটা ভেসে গেছে। এ-পর্যন্ত পি.ডবলিউ.ডি নতুন সাঁকো তৈরি করেনি। নালার ওপর বেশ কিছু কাঠ পেতে দেওয়া হয়েছে। তাই দিয়ে ঘোড়া-ডুলি নালা পার হয়।'

জুলি কিছু বুঝতে না পেরে বলল, 'আপনি কী বলতে চাইছেন ?'

'আমি শুধু বলতে চাইছি, ওই সাঁকোটার নীচে এক গভীর খাদ। আর রাত্রি আটটার সময় দেবদারু গাছে ঘিরে থাকা ওই রাস্তাটাও ভীষণ অন্ধকার হয়ে থাকে। নিজের হাতই নিজের চোখে পষ্ট দেখা যায় না।'

'তারপর ?' ভয়ে কেঁপে উঠল জুলির গলা।

উমেশ বলল, 'তারপর ধরুন, যদি কেউ রাতের অন্ধকারে কাঠগুলো তুলে ফেলে দেয়, তাহলে কোন ঘোড়সওয়ারের পাত্তাই পাওয়া যাবে না। সোজা নীচের খাদে গিয়ে পড়বে।' উমেশ আঙুলে চুটকি বাজিয়ে বলল, 'একেবারে খতম।'

জুলি মাথা নেড়ে বলল, 'খুব বিপজ্জনক কাজ ! না, আমি এ-ষড়যন্ত্রের মধ্যে থাকতে পারব না।'

'আপনাকে এর মধ্যে থাকতেই বা দিচ্ছে কে ? কাঠগুলো তুলে ফেলার জন্যে আমিই যথেষ্ট। আপনি শুধু বলুন কমলের সম্পত্তির মালিক হলে আপনি আমায় বিয়ে করবেন কি-না !'

জুলি চোখ নীচু করে চুপচাপ চেয়ারে বসে রইল। উমেশ তার দিকে চেয়ে আছে। জুলি তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। উমেশের শরীরটার প্রতি দারুণ ঘৃণা বোধ হল তার। কিন্তু চল্লিশ লক্ষ টাকার লোভটাও তো কম নয়। স্বীকার করে নিলেই সে চল্লিশ লক্ষ টাকা পেয়ে যাবে। কিন্তু সেজন্যে উমেশকে

বিয়ে করাটা কি একান্ত বাঞ্ছনীয়? সে কি তাকে কখনো বরদাস্ত করতে পারবে? কী ঘৃণ্য জঘন্য দেহ তার! ওই চেয়ারে বসে উমেশ যেন নর্দমার কীটের মতো কিলবিল করছে! ইস ওকে বিয়ে করবে সে? কক্ষনো না। সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে সে ইংলণ্ডে ফিরে যাবে।

নিজের মুখের ওপর উমেশের শ্বাস-প্রশ্বাস অনুভব করল সে। ওর দিকে ফিরে চেয়ে বড় কষ্টে মুখে হাসি টেনে আনল।

এমন সময় দরজায় করাঘাতের শব্দ হল। জুলি নিজে উঠে গিয়ে দরজা খুলল। বাইরে চিঠি হাতে গঙ্গারাম দাঁড়িয়ে।

চিঠিখানা জুলিকে দিয়ে বলল, 'কমলবাবু আপনাকে দিতে বলেছেন।'

জুলি তাড়াতাড়ি খামটা খুলে ফেলল। চিঠিটা বার করে পড়ল। গঙ্গারামকে বলল, 'ঠিক আছে।'

তারপর সে দরজা বন্ধ করে ফিরে এল আর চিঠিখানা নাড়াতে নাড়াতে উমেশকে বলল, 'ও কাল রাতে এখানে খেতে আসছে।'

আনন্দে উমেশের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার চোখ-মুখে যেন আগুন জ্বলতে লাগল দাউ দাউ করে।

সাতটা বাজতেই চারদিক ঘন অন্ধকার। সারা আকাশ চাপ চাপ মেঘে আচ্ছন্ন পাহাড়ের ওপর কুয়াশা ছড়িয়ে পড়ছে। ওরা দুজন অন্ধকারকে আরো ঘনীভূত করে তুলেছে।

উমেশ ঘড়ি দেখল। নিশ্চিন্ত কুটিল দৃষ্টি তুলে আকাশ দেখল। চারদিকে ক্রমশ ঘনীভূত কুয়াশার দিকে তাকাল। তারপর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে খাদের কাছে এসে পৌছল। খাদের ওপর বড় বড় সাতখানি কাঠ পেতে কৃত্রিম সাঁকো তৈরি করা হয়েছে। উমেশ ভাবল, এবার তার কাজ শুরু করে দেওয়া উচিত। আজ প্রকৃতিও যেন তার সঙ্গে সহযোগিতা করছে। এই গভীর হিমেল অন্ধকারে খুব সহজেই সে তার কাজটা সেরে ফেলতে পারবে। এইটুকুই শুধু প্রার্থনা, কমলের আগে আর কেউ যেন এসে না পড়ে!

পৌনে আটটায় গঙ্গারাম ঘোড়া নিয়ে এল। কমল বলল, 'বড় দেরি করে এলি!'

গঙ্গারাম বলল, 'হাসপাতাল গিয়েছিলাম তারাকে দেখতে।'

'কেমন আছে?'

'আগের চেয়ে ভালো। তবে খুব চঞ্চল ছটফটে স্বভাব ছিল ওর, অথচ এখন ভালো করে কথাই বলে না। চুপচাপ শুয়ে থাকে।'

কমল আকাশের দিকে চেয়ে বলল, 'আকাশ দেখে মনে হচ্ছে বৃষ্টি নামবে। চল, বেরিয়ে পড়ি।'

কমল ঘোড়ায় চড়ে গঙ্গারামের হাত থেকে চাবুক নিল।

ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। অন্ধকার আরো ঘন হয়ে উঠছে। উমেশ ঘড়ি দেখল। আটটা বাজতে আর মাত্র চার মিনিট বাকি। ও ইতিমধ্যেই পাঁচখানা কাঠ খাদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। মাত্র দুখানা বাকি। সময় বড় কম। কিন্তু কাঠও রয়েছে মাত্র দুখানা। এখন ঈশ্বর করুন, এ সময় কোন ঘোড়সওয়ার, এমন কি কোন পদচারীও যেন এদিকে না আসে। নিঃসন্দেহে অদৃষ্টও সহযোগিতা করছে তাকে। সে কোদাল নিয়ে ষষ্ঠ কাঠখানিকে স্থানচ্যুত করতে শুরু করল।

কমল বলল, 'তুই তো এই ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ভিজে যাবি গঙ্গারাম!'

গঙ্গারাম জবাব দিল, 'তাতে কিছু যায় আসে না বাবু।'

'আমি তাড়াতাড়িতে অন্য বর্ষাতিটা নিতে ভুলে গেছি।'

গঙ্গারাম আবার একই জবাব দিল, 'কিছু যায় আসে না বাবু।'

হঠাৎ ভীষণ জোরে মেঘ ডাকল। তারপর অনেক দূরে কোথায় যেন বিদ্যুৎ চমকাল। বৃষ্টিও পড়তে লাগল জোরে জোরে। ঘোড়া দ্রুত দৌড়তে শুরু করল।

গঙ্গারাম সতর্ক করে দিয়ে বলল, 'একটু সামলে চলুন বাবু। কাঁচা রাস্তা, অনেক খানা-খন্দ রয়েছে।'

মূষলধারে বৃষ্টি নামল।

উমেশ এবার হাঁপাতে শুরু করেছে। ষষ্ঠ কাঠখানিকেও খাদে ফেলেছে সে। এখন শুধু একখানাই বাকি। কিন্তু সেটা এমনি শক্ত হয়ে বসে আছে যে, কয়েক মিনিট চেষ্টা করেও তাকে একটুও নড়াতে পারল না সে। ঘামে সপসপ করছে সারা শরীর। এমন সময় সে দূরে ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি শুনতে পেল। তাড়াতাড়ি সে কোদাল নিয়ে কয়েক পা দূরের জঙ্গলের দিকে এক দৌড় দিল। দৌড়তে দৌড়তে তার খেয়াল হল যে সপ্তম কাঠখানা তুলে ফেলা হয়নি। অবশ্যি তাতে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। যত ওস্তাদ ঘোড়সওয়ার হোক না কেন, ওই একটি মাত্র কাঠের ওপর দিয়ে সে খাদ পার হতে পারবে না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সব মালুম হয়ে যাবে।

এমন ঘন অন্ধকার যে নিজেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চোখে পড়ে না। চড়াই ভাঙতে ভাঙতে গঙ্গারাম হাঁপাচ্ছিল। হাঁটতে হাঁটতে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়লে ঘোড়ার লেজ চেপে ধরছিল সে। বোধহয় ঘোড়াটাও বুঝতে পারছিল যে গঙ্গারাম ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাই সে কোন প্রতিবাদ করছিল না। ঘোড়ার লেজ ধরে চড়াই ভাঙতে কিছুটা সুবিধা হচ্ছিল গঙ্গারামের।

হঠাৎ লকলকে জিভ মেলে চারদিকে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে উঠল। তারপরই মেঘের প্রচণ্ড গর্জন। ক্ষণিকের সেই বিদ্যুচ্চমকে ঘোড়া, গঙ্গারাম, কমল—তিন

জনেই দেখল যে তারা খাদের একেবারে কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু খাদের ওপর সেই সাঁকোটি আর নেই। পুরো সাঁকোটির জায়গায় মাত্র একখানি কাঠ রয়েছে। পরমুহূর্তেই তাদের চোখের দৃষ্টি ঘন অন্ধকারে ছেয়ে গেল,।

কমল জোরে লাগাম টেনে ধরল। আচমকা বিদ্যুচ্চমক, ভয়ংকর মেঘগর্জন, সামনেই বিপজ্জনক ও গভীর খাদ—প্রাণপণ শক্তিতে ঘোড়ার লাগাম টানতে গিয়ে রেকাবের ওপর পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে ঘোড়াটাকে থামানোর জন্যে। গঙ্গারাম শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে সজোরে ঘোড়ার লেজ টেনে ধরল। শুধু এই মুহূর্তটুকু! কমল ঘোড়ার পিঠ থেকে এক লাফ দিয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়ল। এরকম এক বিপন্ন অবস্থায় জন্তুটাও দারুণ হকচকিয়ে গিয়েছিল। সে চার পা তুলে শূন্যে লাফ দিল। লাফ দেওয়ার সময় ভীষণ জোরে ধাক্কা মারল গঙ্গারামের বুকে। মর্মন্তুদ চিৎকার করে উঠল গঙ্গারাম আর একটা পাক খেয়ে খাদ থেকে একটু দূরে রাস্তার ধারে নালার মধ্যে গিয়ে পড়ল সে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ঘোড়াটাও খাদের মধ্যে গড়াতে গড়াতে চলে গেল এবং ঘোড়াটার সঙ্গে একরাশ পাথর আর মাটির চাঙড়ও গড়িয়ে পড়ল নীচে। একটা ভীষণ আওয়াজ হল। আর তারপরই হঠাৎ চারদিকে গভীর স্তব্ধতা।

রাস্তায় উঠে দাঁড়িয়ে নিজেকে বুঝতে বেশ সময় লাগল কমলের। তার ভাগ্য ভালো যে শরীরে কোথাও খুব একটা চোট লাগেনি। সম্ভবত শুধু কনুইটা ছড়ে গেছে!

মুষলধার বৃষ্টির মধ্যে কমল চিৎকার করে ডাকল, 'গঙ্গারাম! ও গঙ্গারাম—!'

কয়েক গজ দূরে নালার মধ্যে থেকে কার যেন কাতরানি শোনা গেল।

কমল আস্তে আস্তে এক সময় নালার ঘাসের মধ্যে গিয়ে পৌঁছল। ধীরে ধীরে গঙ্গারামের শরীরটাকে সোজা করে দিল সে।

এমন সময় আবার বিদ্যুৎ চমকাল। সেই আলোয় কমল দেখল, গঙ্গারামের মুখ থেকে রক্ত ঝরছে। তার চোগার মতো জামার সামনেটা রক্তে একাকার হয়ে গেছে।

কোথায় চোট লেগেছে দেখার জন্যে কমল তার জামার বোতাম খুলে ফেলল। তারপর বুকে হাত বুলিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ চমকে উঠে হাত সরিয়ে নিল সে। অজান্তে তার মুখ থেকে বেরল, 'এ-কী? এ-কী?'

গঙ্গারামের কাতর কণ্ঠস্বর, 'আমি গঙ্গারাম বাবু।'

কমল তোতলানো কণ্ঠে বলল, 'তা—তা—এ যে, এ-কী করেছিস তুই গঙ্গা?'

'তাহলে তারা যা করেছে, তাই করতাম বাবু?' কোঁপাতে কোঁপাতে জিজ্ঞেস করল গঙ্গারাম।

কমল কোন জবাব দিল না। মুহূর্ত থেকে মুহূর্ত, স্তব্ধতা বেড়েই চলল। বন থেকে বনান্তরে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ল। আত্মার গভীরে আত্মার মধ্যে নীরবতা বিরাজ করতে লাগল। দুর্ভাবনায় তার সারা মন তোলপাড় হচ্ছিল, কিন্তু কিছুই

বুঝে উঠতে পারল না সে—কী ছিল, আর এখন কি হয়েছে! কোথায় যাচ্ছিল সে, আর এখন কোথায় যাবে!

গঙ্গারাম বড় কষ্টে বলল, 'বাবু, আপনি আমায় বুকে জড়িয়ে ধরুন।'

কমল তাকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরল।

গঙ্গারাম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'এ কথাই আমি ভেবেছিলাম বাবু। যদি মরতে হয়, আপনার কোলে মরব। ভগবান এক গরিব পাহাড়ী ছেলের ইচ্ছে পূর্ণ করেছেন।'

কমল ভারি গলায় চিৎকার করে উঠল, 'গঙ্গা!...গঙ্গা!' কমল তার ভেজা চুলে, মুখে আর গালে হাত বোলাচ্ছিল। মুখ দিয়ে তখনো রক্ত গড়াচ্ছে। একটা দীর্ঘ হেঁচকির সঙ্গে তার মুখ দিয়ে আবার একঝলক রক্ত বেরিয়ে এল। তার কোমল দুর্বল হাত দুখানি কমলের ঘাড় থেকে শিথিল হয়ে ঝুলে পড়ল। মাথা ঢলে পড়ল একপাশে। তারপর সে তার কোলে চিরদিনের মতো শান্ত হয়ে গেল।

আবার বিদ্যুৎ চমকাল। মেঘ ডাকল। চারদিক গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সেই অন্ধকারে মুষলধারে বৃষ্টির কান্নার শব্দ শুধু শুনতে থাকল কমল।

কুড়ি

কতদিন পরে আজ সে আবার এখানে এসে বসেছে! মেট্রোপোল হোটেলের ঢাল পেরিয়ে ঝিলের ধারে। তার পেছনে পাহাড়ের ঢালুতে দেবদারুর জঙ্গল। সামনে জল। নভেম্বরের প্রথম তুষারপাতের হিমকণার মতো সমস্ত ঘটনাবলী তার স্মৃতি-পথে দ্রবীভূত হয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে। ঘটনাগুলোকে দেখতে পাচ্ছে সে, ফিল্মের রীলের মতো সেগুলোকে মস্তিষ্কে উন্মোচিত করতে পারছে, কিন্তু অনুভব করতে পারছে না।

শেষ পর্যন্ত জুলি আপস করে নিয়েছে। চার লাখ টাকা নিয়ে জুলি বিবাহ-বিচ্ছেদে রাজী হয়েছিল।

জুলি ইংলণ্ডে। কমল এখন মুক্ত। স্বাধীন।

কিন্তু কেন?

একদিন সুধা প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে তার বাংলোয় এসে উপস্থিত হয়েছিল। সে কোনরকমে কাশীপুর থেকে পালিয়ে এসেছিল কুমার মরাতব আলির সঙ্গে দেখা করতে। কমল দুজনকে গোপনে বোম্বাই পাঠিয়ে দিয়েছিল। সেখানে তারা বিয়ে করেছে। তারপর হনিমুন করতে দার্জিলিং চলে গেছে। যখন তারা ফিরে আসবে, তখন আকাশের অবস্থা একেবারে বদলে যাবে।

পাকিস্তান থেকে একটা বিয়ের চিঠি এসেছিল। উইং কম্যাণ্ডার হুমায়ুন মীর্জার সঙ্গে শায়েস্তার বিয়ে।

উমেশ সাকসেনা লোকসভার নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছে।

কমল নিজেই কেবল চারদিক থেকে বাজি হেরে ঝিলের কিনারে এসে বসেছে। ঝিলের কিনারে সে ছাড়া আর কেউ নেই। কিন্তু ঝিলের অপর পারে ট্যুরিষ্ট বোঝাই নৌকোগুলো জলভ্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছে। ইয়াট ক্লাবের কাছে জলের ওপর পালতোলা নৌকাগুলো রেস শুরু করছে। কিওর হোটেলের ব্যালকনিতে ছেলেমেয়েরা জোড় বেঁধে নীচে ঝুঁকে বাজারের দৃশ্য দেখছে। ফ্লাটে প্রতীক্ষমাণ কেউ কেউ কারোর জন্যে অস্থির প্রতীক্ষায় পায়চারী করছে। শুধু এপারে কেউ নেই, সে ছাড়া।

ভালই হয়েছে, সে এখন একা। তার সঙ্গে রয়েছে শুধু তার স্মৃতির শবাধার। সে আলতো হাতে একটা ছোট্ট হালকা পাথর তুলে নিল। সেটা জুলির প্রতীক। পাথরটা তার হাত থেকে ঝিলের জলের ওপর ছলছল করে কিছুদূর গিয়ে ডুবে গেল।

তারপর সে আর-একটা পাথর কুড়িয়ে নিল। সেটা শায়েস্তার প্রতীক। প্রথম পাথরটির মতো সে-পাথরটিও শূন্যে উড়ে গিয়ে, জলের ওপর ছলছল করতে করতে কিছুদূর গিয়ে, একটা ঢেউয়ে ধাক্কা খেয়ে ডুবে গেল।

তারপর সে আরও একটা পাথর তুলে নিল, গঙ্গারামের প্রতীক। সেটাও সে জলের দিকে ছুঁড়তে যাচ্ছিল যখন হঠাৎ পেছন থেকে আওয়াজ এল, 'বাবু, ঘোড়া চাই ?'

চমকে পেছন ফিরে তাকাল সে। একটু দূরে গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে তারা দাঁড়িয়ে। তার হাতে ঘোড়ার লাগাম। চোখ অবনত। চিন্তাগ্রস্ত পাণ্ডুর চেহারা। তার ম্লান সৌন্দর্যের ভেতর থেকেও গঙ্গারামের চেহারা যেন ঝলক দিচ্ছে কিছুটা।

কিছুক্ষণ সে তারাকে চেয়ে চেয়ে দেখল, তারপর উঠে দাঁড়াল। কয়েক পা এগিয়ে লাগামটার একপ্রান্ত চেপে ধরল সে, অন্য হাতে ধরল তারার একটা হাত।

হ্যাঁ, এখন যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব, সে নৈনিতাল থেকে চলে যাবে। তারা আর তারার অন্ধ মা-কে সঙ্গে নিয়ে। তাদের গ্রামে যাবে। হাসপাতাল খুলবে সেখানে। সবকিছু আবার গোড়া থেকে শুরু করবে সে কারণ অসুখটা শুধু তারার একার নয়, পুরো সমাজব্যবস্থাটাই ব্যাধিগ্রস্ত। গোটা সমাজটারই প্লাস্টিক সার্জারি প্রয়োজন। এখন তাকে সবকিছু একেবারে গোড়া থেকে আরম্ভ করতে হবে। ভালোবাসা শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু কর্তব্য বাকি রয়েছে এখনো।

যেন তার চোখের সামনে গ্রামের কুঁড়েঘরগুলি ঝকঝক করতে লাগল। খুবানির গাছে ফুলগুলো উজ্জ্বল হাসিতে হেসে উঠল।